ধূলিচন্দন

কিন্নর রায়

আশীর্বাদ
প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রকাশক ঃ অমিতা চট্টোপাধ্যায়
আশীর্বাদ প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ৩০ জানুয়ারি ১৯৬০

উপদেষ্টা ঃ
অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়ান স্মল ইণ্ডাস্ট্রি,
বিজনেস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট

অলংকরণ ঃ গোপাল সান্যাল

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ বিজন কর্মকার

মুদ্রক ঃ অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণি (ব্লক কে-১)
কলকাতা ৭০০ ০০৬

ধূলিচন্দন

জলঙ্গির মাথায় গোল একখানা চাঁদ আলোর ফুটবল হয়ে ভেসে আছে।

বৈশাখ শেষে নদীতে তেমন জল নেই। আর গরম খুব। হালকা হালকা হাওয়া দিচ্ছে, সেই হাওয়ায় অবশ্য জলঙ্গির জল নড়ে কি নড়ে না। কিন্তু চাঁদ ভেঙে যায়, দূরে ভেসে হারিয়ে যায় না।

রাজশেখর নদীর ধারায় ভাসতে ভাসতে তার দু'পাশে সাঁতরাতে থাকা দুই গজরাজকে দেখতে পেলেন। চাঁদের গম্ভীর আলোয় তাদের পিঠের খানিকটা, মাথার ওপর দিক, বড়সড় পিছনের কিছু অংশ কোনো চলন্ত পাহাড় হয়ে জেগে। রাজশেখর সান্যাল আপন খেয়ালে সাঁতরাতে সাঁতরাতে একবার আকাশ, প্রায় স্তব্ধ নদী, আর দু'পাশে জল কাটা জোড়া হাতি—সবই দেখে নিলেন এক সঙ্গে।

ষাট পেরনর পর শরীরের নানান জোড় একটু একটু করে আলগা হয়ে গিয়েছে। তার ওপর ইচ্ছে মরে যাওয়া, সেও তো এক মহাভার বিশেষ। কিছুই ভালো লাগে না আমার। বরং চুপ করে বসে থেকে নানা রকম গন্ধ, যেমন ছেলেবেলায় পেতাম রজশাহিতে বাড়ির হাতার ভেতর ফুটে থাকা নাগকেশর, হাস্নুহানা, কামিনীর তীব্র সুবাস, বাড়ির দুর্গা পুজোয় অষ্টমি আর নবমির সন্ধিক্ষণে জোড়া পাঁঠা বলি দেওয়ার পর সেই ছাল ছাড়ান মাংস আর রক্তের ঝিমঝিমে আঁশটে গন্ধ, কিংবা কাশীতে তীর্থ করতে গিয়ে সেখানকার আস্ত পাকা পেয়ারা থেকে বার করে আনা গাছের চারা যখন একটু একটু করে বড় হল, তারপর ফল ধরল তাতে, সেই ফলের পেকে ওঠা সুঘ্রাণের স্মৃতি কেমন যেন বিদ্যুৎ রেখা হয়ে চমকে চমকে ওঠে মাথার ভেতর। নাড়িয়ে দিয়ে যেতে থাকে সমস্ত স্মৃতি।

জল সাঁতরাতে সাঁতরাতে রাজশেখর তাঁর বহুদিনের অভ্যাসে একটু যেন হাঁফ ধরা গলাতেই ডেকে উঠলেন—বৈতাল, বৈতাল।

কোনো সাড়া সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল না। ফলে রাজশেখর আবার একটু যেন গলা তুলেই চিক্কুর পাড়লেন—বৈতাল! এই বৈতাল! হারামজাদা।

হারামজাদা শব্দটা উচ্চারণ করেই মনে পড়ল ঠাকুমা হেমনলিনী কখনও হারামজাদা বলতেন না, বলতেন—শারামজাদা। হারামজাদা শব্দটি গালাগাল। শারামজাদা নয়। হেমনলিনীর যুক্তি এমন ছিল। ফরসা ফরসা, ছোট্টখাট্ট, অনেকটা যেন কাঁচকড়ার পুতুল হেমনলিনী। চমৎকার গান গাইতে পারতেন। বিশেষ করে

কাননবালার গান। '*আমি বনফুল গো...*' '*তুফান মেল, তুফান মেল...*।' নয়ত কালি কীর্তন।

আ-ই-জ্ঞা—বৈতালের সাড়া পেয়ে এই অন্ধকার জল আর দু'পাশের দুই বনপালান হাতি দেখতে দেখতে রাজশেখর ভাবলেন এখন খানিকটা চিৎ সাঁতার দিয়ে ভেসে থাকলে তেমন ঘাটতি হবে না দমে।

আইজ্ঞা—মাইজা কর্তা—এইবার বৈতাল আবারও সাড়া দিল।

হারামজাদা, সাড়া দ্যাও না ক্যান? ক্যান সাড়া দ্যাও না! নাকি কোনো প্রয়োজন মনে করনা সাড়া দ্যাওনের!

দি-ই-তো, এই তো দিলাম—

এই বৈতাল কি বেতাল থেকে? নাকি এই নামের কোনো উৎস নেই! রাজশেখর নিজের মনে এমন জিজ্ঞাসা যে মাঝে মাঝে একেবারে করেন নি, তা নয়। কিন্তু তার উত্তর সময়ের তুমুল ওঠা-পড়ায় ঘুলিয়ে গিয়েছে। সেই ঘোলাটুকু থিতোতে না থিতোতেই আবার নতুন জিজ্ঞাসা। অন্য অন্য প্রশ্ন।

কি, কষ্ট হইতাসে নাকি?

না কর্তা।

পারবা?

পারুম না ক্যান!

দুই হাতি চাঁদ লাগা অন্ধকারে নিজেদের ভাসিয়ে রাখে প্রায় নিঃশব্দে। তাদের মাথার জেগে থাকা অংশ, পিঠের শিরদাঁড়ায় আকাশের চাঁদ পিচকিরি করে খানিকটা বাড়তি জ্যোৎস্না ছুঁড়ে দিতে দিতে খিল খিল হাসে। তখনই কোনো অজানা কারণে চর্বিঅলা খাসির মাংসের গন্ধ এসে বাড়ি মারে রাজশেখরের নাকে। এর সঙ্গে সেই ছায়া ছায়া বালকবেলার পাঁঠা বলির স্মৃতি, মুণ্ডচ্ছেদনের পর নিহত পশুর ছাল ছাড়িয়ে মাংস বের করে আনার যে গন্ধ, তার সঙ্গে কোনো মিলই নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য, এখন এই সাঁতরে জলঙ্গি পার হতে হতে একটু শুকিয়ে যাওয়া বাসি বেলফুল, গন্ধলেবুর সতেজ সুগন্ধ—সবই কেমন যেন উড়ে উড়ে আসতে চায় চারপাশ থেকে।

মাইজা কর্তা, আপনেরে কষ্ট অয় না তো?

না—বলতে বলতে খানিকটা নদীর জল এক চুমুকে মুখের ভিতর নিয়ে মহানন্দে কুলকুচি করে বেশ খানিকটা দূরে পাঠিয়ে দেন রাজশেখর। সেই চাঁদ মাখা জল নদীতেই ফিরে যায় আবার। জলে জল মেশে।

আমি এই হাতি দুইটার নাম দিসি মেঘডম্বরু আর মেঘপাল।

এই নামে তো আপনেগো বাড়িতে দুই খান হাতি—

হ জানি তো! হ্যারাই তো ফিইর‍্যা আসছে।

তা কি কইর‍্যা আইব! তারা তো কবেই ব্যাধাক মইর‍্যা ফউত হইয়া গেসে গিয়া। পাকিস্তান হওনের পর বর্ডারে তা-গো ছাড়ল না। আটকাইয়া রাখল। পারমিশন নাই। হাতি লইয়া ওপারে—ইনডিয়ার যাইতে পারবা না। কিন্তু কিসু খাওনের ব্যবস্থাও করে না। হাতির জইন্যে কত কি চাই! কত কি লাগে। কলা গাস! গুড়! রাজবাড়ির হাতি। কিন্তু শুনব কেডা! বড় কর্তাও—মানে মাইজাকর্তার বাপের বাপ, যার দাপটে বাঘে গরুতে সর্বদা জল খাইত এক ঘাটে, এমুন তার পরতাপ, তিনি মানে ভূপতিরঞ্জন সান্যাল কি চাইসিলেন হাতি দুই খানেরে অরা যেন তেন প্রকারেণ আটকাইয়া রাখুক! এপারে আইস্যা তারা কি খাইবে? কোন হানে রাখুম ঐ দুই হাতিরে?

বৈতাল কি অ্যাত সব ভাবতে পেরেছিল! বৈতাল ঋষিদাস। বাপের নাম বিষ্ণু ঋষিদাস। পেশা-ঢাক-ঢোল, বাইদ্য বাজান। গরু মরলে, ভাগাড় থিকা আইন্যা চামড়া ছুইল্যা দুই চাইর পয়সা রোজগার। ফরিদপুরে আমাগো বহু আত্মীয়। আমরা না হিন্দু, না মুসলমান। দুই দলই আমাগো নিজেদের কইর‍্যা লইতে পারে না।

বড় থামওলা কাছারিবাড়ি, তার সামনের উঠোন, মুসলমান, ঋষিদাস প্রজা, একটু আলাদা করে থাকা চরের মুসলমান—সব পর পর মনে পড়ছে রাজশেখরের। যেমন হেমনলিনীর পাথরের বড় খাদায় দুধ কলা মেখে ভাত দিয়ে খাওয়া। তার সঙ্গে আম। টিয়াঠুঁটি নামের দিশি আমের চারা শেকড় চারিয়ে বার দুই তিন ফল দিতে না দিতেই আল্লাহো আকবর, নারা এ তকদির—বন্দেমাতরম, কালি মাঈকি জয়—হিন্দুস্তান, পাকিস্তান হয়ে গেল।

ফল দেওয়া সব আমের গাছ—ফজলি, মোহনভোগ, মেঘলণ্ঠন, গোপালভোগ, তারপর কি একটা যেন নাম মোহনবাঁশি না কানাইবাঁশি—এর মধ্যে একটা হয়ত কলার নাম, অন্যটা আমের। কোনটা কলা আর কোনটাই বা আম—সেভাবে ঠিক মনে পড়ছে না এখন। যেমন মনে পড়ছে না বৈতালের ঠাকুরদার নাম আসলে কি ছিল। দরকার নেই তেমন মনে করার, তবু স্মৃতি পালিশ করতে হয় এই অসম্ভব মন খারাপের ভেতর। মামাবাড়ি ছিল সিরাজগঞ্জ, পাবনা জেলায়। ডিভিশন রাজশাহি। মামারা ছিলেন মৈত্র। তাদের অবস্থা ঠাকুরদা কিংবা বাবার মতো নয়। একটু কম সম্পন্ন। ভূপতিরঞ্জন সুটিয়া, নাটোর—এসবের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এরকম রইস ছিলেন না, কিন্তু তাঁর বাড়িতে দোল, দুর্গোৎসব, রাস, কালিপূজা—সবই হত নিয়ম করে।

দেশ ভাঙার পর গৃহদেবতা নৃসিংহনারায়ণ, জল্পেশ্বর শিব—সব নিয়ে এলেন গলার সঙ্গে বাঁধা কাপড়ের থলি—অনেকটা যেন টাকা রাখার বগলি এমন দেখতে, তার ভেতর। বড় বিগ্রহ নদীতে গেল। ভূপতি সান্যাল নিজে বিসর্জন দিলেন পদ্মায়। তখন প্রমত্তা পদ্মা। তার আলুথালু গতি, স্রোত, আকাশের দিকে ঢেউয়ের হাত ছুড়ে কি এক অদ্ভুত বিলাপ। অষ্টভুজা পাথরের মহিষমর্দিনীকে ফেনিল জলে

নামালেন ভূপতিরঞ্জন। নৌকোর বুকে তখন প্রায় নিভে যাওয়া লণ্ঠন। আকাশে ক্ষীণ চাঁদের পাতলা রেখা। মেঘরঞ্জিত আকাশে ক্বচিৎ কখনও তারাদের হানাদারি।

কষ্টি পাথরের অষ্টভূজা বিগ্রহ জলে নামিয়ে দেওয়ার আগে তাঁর শেষ পুজো, আরতি করলেন ভূপতিরঞ্জন সান্যাল। অসম্ভব কষ্ট আর কান্না বুকে চেপে ভেজা চোখে পদ্মায় শুইয়ে দিলেন বিগ্রহকে। মূর্তির সোনার তৈরি মুকুট আর যাবতীয় গহনা আগেই খুলে রেখে এসেছিলেন বাড়িতে। এবার ভাসানের আগে সুবর্ণময় তিনটি চোখ, রুপোর যাবতীয় আয়ুধ খুলে নিলেন একটি একটি করে। শুধু তামার প্রাচীন দেবী ঘটটি থেকে গেল। যা নিয়ে তিনি চলে এসেছিলেন এপারে।

অষ্টভূজা দেবী বিসর্জনের আগে পঞ্চপ্রদীপে তাঁকে শেষবারের মতো আরতি করলেন ভূপতিরঞ্জন। প্রদীপের কেঁপে কেঁপে ওঠা শিখায় দেবীর মুখ, তার ওষ্ঠ, স্তনভার, ক্ষীণ কটিদেশ, পা—সবই কেমন রহস্যময়। অপার্থিব। বৈতালের ঠাকুরদা চুপ করে দাঁড়িয়ে ভূপতিরঞ্জনের পাশে। এক মনে ঠাউর কর্তার আরতি দেখছে।

অ্যাই হারামজাদা বৈতাল—

হ মাইজা কর্তা।

তোর ঠাউরদার নাম যেন কি আসিল।

কালা, কালা ঋষিদাস।

হ কালা। বলেই জল, তার দু-পাশে নদী ভাঙা দুই হাতি, অনেক দূরের আলো দেখতে পেলেন রাজশেখর। তাঁর মনে পড়ল পাথর প্রতিমা বিসর্জনের আগে কালা বড় ব্যগ্র ছিল ঢাক বাজানোর জন্য। এ বাড়ির যাবতীয় উৎসবে, বিবাহ, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে তারাই নিয়মিত বাজনদার। ঢাক, ঢোল, সানাই, নাকাড়া, সবই তাদের হাতের গুণে বেজে ওঠে। কিন্তু এ বিসর্জন তো বড় গোপনে। নিভৃতে, প্রায় একাকী। যে মাঝি নৌকো বেয়ে এনেছে সেই হাবি শেখ খুবই বিশ্বস্ত কর্তার। রাজাকার, আলবদর, বা লিগের নেতাদের কানে যদি একবার গিয়েছে ভূপতির এই দেবী ভাসান, তা হলে তো আর কোনো উপায় নেই।

কি, আপনেও তা হইলে ইনডিয়া চললেন! এমন কথা দিয়ে শুরু হবে। তারপরই হয়ত যান, যান। ওতো মামার বাড়ি আপনেগো— হয়ত মুখোমুখি এমন করে তখনই বলতে পারত না কেউ দশ আনি স্যানাল বাড়ির কর্তাদের, কিন্তু তারা সতর্ক হয়ে যেত। ছ আনি, দু আনি, চার আনি, আট আনি—এমন সব সান্যাল, লাহিড়ি, মৈত্র, চৌধুরিরা—সবাই প্রায় পা বাড়িয়ে, বর্ডার পেরিয়ে হিন্দুস্তানে যাওয়ার জন্য।

নৌকোয় দাঁড়িয়ে সেই মেঘমাখা আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই গালবাদ্য করে উঠল বৈতাল ঋষিদাসের ঠাকুরদা কালা ঋষিদাস। সেই ব-বম-বম, ব-বম-বম প্রবল গালবাদ্যের শব্দে আকাশও বুঝি বা ফুটো হয়ে গেল। আর তারপরই নামল অঝোরে বৃষ্টি।

দেবী অন্তর্হিতা হলেন জলে।

পদ্মার ঢেউয়ের লক্ষ লক্ষ হাত তাঁকে যেন বরণ করে নিল পরম যত্নে, মমতায়। মেঘের ডম্বরু, কালা ঋষিদাসের প্রবল গালবাদ্য, পদ্মার ঢেউয়ের ফোঁসানি উলুধ্বনি হয়ে আশ্রয় দিল অষ্টভূজা প্রস্তর মূর্তিকে।

এসব কাহিনি পরে শোনা ঠাকুরদা ভূপতিরঞ্জনের কাছ থেকে, কখনও আগের বর্ণনা পরে। কখনও বা পরেরটা আগে। আর দেশ, দেশের স্মৃতি বলতে রাজশেখর সান্যালের কাছে যেমন পুরনো তেঁতুল, গুড় দিয়ে হেমনলিনীর হাতে পাথরের বাটিতে মাখা ভাত, কনকচূড় চালের গন্ধ, ধূলিচন্দন গ্রামে নিজেদের বড় বাড়ি, মহাল, কাছারিবাড়ি, মেঘপাল আর মেঘডম্বরুর পিঠে চড়া। জ্যোৎস্না ধোয়া রাতে ঠাকুরদার শখের ফলের বাগান, ফুলের বাগিদা, আমের বাগানে কামলা, মুনিষদের পাহারাদারি।

মেঘডম্বরু, মেঘপালদের আটকে দিল বর্ডারে। দিনে দিনে তারা না খেয়ে একটু একটু করে রোগা হতে হতে মরে গেল। মনে পড়লে রাজশেখরের বুকের মধ্যে হাতির পায়ের ভারি ওজন হেঁটে বেড়ায় যেন। বুকটা চাপ মতো হয়ে আসে। থম ধরে থাকতে হয়। তখন মন খারাপ ঘন হয় আরও।

ওপার থেকে কত কি এল ভূপতিরঞ্জনের। আরও কত কি এল না। দশ আনি সান্যালদের সব কি আনা যায়! পড়ে রইল জমিদারি, ঘরবাড়ি, পুকুর, বিল, মৌজা, কাছারিঘর, ঠাকুরদালান, কাচঘেরা আলমারির ভেতর বাঁধানো 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'সবুজপত্র', 'বঙ্গদর্শন'। চিনামাটির বাহারি বিলেতি ফুলদানি, পেতলের চোঙা লাগানো কলের গান, মৈজুদ্দিন খাঁ সাহেব, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, গহরজান, মালকাজানদের তাল, লয়কারি ধরে রাখা অনেক অনেক গালার রেকর্ড, বন্দুক, তলোয়ার, কাঠ আর লোহার মস্ত মস্ত সিন্দুক, বাক্স-প্যাঁটরা, তোরঙ্গ, পোর্টম্যান।

জলঙ্গির জল এখানে অনেক কম। গরমে এমনিতেই নদী শুকিয়ে আসে। কিন্তু কেন জানি না একটু আগেও অনেকখানি গভীরতা ছিল, এমনকি হাতি দুটোও ডুবে গিয়েছিল বেশ অনেকটাই। নাকি তারা ডোবেইনি আসলে, হেঁটে হেঁটে পেরচ্ছিল রোগা নদী, সে ভাবে দেখলে আদতে ভুল হচ্ছে আমারই—যেমন নাকি প্রায়ই হয়, বলে বৈতাল।—মাইজা কর্তা আপনে ঠিক দ্যাখেন নাই। ভুল হইতাসে আপনের।

তুই চুপ কর হারামজাদা।

হক কথা কইতাসি মাইজা কর্তা, আপনে পরে মিলাইয়া দেইখেন—

থো। থো তুই।

আমি এক্কেরে সাচা কথা কই মাইজা কর্তা।

হঃ! সাচা কথা! বলেই একদম পাথর হয়ে যান রাজশেখর। বৈতাল ঋষিদাস জানে মাইজা গিন্নি মারা যাওনের পর মাইজা কর্তার এই দশা। বিশ্বাসই করতে চায় না কইলকাতার হাসপাতালে গিয়া মাইজা গিন্নি মরসে।

আবার এক পোলাপাইন্যা কথা। পোলা, মাইয়া, পোলার বউ ডাক্তার হইলে কি মাইনষে মরে না! সে কি খুটি দিয়া আসছে যমের দুয়ারে! মনে মনে এসব গজ গজ করে বৈতাল ঋষিদাস। কিন্তু মুখে বলা হয় ওঠে না কিছুই। বলা সম্ভব নয়, মাইজা কর্তার মুখের ওপর।

কি জানি কেন, বনমালার শাড়ির গন্ধ, তার গা থেকে উঠে আসা ট্যালকম পাউডারের ঘ্রাণ আবারও জল পেরতে পেরতে মনে পড়ে গেল রাজশেখর সান্যালের। আর সেই ঘ্রাণে বিভোর হয়ে আবারও আকাশের দিকে তাকাল রাজশাহির ধূলিচন্দন গ্রামের দশ আনি সান্যালবাড়ির মাইজাকর্তা।

আকাশে বৈশাখী চাঁদ বড় রূপময়ী। তার জ্যোৎস্না ঢালা গায়ে শুক্ল পক্ষের ম্যাজিক। হয়ত কালই পূর্ণিমা। নয়ত পরশু।

মুর্শিদাবাদের বাড়ির মাথায় এমন চন্দ্রবাহার ফুটে উঠল বনমালা কখনও কখনও গান গেয়ে উঠত চাপা গলায়। মূলত বাংলা ফিল্মের গান, একটু পুরনো। হয়ত কানন-বড়ুয়া, নয়ত সুচিত্রা-উত্তম। অতুলপ্রসাদ বা নজরুল, রজনীকান্ত। তখনও বনমালার গায়ে ট্যালকম পাউডারের সুগন্ধ। সেই মধু গন্ধে বিভোর হতে হতে গীতা দত্তর কোনো দরদ ভরা টান, বনমালার কণ্ঠে। সেই স্মৃতি এখনও মাথার ভেতর চেপে বসে আছে রাজশেখরের। ঢালা সবুজ, নয়ত লাল পাড় শাড়ি। খয়ের ছাড়া পান খেয়েছে বনমালা। তার সাজা একটা ছোট পান রাজশেখরের হাতেও। নাকের এক চিলতে পোখরাজে ডুবে গিয়েছে গোটা চাঁদ। হয়ত তখনই বনমালার গলায়, '*কানে কানে শুধু একবার বল/তুমি যে আমার...*।'

হাতিরা—একজোড়া হাতি এদিকে এসেছে খবর দিয়েছিল বৈতালই। কোথায়, কোন পাহাড় থেকে, অনেক জঙ্গল পেরিয়ে তারা নাকি নেমে এসেছে।

দুমকা, দুমকার হাতি—কারা যেন চিৎকার করে, ফিস ফিসে গলায় এসব বলে গেছে মুর্শিদাবাদের এদিকটায়। যেখানে জলঙ্গি, যেখানে রাজশাহি থেকে চলে আসা ধূলিচন্দনের দশআনি সান্যালদের বাড়ি।

হাওয়া কি বলেছিল এমন করে, ওরা দুমকার হাতি!

আবার কেউ বলেছে, হ্যাঁ— তা বেশ জোর দিয়েই—ওরা দুমকার নয় দলমার। দলমা থেকে এসেছে এই সব হাতি।

নাকি এ সবই আসলে বলেছে জলঙ্গির জল?

কিংবা বলেই চলেছে ধূলিচন্দনের সান্যালবাড়ির সেই সব গাছেরা, যাদের অনেককেই নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন ভূপতিরঞ্জন। কাউকে কাউকে তার বাবা শ্রীপতিরঞ্জন, হয়ত বা তাঁর বাবা শশীশেখর।

মুর্শিদাবাদ থেকে নদিয়ায় আসতে আসতে আমরা পেরলাম ভাগীরথী। একটু স্রোত ছিল, দিব্যি জোয়ার-ভাঁটাও আছে। কিন্তু গরম কাল তো। তেমন অসুবিধা হল না।

ধূলিচন্দনে থাকার সময়, সে তো একদম ধু ধু ছেলেবেলা—তখন মেঘডম্বরু আর মেঘপাল—তাদের সঙ্গে কত কথা রাজশেখরের। তাদের জন্য গুড়, কলাগাছ, ভূষি—সব কিছু ঠিকঠাক সাজিয়ে দিত মাহুতের সঙ্গে থাকা ছেলেটা। খেতে খেতে মেঘডম্বরু বলে উঠত রাজশেখরকে, যাবে নাকি পদ্মার চরে?

কেন?

খুব মজা হবে।

কি মজা?

জ্যোৎস্নায় যদি বালির ওপাশে পড়ে থাকা পদ্মা দেখ, বুঝতে পারবে কেমন আনন্দ হয়, এসব কাজ করলে।

রাজশেখর মেঘডম্বরুর কথায় কথায় দেখতে পায় সেই সে চাঁদডোবা রাতে আশ্চর্য তীর। যেন একটা রুপোর বিশাল তবক মাখা কিছু একটা হয়ে পড়ে আছে পদ্মা। তার পাড়ের বালিতে মিশে আছে জ্যোৎস্নার মিহি গুঁড়ো। দিনের বেলা সেখানে কত পাখি। নানান ধরনের। কি তাদের কলকণ্ঠ। ডাকাডাকি। সন্ধ্যার মুখে বাসায় ফেরার তাড়া তাদের—তখন তো শীতের ছোটবেলা। দূরে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। একটা দিন মুছে গেল কত সহজে। সেই জ্যোৎস্না মাখানো নদীর ধারে চুল খোলা বনমালা, হাওয়ায় পাউডারের গন্ধ ভাসিয়ে দিতে দিতে বড় আনমনে গেয়ে যাচ্ছে—'*বধূঁয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে...*'

কিন্তু এমন কি সত্যি সত্যিই হয়েছিল। রাজশাহিতে পদ্মার পাড়ে বনমালা কোথায়? তার সঙ্গে বিয়ে তো দূরের কথা, দেখাই হয়নি। তা ছাড়া ধূলিচন্দন গ্রামের দশআনি সান্যালবাড়ির মেজোবউ ওরকম খোলামেলা হয়ে নদীর ধারে গান গাইতে পারে না কি! বাস্তবে হয়? কিন্তু কেন জানি না, মাঝে মাঝেই পদ্মার পাড়ে কোনো জ্যোৎস্না ধোয়া রাতে বনমালাকে মুক্তকেশি অবস্থায় দেখতে চায় রাজশেখর। পেয়েও যায় দেখতে। একটু দূরে পদ্মা। কেমন যেন রোগা। আর চাঁদ মেশা শাদাটে বালির ওপর মেঘডম্বরু, মেঘপাল—পাশাপাশি। হঠাৎই শুঁড় তুলে আকাশের দিকে নিজের মাথা খানিকটা যেন উঁচিয়ে ডেকে উঠল মেঘডম্বরু। যেমন অনেক সময় সিনেমায় হয়।

এসব ছবি খানিকক্ষণ থানা গেড়ে বসে রাজশেখরের মাথার ভেতর। তারপর হঠাৎ হঠাৎই মুছে সাফ হয়ে যায়। তারপর কখনও কখনও তার সুতো ঝুলে থাকে এদিক ওদিক। সেই সুতো হাতড়াতে হাতড়াতে মাঝে মাঝে এক আধটা পুরনো কথা এমন করে মনে পড়ে যায় যে, তখন সব কিছুর আগাপাছা গোলমাল পাকিয়ে যায়।

বনমালা ধূলিচন্দনের খানিকটা দূরে পদ্মার পাড়ে দাঁড়িয়ে চাঁদ ছল ছল আকাশের দিকে দুহাত তুলে হঠাৎ যদি গেয়ে ওঠে—'*ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান...*' আর তখন তার গানের সঙ্গে সঙ্গে মেঘডম্বরু আর মেঘপাল একই ভাবে

প্রায় গলা মিলিয়ে শুঁড়ে চাঁদকে ছুঁতে চেয়ে মাথার ওপর উঁচু করে ডেকে উঠবে, তখন কি এক ঘোরের মতো ছড়িয়ে যাবে বনমালার গায়ের ট্যালকম পাউডারের গন্ধ। কিন্তু এসব কি বাস্তবে হয়, না হয়েছে?

যেমন মুর্শিদাবাদের সান্যালপাড়া থেকে এই দুই হাতির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে নদিয়ার তেহট্টের চান্দের ঘাটে পৌঁছতে কত দিন লেগে গেল কে জানে! বন কর্মী, হুলা পার্টিদের থেকে নিজেদের আড়াল করে দিনের পর দিন পথ হাঁটা। সঙ্গে বৈতাল।

আমরা তো ভাগীরথী পেরলাম সাঁতরে। অন্ধকারে হাতিরা কথা বলে।

জানি তো। আমি আর বৈতালও তো সাঁতার দিলাম তোমাদের সঙ্গে।

সে বড় কঠিন যাত্রা।

কোথায় আর তেমন কঠিন! বলে রাজশেখর খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

আমরা তো আসছি মুর্শিদাবাদের কান্দি, বহরমপুর, নওদার বিভিন্ন এলাকা পেরিয়ে নদিয়ার তেহট্টের সাহেবনগর হয়ে এই চাঁদের ঘাটে।

সাহেবনগর থেকে চাঁদের ঘাট বাইশ কিলোমিটার। মাথার ওপর তোলা শুঁড় নামাতে নামাতে বলে উঠল মেঘপাল।

বৈতাল বলল, নদী বোধহয় ফুলিয়ে গেল।

তার কথা শুনতে পেয়ে রাজশেখর বলে উঠল, তাই তো! খেয়াল করিনি অ্যাতক্ষণ। জলঙ্গি পেরিয়ে তা হলে আমরা কি ধূলিচন্দনে চলে এলাম?

দুই হাতি বড় মন্থর গতিতে এগোয়। তাদের পিঠে, পাছায়, ল্যাজে, শুঁড়ে জলঙ্গির দাগ। জল একটু একটু করে গড়িয়ে নামে সমস্ত গা থেকে। ঘোলা চাঁদের আলোয় দলমা থেকে নেমে আসা সেই দুই বুনো হাতির সারা গা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে যায় আরও।

কি রকম করে যেন ভাব হয়ে গেল এই দুই গজপতির সঙ্গে। তাদের নামও দিলাম রাজশাহির ধূলিচন্দনের দুই পোষা হাতি মেঘডম্বরু আর মেঘপালের নামে। কি আশ্চর্য মেঘডম্বরু, মেঘপাল বলে ডাকলে এই দুজন সাড়াও দেয় দিব্যি।

বৈতাল মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখে মাইজা কর্তার জাদু। এ যেন এক চমৎকার ভেলকিবাজি। মাইজা কর্তা অগো—হাতি দুইটারে মেঘডম্বরু আর মেঘপাল কইয়া ডাক দিলেই হ্যারা থমকাইয়া যায়।

পথে পাকা কলা কিন্যা মাইজ্যা কর্তা দুই গণেশবাবার স্যাবা দেন। তা দেইখাও পুইণ্য। বৈতালের কেমন যেন মনে পড়তে থাকে সব।

বাড়ি থিক্যা যা পয়সা আনসিল সবই প্রায় ফুরানোর পথে। এখন নদী পার হইয়া এই পারে আইস্যা কি লোমের কাম হইতে পারে বৈতাল বোঝে না। শুধু সে দেখতে পায় জলঙ্গির ওপারে পৌঁছে ভেজা মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে তার থেকে বয়সে সামান্য ছোট মানুষটা হাউ হাউ করে পোলাপানের লাখান

কানতে থাকে। সেই কান্নার শব্দে থমকে যায় প্রায় মধ্যরাত পেরিয়ে আসা প্রকৃতির নানা শব্দ। নদীর ছল-ছলাৎ, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, অন্য পোকা-মাকড়ের চিৎকার—সবই থমকে যায় ক্ষণিকের জন্য।

অতবড় মাইনষে এক্কারে চিক্কুর পাইড়া কান্দে। বার বার মাথা মুখ ঘষে মাটির ওপর। দুই হাতি পাথর, নয়ত পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দূরে। রাজশেখরের পায়ের কাছাকাছি বড় যত্নে নদী এসে ভাঙে। তেমন জোরে নয়, কিন্তু জলের ছল-ছলাৎ রাজশেখর সান্যালের পা ছোঁয়। ধূলিচন্দন গ্রামের দশ আনি সান্যালবাড়ির মেজোকর্তা ভেজা গায়ে সোজা উঠে দাঁড়ালে তার এক মাথা চকচকে টাক, ঘাড়ের কাছে জড়িয়ে থাকা, এখন জলে ভিজে লেপটে ন্যাতা ভুলভুলে পাকা চুল, বেশ টকটকে ফরসা রং, খাড়া নাক, পাতলা একজোড়া ঠোঁট, নাকের নিচে পাকান ফৌজি ডিজাইন যেন—এমন গোঁফ চাঁদে, কাদায়, জলঙ্গির বাতাসে একদম অন্যরকম। পাশাপাশি বৈতাল ঋষিদাস অতটা লম্বা নয়, যেমন রাজশেখর। তা কত হবেন রাজশেখর? পাঁচ নয় টয় তো বটেই। ঐ বংশের এটাই ধারা।

বৈতাল তার নিজের রোমহীন পাটা বুক দিয়ে গড়িয়ে নামা জল রেখায় ছোট ছোট চাঁদ দেখতে পায়। তার মাথা ভরতি চুল, তা বেশ ছোট করেই ছাঁটা, যদিও নদী থেকে উঠেই বৈতাল তার পুরনো অভ্যাসে দু'হাত দিয়ে মাথার চুল সরিয়ে দেয় পেছনে। খানিকটা আলগা জলও কাটিয়ে বার করে দেয় সেই হাতের তালুর টানে। বৈতালের বাবা বিষ্ণু ঋষিদাস এ ভাবেই নদী বা পুকুর থেকে উঠে এসে মাথা থেকে দু হাতের চাপে বাড়তি জল কাচিয়ে ফেলে দিয়ে সব কটা দাঁত বার করে বলত, ত্যাল দ্যান মা ঠাইরেন। হাত-পাও মাথায় দ্যাওন লাগব।

মা লোহার পলায় সরষের তেল মেপে বাড়ির দাসীর হাত দিয়ে পাঠাতেন বিষ্ণু ঋষিদাসের জন্য। সে তো কত কত বছর আগে। পদ্মা তখনও প্রমত্তা। আত্রেয়ী, করতোয়াতে তখন অনেক জল। দশআনি সান্যালদের দাপটও খুব।

দু'জন মানুষ, দুটি হাতি চাঁদ মেশান অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। হাতিদের পায়ে আলাদা করে কোনো শব্দ নেই। চারপাশে কি আশ্চর্য নীরবতা। এমন কি নদীও সেভাবে কথা বলতে সাহস পায় না।

রাজশেখরের মনে হয়, এইখানে—জলঙ্গির পাড়ে চুল খোলা বনমালা, বাহুমূলে ট্যালকমের গন্ধ ছড়ান সৌন্দর্য আর বাহার নিয়ে যদি আকাশের দিকে দু হাত তুলে হঠাৎই গেয়ে ওঠে—'*নিশিরাত বাঁকা চাঁদ আকাশে/চুপি চুপি বাঁশি বাজে বাতাসে...*' কিংবা '*একটু চাওয়া আর একটু পাওয়া...*' সত্যিই সত্যিই কি গান গায়নি বনমালা এমন কোনো জায়গায়? এই বহে যাওয়া নদীর পাড়ে? কিংবা মা হয়ত নারকেল নাড়ুর পাক তৈরি করছেন বাড়িতে। গুড়, নারকেলকোরা, ঢিমে আঁচ—সব মিলিয়ে তৈরি হতে চলেছে নাড়ু, তকতি, বরফি।

দলমা নাকি দুমকা থেকে নেমে আসা দুই হাতি নির্বিকার দাঁড়িয়ে। এমনকি তাদের শাদা গজদন্তে পূর্ণিমার ভরা চাঁদের আলো গড়িয়ে গেলেও তাদের তেমন কোনো ভ্রূক্ষেপই থাকে না। দুই হাতি চুপচাপ পাথর পাথর। এই স্তব্ধতা তুচ্ছ করে হঠাৎই বলে ওঠে বৈতাল, কয়ডা বাজে কন তো মাইজা কর্তা?

ক্যামনে কমু! হাতে কি ঘড়ি বানছি?

হ তাও তো ঠিক। তবে চান্দের পরকিতি দেইখ্যা মনে লাগে রাত প্রায় তিন প্রহর অইল।

তুই অখনও এই সব বোঝস বৈতাল!

হ, বুঝুম না ক্যান!

আমি সব ব্যাবাক ভুইল্যা গেসি গিয়া।

ক্যান, ভুলসেন ক্যান!

শহরে থাইক্যা এইসব হয়!

আমি কোন হানে আসি!

ক্যান, আমাগো লগে। আমার বাড়ির পাশেই—

তা অইলে!

তুই পারস বৈতাল। ক্যামনে পারস?

হেইডা কি আমি জানি নাকি!

ক্যান, জানস না ক্যান হারামজাদা, খবিশ।

এই দুই আধ পুরনো মানুষের সংলাপে আকাশের চাঁদ হাসে।

কেমুন পাইয়া গ্যালাম ক, মেঘডম্বরু আর মেঘপালরে।

হ।

অগো লগে নদী পার হইয়া এপারে। এখন কত—কতদূর আমাগো ধূলিচন্দন!

হ্যার আমি কি জানি!

ক্যান, জানস না ক্যান! তুই সব জানস আর এইডা জানস না!

কইতে পারুম না মাইজাকর্তা কতদূর ধূলিচন্দন।

হালা তুমি জানবা ক্যামনে তুমি ঋষির পোলা ঋষি। আমাগো মতো দশ আনি সান্যাল!

বেশি কথা কইয়েন না, বি ডি আর আসব। আমাগে ভিছা, পাছপোর্ট নাই। বেলাকে আইসি। হেয়াও দালাল না ধইর‍্যা।

বেলাক! হেইডা আবার কি!

হঃ! হেইডাও খবর রাখেন না। ভারি আপনে মাইজা কর্তা হইসেন।

পুঙ্গির পুত। তরে আমি ফাইড়া ফালামু। হালা, আমারে শিখাও।

কিন্তু বেলাক।

হ, বেলাক। ক—

হেই যে দালালরে ট্যাহা দিয়া বর্ডার পার করা, দালাল গামসা নাড়ায়। গামসা দেইখ্যা বি এছ এফ ছাইড়া দ্যায়। বি ডি আর দ্যাহে না।

কিন্তু আমরা তো নদী সাতরাইয়া আইসি—

তা-তে কি অইল!

কি অইল মানে! সুমুন্দির পুত বি এছ এফ দৌড়াইয়া আইব। বি ডি আর দৌড় দিব। আলো, ফায়ারিং।

কোন এক অজানা কোণ থেকে হঠাৎ উঠে আসা নদীর বাতাস রাজশেখর আর বৈতালকে একইভাবে জুড়িয়ে দিয়ে যায়। বাতাসের এই যাওয়া আসায় কেমন করে যেন ফারাক মুছে যায় মালিক আর সেবকের।

ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়ায় বেশ লাগে।

কি অন্যায়টা করলেন কও তো ঠাউরদা। কথাটা বলেই একবার চাঁদের দিকে তাকালেন রাজশেখর।

অন্যায় তো অনেকই হইসে মাইজা কর্তা। দ্যাশটা ভাইঙ্গা টুকরা টুকরা করনের কি প্রয়োজন আসিল। বিটিশ তো এমনিই পলাইতে সিল।

কথা কস একটা এমুন, না জাইন্যা শুইন্যা। ব্রিটিশের খেদানর জইন্যে কত না জেল, ফাঁসি, দ্বীপান্তর। আর তুই কইতাছস ইংরাজ এমনি এমনি চইল্যা যাইতেসিল।

আমি সে কথা কই নাই মাইজা কর্তা। আমি কইতাসিলাম—

থোঃ। হইসে। হইসে। তুই যা কবি, তা আর জাননের বাকি নাই। কিন্তু হেইডা অন্যায় করলেন ঠাউরদা।

এটুকু বলার পর রাজশেখর সান্যাল দেখতে পেলেন আধো অন্ধকারে বৈতাল ঋষিদাসের মুখ তেমন স্পষ্ট করে নজরে পড়ছে না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সেই পাহাড় প্রমাণ দুই মহাগজ। বনের মধ্যে, ফাঁকা মাঠ, ফসল ক্ষেতের ধারে বনের হাতি দেখার অভিজ্ঞতাই আলাদা। সেই বি-ই-শা-ল মহাহস্তি, যেন পর্বত অথবা মেঘ যেমন তার রং, দুই শুঁড়ের পাশ দিয়ে কখনও ছোট কিংবা বড় দাঁতের আভাস, আবার কখনও বা দাঁত নেই তার—সব মিলিয়ে সে এক মহামহিম দৃশ্য।

দলমা থেকে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া হয়ে জলঙ্গি পেরিয়ে—এপারে একদম অন্য রাষ্ট্রে চলে আসা দুই হাতি কেমন যেন চুপচাপ। তাদের দেখতে দেখতে রাজশেখরের আবারও মনে পড়ে যেতে থাকে ধূলিচন্দনের সেই বড় থামওলা কাছারি বাড়ি। আদায় ঘর, পুজোর দালান, দোলমঞ্চ।

মেঘডম্বরু আর মেঘপালকে রাখার জন্য ছিল বড়সড় পিলখানা। আলাদা আলাদা মাহুত, ভৈ আর মেঠ দুই হাতির। পায়ে শেকল—অসম্ভব মোটা আর ভারী শেকল দুজনেরই। সেই শেকল পেঁচিয়ে থাকত গোদা পা আর বড় বড় নখের

পাশে। কখনও কখনও তা থেকে ঘা। তাতে আবার কি সব জড়ি বুটি লতা-পাতার ওষুধ বিষুদ করত মাহুত। কিন্তু নিজে হাতে হাওদা খাটান হাতির পিঠে উঠে ডাঙশ যার পোশাকি নাম অঙ্কুশ, মারত বেশ জোরে। কেঁপে কেঁপে উঠল মেঘপাল, মেঘডম্বরু।

কি অদ্ভুত সেই সব স্মৃতি।

একবার একজনকে দিয়ে হাতিদের সারা গায়ে চিত্র-বিচিত্র করালেন ভূপতিরঞ্জন। হলুদ, লাল, কালো—উজ্জ্বল সব রঙ। বোধয় ত্রিশূল আঁকা হল পেটের ওপর।

আসলে একজন শৈব সাধু এসেছিলেন ধূলিচন্দনে। তিনি এসে গ্রামের একদম শেষ মাথায় বিশাল এক অশ্বত্থ গাছের নীচে ধুনি জ্বাললেন। কি ভিড় সেই সাধু দেখার জন্য।

সেই সাধুরও এক হাতি ছিল। সম্ভবত সে হাতি বিহারের কোনো রাজা বা জমিদারের দান। তার কি একটা বড়সড় মাঙ নাকি পূরণ করেছিলেন সেই সাধু। একদম গজব হো গ্যয়া যাকে বলে, সেইরকম কোনো ব্যাপার।

সেই দাড়ি, জটা, কৌপিন যে গ্রামে বসে গিয়ে ধুনি জ্বালাতেন, সেই গাঁয়ের সব চেয়ে সম্পন্ন মানুষটিকে তাঁর হাতির খোরাক যোগাতে হত। এমনই নিয়ম। ভূপতিরঞ্জন কালা ঋষিদাস, বিষ্ণু ঋষিদাসদের নিয়ে হাতি চেপে সাধু দর্শনে যেতেন। যে কদিন সেই বাবাজি ছিলেন ধূলিচন্দনে তাঁর হাতির খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন ভূপতিরঞ্জন।

আশপাশে পাবনা, কুষ্ঠিয়ায় হিন্দু-মুসলমান কি একটা টেনশান ছিল, তখনই সেই দাড়ি, জটাজুট, কৌপিন কোথা থেকে যেন নেমে এলেন হাতির পিঠে। ভূপতিরঞ্জন শোনপুরের পশুমেলার কথা আবছা আবছা শুনেছিলেন আগেই। কিন্তু এই সাধু যেন বা আরও স্পষ্ট করে সেই সব বৃত্তান্ত শোনালেন তাঁকে। নানা সময়ে বসে, আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বিহারে শোনপুরে সেই জীবজন্তু, পাখির মেলার কথা। সেখানে হাতি ও ঘোড়া, মোষ, বলদ, উট—সব পাওয়া যায়।

এসবই হেমনলিনীর কাছে, কখনও বা ভূপতিরঞ্জনের কাছে, কখনও বা ভূপতিরঞ্জনের মুখে অনেক অনেক পরে শোনা রাজশেখরের। শোন নদীর বিপুল জলধারা, তার চরায় প্রায় দিগন্ত মুছে দেওয়া বালি আর বালি, সেই চরে শীতের পরিযায়ী পাখিদের অনবরত আনাগোনা—সাধু নাকি এসব কথাও বলেছিলেন ভূপতিরঞ্জনকে।

কিন্তু তোমরা তো আগে বলেছ তিনি নাকি মৌন থাকতেন বেশিরভাগ সময়ই। রাজশেখর জানতে চান তাঁর ঠাকুমার কাছে।

তা থাকতেন। কিন্তু তোর ঠাকুরদা গেলে কথা বলতেন।

কেন?

কেন আবার! তিনি একজন অত বড় নামকরা মানী মানুষ। কত্ত বড় মহাল তাঁর। সেখানে কত কত প্রজা। লাঠিয়াল, সড়কিয়াল। তার ওপর তিনি সাধুর হাতির খোরাক পাঠিয়ে দেন নিয়ম করে। সেই সাধুই তো বললেন, হাতির গায়ে ছবি থাকা উচিত, বিশেষ করে ত্রিশূলের।

কে না কে একটা সাধু বলল আর ঠাকুরদা মেনে নিলেন! কেমন যেন তেরিয়া শোনায় রাজশেখরের গলা।

কেন, মানবেন না-ই বা কেন। না মানার কি আছে! সাধু তো খারাপ কথা বলেননি। শুধু ত্রিশূল আঁকতে বলেছিলেন হাতির গায়ে। সঙ্গে ডমরু, খড়্গ।

অ্যাতসব আঁকালেন আপনারা?

হ্যাঁ, লোক দিয়ে তোর ঠাকুরদাই সব ব্যবস্থা করলেন।

সাধু বলল আর আপনারা মেনে নিলেন তা!

কেন, না মানার কি আছে। এর মধ্যে অন্যায়টা কি হল?

গায়েতে রং দিয়ে আঁকা, কষ্ট হয় না ওদের!

ত্রিশূল, খড়্গ, ডমরু। এ সব দেবতাদেরই হাতের অস্ত্র। শুধু তাই না, তার সঙ্গে বোধহয় দেবনগরী হরফে 'হরহর মহাদেও' এই লেখাটাও ছিল।

ধূলিচন্দনের হাতিদের গায়ে যে রং দিয়ে চিত্র করা হয়েছিল, তা আর স্পষ্ট করে মনে পড়ে না রাজশেখরের। কিন্তু কেন জানি না তার মনে হতে থাকে এই গায়ে নানান লেখালেখি, ছবি আঁকাআঁকির ফলে বেশ কষ্ট হয়েছিল মেঘপাল আর মেঘডম্বরুদের। খুব কষ্ট। এই কথা ভাবলেই চোখে জল চলে আসে রাজশেখরের। ঘটনার এত বছর পরেও।

ভূপতিরঞ্জন এটা খুবই অন্যায় করেছিলেন। বর্ডারে তাঁর দুই প্রিয় হাতি মেঘডম্বরু আর মেঘপাল পড়ে রইল। পাকিস্তানি পুলিশ, বর্ডার পাহারা দেওয়া লোকেরা তাদের আসতে দিল না এপারে। আটকালি তো আটকালি ঠিক আছে, কিন্তু সঙ্গে খাবার দাবারের ব্যবস্থা কর ওদের। কলাগাছ, গুড়, ভূষি, ফলপাকুড়, ধান—কিছু একটা দে। না খেয়ে খেয়ে দিনের পর দিন বর্ডারে আটকে থেকে তীব্র মন খারাপ, কষ্ট নিয়ে একটু একটু করে মারা গেল মেঘডম্বরু আর মেঘপাল। তাদের কবর হয়েছিল বর্ডারেরই আশেপাশে কোথাও, পাকিস্তানের মাটিতে। ধূলিচন্দন, পদ্মা থেকে বহু দূরে।

ঠাকুরদা—ভূপতিরঞ্জন সান্যাল—ধূলিচন্দনের দশ আনি সান্যালদের অন্যতম গোষ্ঠীপতি এই কাজটা—নিজের পোষা দুই হাতিকে বর্ডারের ওপারে ছেড়ে আসা, এটা ঠিক করেননি।

তুই খামকা প্যাচাল পারস। এখানে—ইনডিয়ায় এনে ওদের রাখবেন কোথায়। খাওয়াবেন কি! আমরা নিজেরাই তখন কোথায় থাকি, তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। হাতে গোনা পয়সা কড়ি। সামনের দিন কি হবে কেউ জানে না। অনেকেই অবশ্য বিশ্বাসই করেনি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান থাকবে। উদ্বাস্তু হয়ে আসা কেউ কেউ ভেবেছে এই পাকিস্তান, হিন্দুস্তান সাময়িক। সব মিটে যাবে একদিন। মুছে যাবে বর্ডার। তাই অনেকেই কলকাতার দিকে না এসে বনগাঁর আশপাশ—দমদম, সোদপুর, বেলঘরিয়া, খড়দা—এসব জায়গায় থাকার জায়গা খুঁজেছে। জমি কিনেছে। কাছেই যশোর রোড। সামান্য দূরে বর্ডার। দেশভাগের ঘা মুছে গেলে সোজা যশোর রোড ধরে বর্ডার পেরিয়ে একদম ওপারে। এরকম অনেকেই ভাবতেন। তো সে যাই হোক, ধূলিচন্দনের দশ আনি সান্যালরা ইনডিয়ায় এসে কোথায় থাকবে শিয়ালদা স্টেশন, উদ্বাস্তু ক্যাম্প, জবরদখল কলোনি, না কি আত্মীয়ের বাড়ি—তারই সিদ্ধান্ত হয়নি তখনও। তার ওপর ঐ দুই হাতি। তাদের তো ছেড়ে আসতেই হবে। কোথায় থাকবে তারা! খাবে কি! আর শুধু তো এক জোড়া হাতি নয়, ভূপতিরঞ্জনের পোষা নানা ধরনের পাখি ছিল। গোটা তিনেক অন্য দেশের বাঁদর, দুটো হরিণ, একটা ভাল্লুক, বড় ময়াল একটা—সব তো ফেলে ছড়িয়ে চলে আসতে হল। কে কাকে দেখবে! রাজাকার, আলবদর, লিগের লোকেরা জানলে তো সব শেষ।

হেমনলিনীর মুখ থেকে সে সব যুক্তি শুনতে শুনতে রাজশেখর তাঁর চোখের সামনে পায়ে শেকল বাঁধা, পিঠে হাওদা, সওয়ারি আর মাহুত নেওয়া দুই পোষা হাতিদের দেখতে পেতেন। ডাঙশের বিভীষিকা খোঁচায় কখনও কখনও তাদের মাথার চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে। ব্যাথাতুর শুঁড় উঠছে নড়ে। কুতকুতে দু-চোখ দিয়ে ধীরে নেমে আসছে জলধারা।

খুব অন্যায় হল হাতি দুটোর সঙ্গে। বর্ডারের ওপারে তাদের ফেলে রেখে আসা হল প্রায় ইচ্ছে করেই।

আসলে তোদের ঠাকুরদা পরিবার নিয়ে চলে আসছিলেন তাড়াতাড়ি। পরে বদিরদ্দি আর কালা ঋষিদাস, বিষ্ণু ঋষিদাস মাহুত, মেঠ আর দুটো হাতিকে নিয়ে চলে এসেছিল বর্ডার পর্যন্ত। হেমনলিনীর বলার মধ্যে কোথায় যেন সামান্য কিন্তু কিন্তু আর ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। যেন ভূপতিরঞ্জন আইনের ফাঁদে, এদেশে অন্যদেশে—তার সীমান্ত, এর গোলকধাঁধা আর টানাপোড়েনে পড়ে গিয়ে আনতে পারেননি মেঘডম্বরু আর মেঘপালদের—এমন একটা যুক্তি খুব আলগাভাবে হলেও যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে হেমনলিনীর কথা থেকে। কিন্তু আসলে হেমনলিনী যেমন বলছেন, আদতে তেমন তো আদৌ নয়। বরং ঠাউরদা ইসসা কইরাই—

তর মাথার ভিতর একখান কথা ঢুকলে আর বাইরাইতে চায় না। ক্যারার লাখান কুইরা কুইরা খায়। খাইতেই থাকে। আর খালি খালি ভ্যাদরা প্যাচাল পারস।

ভ্যাদরা প্যাচাল পারি আমি!

শুধুমাত্র ভ্যাদরা প্যাচালই না, আপাইলঠা আপাইলঠা, আগুরি আগুরি কথা কস।

কি কন আপনে!

ঠিক কইতাসি। একবার মাথায় ক্যারা ঢুকলেই হইল। একই কথা বার বার বার বার বইল্যা কি যে আনন্দ পাও—কোন হানের থিকা কোন হানে আস, কিসুই বুঝি না। আকাশ লাইথ্যাইনা সব কথা কইতে থাক।

কি, আমি আকাশ লাইথ্যাইনা কথা কই! হেইডা কইথে পারলেন আপনে! পারলেন কইথে!

মাথায় যখন ঢুকসে শুয়ারের গো। শ্যাষ না দেইখ্যা ছাড়ব না। সকাল থিকা উইঠ্যা ভ্যাদরা প্যাচাল। এদিকে আমি মরতাসি নিজের জ্বালায়।

ঠাকুমা—হেমনলিনী যাই বলুন না কেন, মাথার মধ্যে পুরনো কাঠ কাটা পোকা হয়ে কি একটা বোধ যেন কাজ করতে থাকে। মাঝে মাঝেই এরকম হয় নানা বিষয় নিয়ে। কিন্তু নিজেদের স্টেটের পোষা দুই হাতি মেঘডম্বরু আর মেঘপালদের ওভাবে বর্ডারে নিঃসহায় ছেড়ে এসে ঠিক করেননি ভূপতিরঞ্জন, এই বিবেকের তাড়না কেন যেন বারে বারে খোঁচা দিয়ে যায় রাজশেখরকে। এমন কি বনমালা এ বাড়ির বউ হয়ে আসার পরও এই হাতি ছেড়ে আসা নিয়ে বহুবার কথা উঠেছে। তর্ক হয়েছে ঝগড়া, অশান্তি—হেমনলিনীর সঙ্গে। আসলে তর্কাতর্কি বাধত হেমনলিনীর সঙ্গেই তার কারণ মা তরুবালা সেভাবে কোনো কথাই বলতেন না সাংসারিক বিষয়ে।

আপনার মা কোনো কিছুতেই থাকতেন না। যা করতেন, ঠাইরেন। বড় গিন্নিমা।

বৈতালের এই কথা মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে যায় রাজশেখরকে। মা কি আসলে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হতেন প্রবল পরাক্রান্তা শাশুড়ি ঠাকরুনটির কাছ থেকে। নাকি মা আসলে এরকমই ছিলেন। নরম সরম ফুলটুসি ফুলটুসি!

বনমালা বরং কখনও কখনও বাধা দিয়েছে রাজশেখরকে। দরকার কি ঝগড়া কাজিয়ায় যাওয়ার! এসব তো নিতান্তই অকারণ। কোনো তো প্রয়োজন নেই একেবারে। এখন আর দরকার কি এসব কথা তোলার! বহু বছর হয়ে গেল।

শ্যাখ গো থিকা খ্যাদা খাইয়া চৌদ্দ পুরুষের ভিটি ছাইড়া আসলাম। রাত্যারাতি পলাইয়া আসা। সে তুমি কি বুঝবা মনু! সর্বস্ব খুইয়া আসছি। ভিটা, বাড়ি, মন্দির—সব। কও, অখন এই ভ্যাদরা প্যাচাল শুনতে ভালো লাগে। আমি মরতাসি নিজের যন্ত্রণায়। ভাবলেই চক্ষু দিয়া জল ঝরে। আর হেয়ার মইধ্যে এনার

পোড়াইনা পোড়াইনা কথা। বলতে বলতে হঠাৎই ভ্যাক করে কেঁদে ফেলেন ঠাকুমা। তাঁর বাকি কথারা কান্না আর ফোঁপানির মধ্যে জড়িয়ে যেতে থাকে।

বনমালা কোনো কোনো দিন জিজ্ঞেস করেছে, হাতি নিয়ে—মানে তোমাদের ধূলিচন্দনের মেঘডম্বরু আর মেঘপালদের নিয়ে তুমি অ্যাত ভাব কিন্তু ধর তোমার ঠাকুরদার পোষা বিদেশি বাঁদর, অত অত রকমের পাখি, ভাল্লুক, হরিণ, ময়াল—তাদের কথা তো তুমি সেভাবে কখনও বল না। তাদেরও তো ছেড়ে আসা হল অসহায়ভাবেই।

আসলে একথার কোনো জবাব তখনই দিতে পারেন না রাজশেখর। ধূলিচন্দনের চিড়িয়াঘরটি তখনই তার সামনে আবছা করে দুলে ওঠে। আর পিলখানায় পায়ে শেকল বাঁধা মেঘডম্বরু আর মেঘপাল, পদ্মার পাড়ে দাঁড়ান দুই পোষা হাতি—সব ছবি পর পর ভেসে উঠলে দু'চোখ জলে ভরে যায় রাজশেখরের।

সেই দুই হাতির কান লটপট লটপট করে। রুপো বাঁধান শাদা গজদাঁতে খেলে বেড়ায় চাঁদ-সূর্যের আলো। পায়ের নখে ধূলিচন্দনের কাদা, বালি, মাটি—সব মাখামাখি হয়ে যায়। আবারও দু-চোখ জলে ভরে যায় রাজশেখরের।

এত, এত বছর পর দুমকা নাকি দলমা থেমে নেমে আসা দুই বুনো হাতির সঙ্গে হেঁটে হেঁটে জলঙ্গি পেরিয়ে ও পারে এসে একবার যদি ক্ষমা চাওয়া যায় তাদের কাছে। সেই দুই পোষা গজ— মেঘপাল আর মেঘডম্বরু, তারা কি ক্ষমা করবে?

দ্যাখো, আমরা অন্যায় করেছি। তোমাদের এভাবে বর্ডার অঞ্চলে একলা একলা ছেড়ে দিয়ে ফেলে রেখে। মাহুত ছাড়া চেনা কেউ নেই। চারপাশে অচেনা সিকিউরিটি। সীমান্ত নজরদারি করার লোকজন। তোমরা একটু একটু করে মরে গেলে খাবার না পেয়ে, জল না খেয়ে। কোথায় কোনখানে গোর দেওয়া হল তাদের! রুপো বাঁধানো গজদন্ত চারটে কবর দেওয়ার আগে কেটে নিল কি কারা? কিছু তো জানি না আমরা। তখন আমার বয়স অনেক কম। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার, তা তো ঠাকুরদাই নেবেন।

এই অন্ধকার চারপাশ, তার মধ্যেও আকাশ থেকে টুপিয়ে টুপিয়ে নামছে চাঁদের আলো। গোল, মাথা ভারি চাঁদকে আকাশের সঙ্গে ইস্তিরি করে লাগিয়ে দিয়েছে যেন কেউ। সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে দুই হাতি। ফুটকি ফুটকি আলোর কণা অন্ধকারে বুনে দিতে দিতে উড়ে বেড়াচ্ছে জোনাকিরা।

আশ্চর্য নিশ্চুপ সময়। কোনো ঘড়ি নেই। তাড়া নেই। তবু এরই মধ্যে হঠাৎই বলে উঠল বৈতাল, মাইজা কর্তা—ফিরন লাগব। দ্যাশটা অইন্য। আমরা নদী পারাইয়া আসছি। কিন্তু আমাগো ভিজা পাছপোর্ট নাই। ধরলে ব্যাপক ক্যালেঙ্কারি হইয়া যাইব।

হউক। আমারে ক্ষমা চাইতে দাও। আমাগো পূর্ব পুরুষ যে অপরাধ করসে, হেয়ার কোনো মাইর্জনা নাই। জ্যান্ত দুইখান হাতিরে—হায় হায় হায় হায়। বলতে বলতে প্রায় ডুকরেই উঠলেন রাজশেখর।

চারপাশে অনন্ত অন্ধকার। দূরে কাছে ভরা চাঁদের আলো মেঘের ভেতর থেকে মুখ বার করলে সে এক অন্য মজা। আলো-ছায়াময় সেই চরাচর অনেকটাই অচেনা।

ধীরে নদী ভেজা মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন রাজশেখর। তারপর বলতে থাকেন, আমারে মাফ কইর‍্যা দ্যাও। আমাগো বংশেরে, গুষ্টিরে মাফ কইরা দ্যাও।

জোনাকিরা আপন খেয়ালে উড়ে বেড়ায় অন্ধকারে।

আমাগো—আমাগো গুষ্টিরে মাফ কইর‍্যা দ্যাও। বলতে বলতে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে নদী ধোয়া নরম মাটিতে কপাল ঠেকান রাজশেখর। হাঁটু গেড়ে কাদা কাদা মাটিতে বসে কোমর থেকে নিজের শরীর অনেকটা ভাঁজ করে বার বার মাটিতে কপাল ছোঁয়াতে থাকেন। তাঁর চুল পড়ে যাওয়া ফরসা টাকটি হয়ত কাদায় কাদায় খানিকটা যেন ময়লাটে, এমন কি ঘোলা জ্যোৎস্নায় হয়ত কিছুটা দুর্বোধ্যও হয়ে ওঠে।

বনের দুই হাতি চুপ করে অন্ধকারে স্থির। তাদের শুঁড়, ল্যাজ কিছুই প্রায় নড়ে না। এমন কি খানিকটা গাছপালা ঘাস থেকে উড়ে উড়ে রক্ত খেতে আসা মশা, ডাঁশদের তাড়াতেও তাদের এতটুকু অধৈর্য হয়ে উঠতে চোখে পড়ে না। কেমন নিশ্চল, নিশ্চুপ পাথর পাথর একটা ব্যাপার গ্রাস করে নেয় যেন সব কিছু।

তখনই পচা পাতা, কাঠকুটো ঘাস মাড়িয়ে কাদের আসার শব্দ শোনা যায় পায়ে পায়ে। বেশ ভারি পদক্ষেপ। সেই ওজনদার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জেনে বুঝে অথবা না জেনেই সতর্ক হয় বৈতাল।

ঘাসের আড়ালে লুকনো পোকারা কি এক অজানা কারণে যেন ভুলে যায় ডাকতে।

বৈতাল নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসা রাজশেখর কোনো এক অজানা মন্ত্রবলে চুপ করে থাকেন।

ভারি পায়ের শব্দ এগিয়ে আসে।

কাছে। আরও কাছে।

তারপর মেঘেদের এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে শেষ রাতের মায়ামাখা, খানিকটা যেন মরচে ধরা চাঁদ ভালো করে আকাশের গায়ে টুক করে ডুবে যাওয়ার আগে পাটি পেতে বসলে সেই রুপো বাঁধান শাদা শাদা গজদাঁত, সারা গায়ে রঙিন অক্ষরে হর হর মহাদেও, খড়্গ, ডমরু, ত্রিশূল আঁকা তারা দুজন এসে দাঁড়ালে রাজশেখর বড় করে ফুঁপিয়ে ওঠেন।

বৈতাল ঋষিদাস ফিস ফিস করে বলে ওঠে, হেই যে তেনারা আইলেন। আমাগো মাফ কইর‍্যা দ্যাও। প্রায় ডুকরে বলে যেতে থাকেন রাজশেখর সান্যাল। আমাগো মাফ কইর‍্যা দ্যাও। মাফ কইর‍্যা দ্যাও।

বনের থেকে আসা জোড়া হাতি বহুক্ষণ পর শুঁড় তুলে ডেকে ওঠে। আর সেই ডাক শোনার পর হঠাৎ কি মনে হওয়াতে যেন বৈতাল বিড় বিড় করে বলতে থাকে—খাইসে, এইবার বি ডি আর আইস্যা পড়ল বইল্যা।

চোখের সামনে ধূলিচন্দন এস্টেটের মেঘডম্বরু আর মেঘপালদের দেখতে দেখতে—তাদের পিঠে বসান হাওদা, মাথার সাজ, গোটা শরীর জুড়ে অনেক রকম আঁকাআঁকি নজর করতে করতে হু হু করে কেঁদে ওঠেন রাজশেখর। বার বার বলতে থাকেন, আমাগো ক্ষমা কর। গুষ্টিরে, বংশরে ক্ষমা কর।

তখনই চাঁদ মাথায় নিয়ে সেই সারা গায়ে চিত্র-বিচিত্র করা দুই হাতি তাদের সাজান শাদা দাঁত নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে।

তাদের দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে যেতে যেতে রাজশেখর দেখতে পেলেন প্রাচীন থকথকে জ্যোৎস্না গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে হাতিদের দাঁতের ওপর। এবার কি পিঠে চড়ে বসতে হবে! তারপর সোজা ধূলিচন্দনের রাস্তা? পেছন থেকে চিৎকার করে কি যেন একটা বলতে গেল বৈতাল। সে কথা কানে গেল না রাজশেখরের। নাকি গেল! শুনেও না শোনার তাচ্ছিল্য দেখালেন রাজশেখর। তারপর ধীরে ধীরে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন হাওদা সাজান মেঘডম্বরু আর মেঘপালদের দিকে। থই থই চাঁদের আলোয় সে যে কি অপরূপ মায়া, তা বলে বোঝান যাবে না চট করে।

রাজশেখর এবার ঠিক করে নিলেন এবার তিনি বসবেন, হাতির পিঠে চড়ে বসবেন। সেই ছেলেবেলার মতন, যেমন ধূলিচন্দনে, দিনের পর দিন।

বৈতাল আবারও চিক্কুর পাড়ল—যাইয়েন না মাইজা কর্তা। ওতো মায়াহস্তি! ফিরা আসেন মাইজা কর্তা। ও হস্তি মায়া।

কিন্তু রাজশেখর সে সব শুনতে পেলে তো।

ধীরে হাওদার সামনে এসে দাঁড়ালেন রাজশেখর সান্যাল। বহু বছর পর তাঁর একটি স্বপ্ন বাস্তব ও ঘটনা ছাড়িয়ে নতুন কোনো স্বপ্নের ভিতর ঢুকে পড়তে চাইছে।

বনের দুই হাতি নিজেদের ভাষায় কি যেন বলে গার্ড অফ অনারের কায়দায় তাদের শুঁড় মাথার ওপর তুলে ধরে একদমই তোপধ্বনির কায়দায় ডেকে উঠল। হয়ত সেই বৃংহণে শুধু তোপধ্বনি নয়, বিউগিলও ছিল।

দুই

চাঁদে পাওয়া নদী একদমই অন্যরকম লাগে রাতে। জলঙ্গিতে তেমন জল নেই মুছে আসা বৈশাখে। থাকার কথাও নয়। জ্যোৎস্নামাখা হালকা হালকা স্রোত সাঁতরে তারা ইনডিয়ার দিক থেকে এপারে উঠে এলে থমকে যাওয়া বাতাস যেন বইতে থাকে নতুন করে। হাওয়ায় শোনা যায় কী এক আশ্চর্য ফিসফিসানি।

কোথা থেকে, কোনখান থেকে, কোত্থেকে এলে তোমরা? কে যেন কেমন টেনে টেনে সুর করে করে বলতে থাকে কথা, যা নিয়মমতো ছড়িয়ে যাওয়ার কথা অনেক, অনেক দূর। কিন্তু তেমন করে ছড়ায় কি? নাকি একই জায়গায়, যেমন করে কানাগলির ভেতরে ঘুরপাক খায় বেভ্‌ভুল কেউ কেউ, সেভাবেই ঘুরে মরে নদীর পাড়ের বাতাস।

তাদের গোল গোল ভারি পায়ে, লম্বাটে শুঁড়ে বর্ষার জলভরা কালচে মেঘ যেমন হয়, প্রায় সেরকমই গায়ের রঙে জ্যোৎস্নার বাহারি কারুকাজ।

তোমরা কি ইনডিয়া থেকে এলে? বাতাস জানতে চায় ফিস ফিস করে।

তোমরা কি দলমার? প্রথমটার পর তোমরা কি চলে এসে দুমকা থেকে, হাঁটতে হাঁটতে? হাওয়ার পরের প্রশ্ন এরকম। উত্তর না পেয়েই পরের প্রশ্ন করে হাওয়া।

তারা দু'জনে হ্যাঁ, না—কিছুই বলে করে না। শুধু শুঁড় তুলে ছোট ছোট চোখ এক দু'বার পিট পিট করতে করতে সারা গায়ে মাখাতে থাকে চাঁদের সাবান। জ্যোৎস্নার এই ধারাস্নানে দেখতে দেখতে দুজনেই হয়ে যায় কেমন যেন অন্যরকম। অনেকটা যেন সেই প্রাচীন কাহিনির শ্বেতহস্তী।

বৈতাল, বৈতাল—একটু জোরেই ডেকে ওঠে রাজশেখর সান্যাল।

কোন হানে আসিলি হারামজাদা।

আপনের পাশেই।

মিথ্যা কথা কইস না।

ক্যান, মিথ্যা কথা ক্যান কমু। কালীর কিরা। আমি তো আপনের পাশেই।

হঃ। যত মিথ্যা কথা।

শোনেন, বেশি চিল্লায়েন না। বি ডি আর আইয়া পড়ব।

আইলে আইব।

এইডা আপনে কী কন মাইজাকর্তা! আমগো ভিছা, পাছপোট কিসুই নাই। হাতির লগে লগে হেয়াগো পাছ ধইর‍্যা নদী সাতরাইয়া এপারে আসছি, হেইডা বাংলাদ্যাশ। আমেগো কাসে কোনো কাগস নাই। বেলাকে আসছি। অহন বি ডি আর ধরলে—

বৈতালের এই চেতাবনি শুনে একটুও দমলেন না রাজশেখর। বরং আরও দ্বিগুণ উৎসাহে গলা তুলে চিৎকার করে উঠলেন, এই এইহানে—এই জমিনের উপরে আমি দাড়াইয়া আসি। দেখি কোন হালা আমারে এখান থিকা সরায়। কারও সাইধ্য নাই। তুই আমারে ক' আমাগো ধূলিচন্দন আর কত দূর!

আনধারে কিসুই বুঝন যায় না।

হারামজাদা চক্ষে কম দ্যাখো!

আইজ্ঞা মাইজ্ঞাকর্তা।

চশমা নাও না ক্যান?

পয়হা কই?

নদীর পাড়ে ধীরে বহে চলা বাতাস আবার চাপা স্বরে জানতে চায়, তোমরা কি ইনডিয়ার?

দুই হাতি কোনো কথা বলে না। চাঁদ ছোপান অন্ধকারে তাদের মাটির দিকে নামান শুঁড় অল্প অল্প নড়ে। পিছন দিকের তুলনায় ছোট ল্যাজটি টিক টিক করে দোল খায়। আর অবিরাম জ্যোৎস্নাপাতের মধ্যে বাতাসে মেশে তাদের ফোঁস ফোঁস নিশ্বাসের শব্দ।

বৈতাল উদলো গায়ে দাঁড়িয়ে। পাশে রাজশেখর। নিজের গায়ের ভিজে আদ্দির পাঞ্জাবি ছুঁয়ে যাওয়া নদীর হাওয়া বেশ আরাম দেয় ধূলিচন্দন গ্রামের একদা বাসিন্দা রাজশেখর সান্যালকে।

ধূলিচন্দন। ধূলিচন্দন। মেঘডম্বরু আর মেঘপাল—সান্যালদের এস্টেটের দুই হাতি, তারাই কি আবার ঘুরে এল দলমা হয়ে নয়ত দুমকা থেকে মুর্শিদাবাদ, নদীয়ার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সামনের পথ আটকে থাকা জলঙ্গি পেরিয়ে এপারে?

রাজশেখর সব ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেন না। আর বৈতাল ঋষিদাস তার কাঁধের বুক কাটা হাওয়াই শার্ট ভালো করে নিংড়ে কাঁধের ওপর ফেলে রাখলে তার ওপর দিয়ে নতুন করে চাঁদ গড়াতে থাকে। বৈতাল ঋষিদাসের মাথার চুলে, কানের লতিতে, নাকের পাশে জ্যোৎস্নার বডি-পাউডার।

নদী পেরিয়ে এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে হঠাৎই এসে যাওয়া দুটি হাতি আর দু'জন মানুষ চন্দ্রধারায় চান সেরে নিতে নিতে কত কী ভাবে।

নদীতে এই প্রায় ফুরিয়ে আসা রাতে তেমন কোনো শব্দ নেই। বরং গাছপালার আবছা আবছা ঝোপের ভেতর থেকে খুব জ্বলজ্বলে চোখের কী একটা, হয়ত শেয়ালই হবে, নয়তো খটাশ বা সড়েল—বৈতাল ঠিক বুঝতে পারে না, দূরে দাঁড়ান জোড়া হাতিদের দিকে তাকাল। অন্ধকারে তারা স্থির দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে দোলায়িত শুঁড়, সামান্য নড়ে ওঠা ল্যাজ, হয়তো কোনো ডাঁশ, পোকা, নয়তো জোঁকও হতে পারে, তাড়াতে চেয়ে নিজের নিজের কাজ করে যায়।

বৈতাল ঋষিদাস তার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানে রাজশাহির ধূলিচন্দন গ্রামের একদা বাসিন্দা, এখন ইনডিয়ার নাগরিক রাজশেখর সান্যাল মানে তার মাইজ্যা কর্তাটির মাথার মধ্যে নানা ক্যারা আছে। সেই ক্যারার কামড়ে ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা বাইরায় মাইজাকর্তা। তারে সামলানোর দায় বৈতাল ঋষিদাসের। বৈতালের বাপ বিষ্ণু ঋষিদাস, ঠাকুরদা কালা ঋষিদাস—তাঁরও বাপ, তাঁরও ঠাকুরদা, সেই ঠাকুরদারও বাপ—এই ভাবেই ধূলিচন্দনের দশআনি সান্যালদের খিদমত করে এসেছেন যুগের পর যুগ। বছরের পর বছর।

মাইজা কর্তার মাথার ভেতর কখন কী যে ক্যারা কামড় দ্যায়, তা কওন বোঝন বড়ই দুঃসাধ্য প্রায়। এই তো মুর্শিদাবাদে সান্যালপাড়ায় যে হানে কর্তাগো বাড়ি, সেই পাড়ায় সার্কাস আসলে কর্তার কী উৎসাহ! মাইজা কর্তা রোজ বাইরে যাইতে চায় সার্কাস দ্যাখতে। ফলে অবশ্যই সঙ্গে বৈতাল। রোজ রোজ টিকিট কাইট্যা দেখন সম্ভব! দুই-চাইর দিন হইলে হইতে পারে। মাইজাকর্তা এক্কেরে পোলাপান গো লাখান যাইয়া বইয়া থাকে। তার সব থিকা দ্যাখনের শখ হাতি। সার্কাসের হাতি দেইখ্যা মাইজাকর্তা কইতে থাকে, হেই তো, হেই তো আমাগো মেঘডম্বরু, মেঘপাল।

সার্কাসের সেই দুই হাতি যেন কেমন করে কোনো কারণে একটু পছন্দই করতে থাকে মুর্শিদাবাদের সান্যালপাড়ার মেজো সান্যালকে। রাজশেখর সেই সার্কাসের হাতিদের জন্য পাকা কলা, গুড়, থোড়—রোজই কিছু না কিছু সংগ্রহ করে আনেন। তখন শীত নয়, না হলে কয়েতবেল নিয়ে আসা যেত। পাকা কয়েতবেল খুবই পছন্দ করে হাতি।

'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর ম্যানেজার এস. আয়েঙ্গার রাজশেখর সান্যালের এই রোজ সার্কাসের তাঁবুতে আসা, কোম্পানির খেলা দেখান হাতিদের নিয়মিত খাবার দেওয়া—প্রথম প্রথম খুব একটা ভালো চোখে না দেখলেও পরে বৈতালের কাছে সব শুনে, রাজশেখরকে বেশ খানিকটা নিজের লোকই করে নিয়েছিলেন প্রায়। আয়েঙ্গারের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর টিকিটের বালাই ঘুচে গেল। তখন তো রোজই ফ্রি পাস।

নিজের প্রায় সমবয়সি এই মানুষটির দিকে তাকালে আজকাল কেমন যেন একটা চাপ ধরা কষ্ট বুকের মধ্যে জমা হয় বৈতালের। ক্যান যে মাইজা কর্তার ঠাউরদা তাগো জমিদারির দুইখান হাতি বর্ডারের ওপারে থুইয়া চইল্যা আসলেন! না আইস্যা তেনারই বা উপায় কি! এই হানে—এই নূতন দ্যাশে আইস্যা কোন হানে থোবেন হাতি। মাইনসেরই থাকনেরই ঠিক-ঠিকানা নাই। হেয়ার উপর হাতি! হঃ, আপনে না পাঠায় শংকরারে ডাকে!

তখনই রাজশেখর একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা হস্তিযুগল হাত দিয়ে ছোঁয়ার বাসনায়, সত্যি সত্যি তারা ধূলিচন্দনের সান্যালদের এস্টেটের মেঘডম্বরু আর

মেঘপাল কি না জানার জন্যই হয়ত, কিংবা অন্য কোনো কারণে—বৈতাল ঋষিদাস জানে মাইজা কর্তার মাথার ঠিক নাই, সামনে এগোতে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই বৈতাল বলে উঠল, আউগান ক্যান! এহানেই খাড়ান। বৈতালের এই কথায় রাজশেখর থামেন না। তখন বৈতাল তাঁর হাত ধরে। নিজের থাবা থাবা চেটো দিয়ে রাজশেখরের বাহু বেশ জোরেই ধরে ঝাঁকাতে থাকে। কিন্তু রাজশেখর থামতে ফিরলে তো। তখন শুধু তাঁর দু'চোখ উপচে জল আসে। সেই অশ্রুটুকু জ্যোৎস্নামাখা বুক বেয়ে নেমে আসতে চায়।

বৈতাল তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানে মেজোকর্তা রাজশেখর ভেতরে ভেতরে আনন্দে বা দুঃখে আলোড়িত হলে তার চিহ্নটুকু ফুটে ওঠে অশ্রুধারায়। জল পড়ে। অবিরাম জল পড়ে। তাই জ্যোৎস্না ভেজা রাতে জলঙ্গির পাড়ে ষাট পেরন রাজশেখর সান্যালকে দু' হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখতে চায় বৈতাল ঋষিদাস, নিজের কর্তব্যটুকু করতে চায়। তার সঙ্গে মিশে থাকে কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসার জাফরানি রং।

চাঁদের খিল খিল আলো জলঙ্গির পাড়ে এই দু'জনকেই ছুঁয়ে যায় সমানভাবে। আর তার সঙ্গে সেই যে অনেক দূর, অনেক দূর থেকে পাহাড়, জঙ্গল, নদী, ধানক্ষেত, লোকালয় পেরিয়ে আসা দুই হাতি—তারাও জ্যোৎস্নায় টইটম্বুর হয়ে ওঠে। অনেকটা পুরনো হয়ে যাওয়া কোনো বৃক্ষ-কোটরে একটি প্রাচীন তক্ষক হঠাৎই ডেকে ওঠে আপন খেয়ালে। একবার, দু'বার, তিনবার। সেই ডাকাডাকিতে শির শির শির শির করে ওঠে বৈতাল ঋষিদাসের সমস্ত গা। কাঁটা কাঁটা দিয়ে ওঠে তার চামড়ায়। মনে পড়ে যায় রাজশাহির ধূলিচন্দনে ডাকিনি বিল, বড়তি বিল চলন বিলের পাশে বিশাল অশ্বত্থ বট আর পাকুড়গাছের জড়ামরির মধ্যে অনেক পুরনো পুরনো কোটরের ভেতর বহু দিনের সব তক্ষকের বাসা। তারা মাঝে মাঝে ডেকে উঠলে সে এক রোম দাঁড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপার।

রাজশেখর ফুঁপিয়ে যাচ্ছেন সমানে। তাঁর দু'চোখ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে কষ্টরেখা। সেই বেদনার চিহ্ন চাঁদের আলোয় মাখামাখি হয়ে বুক বেয়ে নীচে নামছে। কিন্তু বৈতাল ঋষিদাস এই অশ্রুধারাকে কষ্টের, এমনটাই বা ধরে নিল কী করে? সেটা কি অনুমান মাত্র! নাকি একদা ধূলিচন্দন এস্টেটের মেজোকর্তা তাঁর এই অবিরাম অশ্রুপাতের মধ্যেই ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর—এই কথাটি খুব আস্তে উচ্চারণ করছিলেন বলে?

সেই কথার ফাঁকে ফাঁকে আবারও ঢুকে পড়ল তক্ষকের থেমে থেকে ডেকে ওঠা। বৈতাল তার দু'কান খাড়া করে জেনে নিতে চাইল একটা তক্ষক না জোড়া তক্ষক।

ঠিকঠাক বোঝা গেল না সব।

বিড় বিড় বিড় বিড় করে সমানে বলে যাচ্ছেন রাজশেখর, আমারে মাপ কইর‍্যা

দ্যাও। আমারে মাপ কইর‍্যা দ্যাও। ঠাউরদা তোমাগো নিয়া যাইতে পারেন নাই ইনডিয়ায়। তোমরা দুইজনে বর্ডারে খাড়াইয়া খাড়াইয়া, না খাইয়া, একটু একটু কইর‍্যা শুকাইয়া শুকাইয়া মরস। এ সংবাদ সহ্য করতে পারি না। পার্টিশনের সময় আমি পোলাপান। কোনো কথা কইতে পারি নাই। অখন আমি আইসি আমার পিতামহ ঈশ্বর ভূপতিরঞ্জন সান্যালের হইয়া তোমাগো কাসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে।

রাজশেখরের কথার মধ্যে বেপরোয়া বাতাসও ঢুকে পড়ে না। চুপ করে থাকে আকাশের নক্ষত্রমালা। চাঁদ। শুধু এসব কথা শুনে বৈতালের মনে হতে পারে—কয় কী, কয় কী মাইজাকর্তা! হেয়ার মাথাডা এক্কেবারে গেছে গিয়া। তখন পার্টিশানের সময়। সর্বত্র রায়ট। ঘরবাড়ি ছাইড়া মাইনসে পলাইতেসে, তো ঠাউরকর্তা—হেই মাইজা কর্তার ঠাউরদা কইলকাতায় আইস্যা নিজে কোনো ঠিকানা নাই, সে আবার হাতিদের লইয়া আসব। তা কখনও হয়? হ্যারা তো কত কী ফালাইয়া আসছে ওপারে। বি-ই-শা-ল প্রাসাদ, মেহগনির সব পালঙ্ক, চণ্ডীমণ্ডপ, জমি-জাতি, গোয়াইল, পুষ্করিণী, চোঙ্গা বসাইনা কলের গান, বিলাইতি ফুলদানি। এ ছাড়াও মাইজকর্তাগো কত কী আসিল। সব পইড়া রইল সেইখানে। সেই পারে। অহন এত বৎসর পর মাইজা কর্তার এই পিতলা শখ সইহ্য করা যায়! কিন্তু না কইর‍্যাও উপায় কী! হ্যায় তো স্বাভাবিক না। না অইলে কেউ কোনহান থিকা না কোনহান থিকা হাতি নাইম্যা আসছে, হেয়ার পিছু পিছু হাটতে হাটতে নদী সাতরাইয়া এই পারে চইল্যা আসে। ইনডিয়া থিক্যা অইন্য দ্যাশে। এইডা সম্ভব!

রাজশেখরও তখন খানিকটা বিহ্বল। তিনি হয়ত বুঝতেও পারছিলেন না আরও কী কী হচ্ছে বা হতে চলেছে। বনের গাছ থেকে খসে পড়া পাতার ওপর কীসের যেন একটা চাপা শব্দ একটু একটু করে সামনে আসার চেষ্টা করছে, এমননি মনে হল তাঁর। মনে যেমন হল, সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ভুলেও গেলেন সেই সব কিছু। নতুন করে চাপা শব্দটা আবারও এগিয়ে আসতে লাগল। এ ধরনের আওয়াজে এক রকমের রহস্যময়তা থাকে। কিন্তু রাজশেখর সেসব নিয়ে একদম মাথা ঘামাতে চাইলেন না। আড়ালে থাকা তক্ষক আবারও ডাক দিল তার নিজস্ব স্বভাবে।

ডাকাডাকির সেই শব্দে ভেতরে ভেতরে নতুন করে কেঁপে উঠল বৈতাল। বার বার চিক্কুর পাড়ে ক্যান তক্ষক, নিজের ভেতর নিজেই প্রশ্নের ঢেউ তুলল বৈতাল ঋষিদাস।

মাথার ওপর চাঁদ নিয়ে তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রাজশেখর। বৈশাখি গরম তেমন টের পাওয়া যাচ্ছে না জলঙ্গির পাড়ে জোলো বাতাস বইতে থাকায়। একটু দূরেই কেমন নদীর বুক থেকে একটা ঝির ঝির ঝির ঝির শব্দ উঠে আসছে। তার সঙ্গে পাতা জড়িয়ে খুব সন্তর্পণে কারও হেঁটে আসার ধ্বনি। দুই মহাগজ শুঁড় কপালের কাছে তুলে কী যেন ভেবে আচমকা ডাক দিতেই চারপাশের সমস্ত কিছুই যেন বদলে গেল কোন মন্ত্রবলে।

মেঘডম্বরু, মেঘপাল—খুব আস্তে আস্তে প্রায় বিড় বিড় করেই বলছেন যেন রাজশেখর। নদীর বাতাস যেটুকু ঝির ঝির শব্দ তুলেছিল, তা যেন হঠাৎই থেমে গেল হাতির প্রবল চিৎকারে। এমনকি পাতা মাড়িয়ে যারা কিংবা যে আসছিল, সেও যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল কোথাও। অন্ধকার ডোবান চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে রাজশেখর তখনই তাঁর চোখের সামনে দেখতে পেলেন ধূলিচন্দনের সেই থামওয়ালা বিশাল বাড়ি। বাড়ির মধ্যেই চণ্ডীমণ্ডপ। একটু দূরে কাছারিঘর, সরকার, আমলা, নায়েবমশাইদের বসার জায়গা, তারও ওপাশে আরও খানিক দূরে চাকর-দাসীদের থাকার ঘর, পিলখানা, আস্তাবল। ঠাকুরদা ভূপতিরঞ্জনের শখের চিড়িয়াখানা। পিলখানায় পায়ে মোটা মোটা লোহার শেকল বাঁধা মেঘডম্বরু আর মেঘপাল। তাদের নড়াচড়ায় শেকলের ঢন ঢনা ঢন শব্দ। সেই পুরনো আওয়াজটাই আবার নতুন করে ঘুরপাক খেতে লাগল রাজশেখরের মাথার মধ্যে।

দলমার পাহাড়ি পথ অথবা দুমকার রাস্তা ধরে নেমে আসা দুই হাতি চাঁদের দিকে তাকিয়ে নতুন করে ডেকে উঠলে কেন জানি না, বৈতালের হঠাৎই মনে হল কিছু একটা হতে চলেছে। কী হবে, কী হতে পারে—এসব কিছুই জানে না বৈতাল। কিন্তু তার বারে বারে মনে হচ্ছে এবার নিশ্চয়ই কিছু হবে।

সেই দুই বনবাসীর কাছাকাছি আসতে চেয়ে পা বাড়াতেই বৈতাল প্রায় ধমকে উঠল রাজশেখরকে। আহা, করেন কী! করেন কী মাইজাকর্তা! কী করতাসেন! বলেই বৈতাল আবার দুটি হাত ধরে ঝাঁকানি দিতে থাকে রাজশেখরের।

রাজশেখর সান্যাল তাঁর দীর্ঘদিনের পছন্দের অবলম্বনের মানুষটির কথায় যেন থমকে যান। সেই দুই বনচর হাতি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে চাঁদের আলোর নীচে।

সেদিকে তাকাতে তাকাতে কী এক প্রাচীন শোকে হু হু করে কেঁদে ফেলেন রাজশেখর।

তিন

অন্ধকারে নদীর গায়ে যদি চাঁদের প্রেমজল লাগে, তাহলে অন্যরকম হয়ে ওঠে নদী। এখন আষাঢ় মাসের এই শেষ রাতে, চারপাশে কেমন যেন ছন্ন গুমোট, সেখানে নদী তো ইতিহাসের ছেঁড়া পুঁথির পাতা। তাকে নতুন করে দেখতে হলে অনেক, অনেকক্ষণ ধরে ওলটাতে হবে।

চৈত্র পার করে পৃথিবী শেষ বৈশাখে এলে তেমন আর জল কোথায় থাকে জলঙ্গিতে। বরং কোথাও কোথাও শুকিয়ে আসা পাড়ের গায়ে থকথকে কাদা। আর সেই কাদা পার করে আরও খানিক পথ ফাঁকায় ফাঁকায় ঘাস জমি পেরিয়ে গেলে মহা মহা বৃক্ষ সব। রাতের অন্ধকার গায়ে মেখে ভূত হয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দেখলে ভয় করতে পারে কারও কারও।

আঁধার লেপা এইসব পালোয়ান পালোয়ান গাছেদের গায়ে হঠাৎ হঠাৎ আলো পড়লে তাদের চেহারা-চরিত্র সব বদলে যেতে থাকে। তখন এইসব গাছেদের বড্ড জ্যান্ত মনে হয়।

বৈতাল ঋষিদাস রাজশেখর সান্যালের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে আকাশের দিকে নিয়ে গেলেই সেখানে ভেসে থাকা চাঁদ দেখতে দেখতে রাজশাহির ধূলিচন্দনের কথা মনে করতে পারে। ধূলিচন্দনে পদ্মার পাড়ে এমনই ঘোলাটে চাঁদ শাদা বালির ওপর জ্যোৎস্নার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে ফিক ফিক মজা মারা হাসি হাসত। আর খানিক দূরে দাঁড়ান বন পালান দুই মহাগজ তখনও তেমনই স্থির। শুধু তাদের দুজোড়া গজদাঁতে চাঁদের আলোর কারুবাহার। ক্রমে চাঁদ পুবে আরও হেলে গেলে সেই আলোর রঙও কেমন যেন বদলে যায় নিয়মে। এটা তো বহুবার দেখা বৈতাল ঋষিদাসের রাজশাহির ধূলিচন্দনে, শেষ রাতে কর্তাদের খেয়াল খুশি মতো পাখি শিকারে গিয়ে। আকাশে তখন ফুটি ফুটি আলো। ঘোর শীতে অনেক অনেক দূর থেকে উড়ে আসা নানা ধরনের হাঁস, অন্য পাখি—সবাই সান্যালবাবুদের বন্দুকের আওতায় এসে গেলে নদী পাড়ের বাতাস ছিঁড়ে দিতে দিতে ধুড়ুম ধুড়ুম ধুড়ুম। বারুদের ধোঁয়া, পাখিদের প্রবল শব্দে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আকাশে উড়ে যাওয়া, বাকিরা কেউ কেউ গুলি খেতে চিত অথবা কাতরাচ্ছে। বৈতাল তখন খুবই ছোট। তাকে শিকার করা, ডানা ভাঙা মারা আধমরা পাখি কুড়িয়ে আনতে হত। বাবুদের তেমনই নির্দেশ। সেই অর্ডারের কোনো নড়চড় নেই। হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। এভাবেই শৈশব, বালকবেলার খানিকটা টুকরো কেটেছে বৈতাল ঋষিদাসের ধূলিচন্দনের দশ আনি সান্যালদের খিদমত করে। তাঁদের পোষা দুই হাতি মেঘডম্বরু আর মেঘপাল তখন সান্যালদের সাজান পিলখানায়। ঘোড়াশালে ঘোড়া। গিন্নিমা, বাড়ির বউ, মেয়েদের জন্যে পালকি।

বৈতাল ঋষিদাস শীতের ভোরে, বিকেলে ধূলিচন্দনের দশ আনি সান্যালবাবুদের মারা পাখি কুড়োয়। কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড় করে। তখন শীত হলেও বৈতালের পরনে একটা ট্যানাই। খালি পা। গায়ে জার আটকানর দোলাই। দু তিন ভাঁজ করা পুরনো কাপড়। সেটাই গায়ের সঙ্গে ভালো করে পেঁচিয়ে গলার কাছে গিঁট দেওয়া। খুব সুন্দর দোলাই বাঁধতে পারত মা। বৈতালের এখনও মনে পড়ে। সবাই তো সব কাজ ঠিক ঠিক পারে না। সায়েবরা, লালমুখো ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রের কখনও কখনও আসত শিকার খেলতে। শুধু পাখি—ছোট হরিয়াল, সরাল, নাকতায় তাদের হবে না। দরকার বিগ গেম। নিদেন পক্ষে চিতা, লেপার্ড নয়তো হরিণ। গুলবাঘ, বাঘবেড়াল, মেছোবেড়াল, বনবেড়াল—কত কি ছিল তখন। হরিণ, বুনো শুয়োর তাও হয়ত কিছু ছিল। বুনো শুয়োর তো ছিলই। আর ছিল

স্যাজা—মানে সজারু। কিন্তু সায়েবদের উৎসাহ বিগ গেমে। বিগ গেম—এই শব্দটা অবশ্য ঠিক ঠিক মনে পড়ে না বৈতাল ঋষিদাসের। তবে শিকারকে সায়েবরা নিজেদের ভাষায় কিছু একটা বলত, তা কিন্তু পরিষ্কার মনে আছে বৈতালের।

আমি মুখ্যু মানুষ। আমার অত দরকার কি মনে রাখার—এটুকু মনে মনে বলতে থাকে বৈতাল, তার নিজস্ব রাজশাহির টানে। সায়েবরা আসত, ফুর্তি করত। জাঙ্গল ফাউল—এই একটা কথা মনে আছে বৈতাল ঋষিদাসের। বনমোরগ বা মুরগি পেলে তাদের মহা আনন্দ। উল্লাসে একেবারে ফেটে পড়ত সায়েব বাচ্চারা। বনমুরগি বা বনমোরগ কিন্তু পাওয়া যেত না পদ্মা পারে। তার জন্য আলাদা জায়গা ছিল। বনমোরগ মুরগি ছাড়াও চরের পাখি—তাদের আরও আরও কি কি সব বলে যেন ডাকত সায়েবরা। তাদের পরনে তখন শিকারের পোশাক—খাকি হাফ প্যানট, নেমে এসেছে হাঁটু ছাড়িয়ে। দুদিকে বড় বড় পকেটঅলা ফুল হাতা ঐ একই রঙের শার্ট। সেই সব বুক পকেটে আবার কায়দার ঢাকনা। মাথায় শোলার টুপি। তার আবার বাহারি নাম আছে স্ট্র হ্যাট—এটাও মনে আছে বৈতালের। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ঘণ্টা দু ঘন্টা আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা অনেক সময় মনে না থাকলেও ছোটবেলার এরকম বহু ঘটনা গেঁথে বসে আছে মনে। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত গাম বুট। কখনও কখনও পট্টি সমেত চামড়ার ভারি বুট। এই তো গোরা সায়েবদের শিকার করার পোশাক তখন।

একবার তো একটা বীর হনুমান খুব অত্যাচার করছে পাগল হয়ে গিয়ে। তা কত্তাবাবু—মানে দশ আনি সান্যালদের বড় কর্তা বা অন্যরা, এঁরা তো কেউ মারবেন না হনুমান। হনুমান রামের ভক্ত, ব্রাহ্মণ। তাকে মারা মানে মহাপাপ। কিন্তু প্রজাদের জীবন তো অতিষ্ঠ করে দিচ্ছে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া হনুমান। সেই খ্যাপাটে রামভক্তকে নিয়ে হুজ্জতের আর শেষ নেই। যা তা করে বেড়াচ্ছে। প্রায় সমস্ত ধুলিচন্দনই তার ভয়ে সব সময় তটস্থ। কামড়ে-আঁচড়ে, মাঝে মাঝেই একেবারে কেলেঙ্কারি করছে সেই হনুমান। বিশেষ করে মেয়েদের ওপর তার যেন বেশি আক্রোশ আর রাগ। বাচ্চা, বুড়ো, মাঝবয়েসি —যে কোনো বয়েসের মেয়ে হলেই হল। তাকে দেখলেই ছুটে গিয়ে ধরতে চাইবে। কোথায় কোন আড়ালে যে লুকিয়ে থাকে এই হনুটি, বোঝা মুশকিল। তারপর হঠাৎ হঠাৎই বলতে গেলে এক রকম আচমকাই তার আত্মপ্রকাশ। সামনাসামনি এসেই তার যত বিক্রম, বিশেষ করে যদি কোনো মেয়েছেলে হয়।

মাইয়া মাইনষ, মাইয়া ছাওয়াল, মেয়েছেলে এসব শব্দ শুনলে আজকাল অনেকেই বেশ রেগে টেগে যান, এরকম দেখা আছে বৈতালের। মাইয়া মাইনষেরে মাইয়া মাইনষ কমু না তো কি কমু! ভেতরে ভেতরে এরকম বলে দিলেও আদতে ব্যাপারটা বুঝতে পারে না বৈতাল। তো সে যা হউক গিয়া, সেই

বান্দরে—মানে হনুমানকে মারার জন্য সায়েব শিকারি এল। তখনও তো পার্টিশান হয়নি। শহর বাজারে লিগ, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, নেতাজি সুভাষের ফরোয়ার্ড ব্লক, কোথাও কোথাও লাল ঝান্ডা চললেও গ্রামে গ্রামে কিন্তু তখনও বেশ চুপচাপ, নিস্তরঙ্গ সব কিছু। মাঝে মাঝে একটা দুটো ঘটনা ঘটছে না যে তা নয়, কিন্তু সে সব ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তারপর অবশ্য একদিন বলা নেই, কওয়া নেই দাঙ্গার বাজ ভেঙে পড়ল ধূলিচন্দনের মাথার ওপরেও। মেগডম্বরু, মেঘপাল— ধূলিচন্দনের দশ আনি সান্যালদের দুই পোষা হাতি তাদের পিলখানা, মাহুত, ভৈ, মেঠ, ঘোড়াশালের সহিসরা—সবাই তো সব সময় মুখ কাঁচুমাচু করে থাকে। কি হয় কি হয় ভাব সমস্ত সময়। দশ আনি সান্যালদের বড় দেউড়িতে, খিলানের পাশে জমে থাকা পায়রারা কখন যেন ডাকতে ভুলে গিয়ে সব একেবারে পাথর মূর্তি। তাদের গলার অনবরত বকবকম, বকবকমও শোনা যায় না দুপুরে, ভোর ভোর।

লোহার গেট আরও মজবুত হল দশ আনি সান্যালদের। দেউড়ির বন্দুকধারি ভোজপুরি দারোয়ানের সঙ্গে সঙ্গে পাহারার লোক বাড়ানর দল চলে এল, চারজন নেপালি বাহাদুর। চারজন ভোজপুরি বরকন্দাজ, তারসঙ্গে চারজন নেপালি। এছাড়া গোয়ালা, নমঃশূদ্র, উগ্রক্ষত্রিয় আর ঋষিদাসরা তো ছিলই। তারা সব পাক্কা লাঠিয়াল, সড়কিয়াল। এই সব ঘোষ, আগুরি, পোদদের সঙ্গে একমাত্র লাঠিবাজি সড়কিবাজিতে পেরে উঠত চরের মুসলমানরা।

সমস্ত সান্যাল বাড়ি জুড়েই সাজ সাজ রব।

কর্তারা বন্দুকে তেল দিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করাচ্ছেন নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে। টোটার মালা সব ঠিকঠাক আছে কিনা তাও দেখা হচ্ছে। পেতলের গাঁট বাঁধান তেল-জলে পাকান বাঁশের লাঠি নিয়ে মহড়া দিচ্ছে লাঠিয়াল বাহিনী। সঙ্গে সড়কি, ল্যাজা, ট্যাটা। তলোয়ার, বল্লম, পাঁঠা বলি, মোষ বলির রামদা, খাঁড়া—এসবও বেরিয়ে এসেছে যেন কোন কোন আড়াল থেকে। তাতে দিবারাত্র শান পড়ছে।

বাতাসে ভাসছে নানা গুজব।

মহল্লায় মহল্লায় নাকি ফুটন্ত গরম জল, ফুটতে থাকা আগুন আগুন সরষের তেল, ইট আর পাথরের বড় বড় টুকরো ঢিবি করে রাখছে সবাই। হিন্দু মহিলারা শঙ্খ নিয়ে রেডি, শাঁখ বাজলেই বিপদ সংকেত বুঝে নিতে হবে তখন। তারপরই তৈরি হয়ে যেতে হবে।

বৈতালের মনে পড়ল এইসব টাল-মাটালের মধ্যেই খোলা মাঠে বাজ পড়ে মারা গেল সান্যালবাড়ির দুজন মুসলমান মুনিষ। পাশের বড় সড়—ঠিক পাশের নয়, প্রায় আধ মাইল দূরের বিশাল বটগাছের মাথাতেও বাজ পড়ল।

আকাশ থেকে নেমে আসা আগুনে ঝলসে গেল সেই গাছ। আর সান্যালদের মুনিষ দুজন—মনা আর কালা একদম বেগুন পোড়া যাকে বলে তেমন করেই ঝলসে গেল।

ফাঁকা মাঠে কেউ থাকে বজ্র-বিদ্যুৎ পাতের সময়। কিন্তু মরণ ডাক দিলে কিছু তো আর করার থাকে না। দুই ভাই—দুইজনেই মোসলমান, মনে পড়ল বৈতাল ঋষিদাসের এত বছর পর, দুই জনেই এক্কারে শ্যাষ।

বাজ পড়লে বলে সবাই গাছের নিচে দাঁড়াবা না। গোবর পইড়্যা থাকলে তার পাশে যাইয়া চক্ষু বুইজ্যা শুইয়া পড়বা। গোবর নাকি বিদ্যুৎ থিকা বাচায়। অইব হয়ত। জানে আর কেডায়! কিন্তু মাঠে সব সময় আর কোথায় গোবর। থাকলে. পাইয়া গ্যালে শুইয়া পড়।

বাইরে চাপা গুজব, যখন তখন যেমন যেমন খবর আইস্যা পড়ে। তার কোনো মাথাও নাই মুন্ডুও নাই। যে যেমন পারতাসে, যা প্রাণে চায় রটাইতেসে। এর মধ্যেই সান্যালগো কর্তারা তাগো বাড়ি পাহারা অন্যের জমি দখল, নিজেগো সম্পত্তি রক্ষা, প্রজা উচ্ছেদ, একটু ঘাড় কাইত করা, কথা না শোনা রায়ত গো মাথায় ডান্ডা মারনের জইন্য যে লাঠিয়াল সড়কিয়াল, তাগো ভিতর থিকা বাইছা বাইছা মাথার থিকা উকুন, উকুনের ডিম, নিকি বাইর করনের মতো কইর‍্যা মোসলমান গো ওপর নজরদারি চালাইতেসে। হেয়াগো হাতে কোনো অস্ত্র নাই। সড়কি, লাঠি, বল্লম, ল্যাজা, ট্যাটা সব ঘোষ, আগুরি, পোদগো হাতে। তার উপর বন্দুকধারি ভোজপুরি আর ভোজালি সমেত নেপালি পাহারাদার তো আছেই। এসব কইরাও সান্যাল বাবুগো ঘুম নাই।

তখনই শুনসিলাম কি, নাকি আরও পরে অথবা আগে এই রকম এক ছিকুলি—

শ্যাখের লগে না করিও দোস্তি
তবু যদি করবা দোস্তি
তা হইলে ল্যাজা রাখবা মধ্যস্তি

পুরাডা ঠিক ঠাক হয়ত কইতে পারলাম না। কিন্তু তা কথাডা প্রায় এই রকমই, সামাইন্য এদিক ওদিক, মানে যারে কয় কিনা ব্যাস কম হইতে পারে। কিন্তু মূল ভাবটা তা-ই-ই।

এদিকে তো দুই মোসলমান মুনিষ মনা আর কালা বাজ পইড়া মরসে দেইখ্যা খবর একটু একটু কইর‍্যা ছড়াইসে। কোথথিকা যেন গন্ধ শুকতে শুকতে হাজির লিগের এক পান্ডা। হিন্দু জমিদার গো জমিতে কাম করতে করতে এইভাবে যদি মোসলমান মুনিষ মরে, তা হইলে দায়িত্ব কার? এতো রাজার পাপে প্রজার পাপ। প্রজা মরে রাজার পাপেই। এই জন্যই আল্লার গজব নামসে।

বৈতালের মনে পড়ে লিগের সেই প্রথম মিটিং ধুলিচন্দনে। —ভাইসব, আপসোস আপসোস। জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান। জজ-ব্যারিস্টার হিন্দু, কয়েদি মুসলমান। আপসোস আপসোস। তাই ভাই সব দরকার পাকিস্তান। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। নারা এ তকদির, আল্লা হো আকবর।

ভাইসব, মুসলমান ভাইয়েরা জোর দিয়ে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বলুন, নারা এ তকদির। আল্লা হো আকবর।

সঙ্গে সঙ্গে সবুজ জমির ওপর শাদায় চাঁদ-তারা আঁকা পতাকা এক সঙ্গে দুলে ওঠে মাথার ওপর। আকাশের রঙ যেন তখন সবুজ। দূর দূর থেকে এসেছেন গরীব মানুষ লিগের সভা শুনতে। তাঁরা বেশির ভাগই ইসলাম ধর্মের।

নারা এ তকদির।

নারা এ তকদির।

আল্লা হো আকবর।

আল্লা হো আকবর।

লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

জনকল্লোলের মুখে মুখে ছড়াতে থাকে স্লোগান। লিগের পান্ডাদের সঙ্গে গলা মেলান সাধারণ মানুষ।

পাকিস্তান। পাকিস্তান। বাতাসে ফিস ফিস করে ভাসতে থাকে কথাটা।

তারপর তো হিন্দু মহাসভাওয়ালারাও বসে থাকে না। কালিবাড়ি, ব্যায়ামাগার, যেখানে যেখানে সংঘবদ্ধ হয় হিন্দু যুবকরা সেখানেই ফিসফাস। ফিসফাস। গোপনে শলা-পরামর্শ। গুজব লাঠি, সড়কি, তলোয়ার, ছোরা, বল্লম তৈরি রাখা। দশ আনি সান্যালদের বাড়ি ঢাকা থেকে মহাসভার এক নেতা আসেন। তাঁর সঙ্গে কলকাতার দুইজন বড় নেতা। এত সব কথা জানার মতো অবস্থা নয় বৈতাল ঋষিদাসের। কিন্তু আজ —এই শেষ বৈশাখি চাঁদের আলোয় জলঙ্গি নদী সাঁতার দিয়ে দুই হাতির সঙ্গে পেরনর পর এপারে—ইনডিয়া থেকে বাংলাদেশে এসে বৈতাল ঋষিদাস, আর রাজশেখর সান্যাল—দুজনেই বেশ খানিকটা অথই জলে, বৈতালের খেয়াল হয়েছে এলাকাটা বি এস এফ এর নয়, বি ডি আর-এর। কে জানে কখন যে এস এল আর হাতে হাজির হবে ফৌজি উর্দি, ছবিটা ভাবলেই বুক কেঁপে উঠে বৈতালের। মাইজাকর্তার তো কোনো হোদবোধ নাই। হঠাৎ এই বন থিকা বাইরান দুইখান হাতিরে দেইখা তাগো মেঘডম্বরু আর মেঘপাল—ধূলিচন্দন এস্টেটের দুইখান হাতির কথা মনে পড়সে।

ধূলিচন্দনের দশ আনি সান্যালগো এস্টেটের হাতি—সেই হাতির কথা মনে পড়তে, এই দুই বুনো হাতির পেছন পেছন জলঙ্গি নদীর জল পেরিয়ে তারা দুজন এপারে।

দূরে তক্ষক ডাকল আবারও।

একবার, দুবার, তিনবার।

অন্ধকার রাতে তক্ষকের ডাক বেশ ছমছমানি ধরিয়ে দেয় সমস্ত গায়ে।

এখন গরম যথেষ্ট। বৃষ্টির লেশ মাত্র নেই কোথাও। চাঁদের দিকে তাকালে এমন

ঝকঝকে আর খুশি খুশি ভাব তার—দেখলে মনে হবে পৃথিবীর কোথাও কোনো দুঃখ নেই, গ্লানি নেই। ভিজে জামা-কাপড় শেষ রাতের বাতাসে গায়েই শুকোচ্ছে। বৈতালের নয় এসব অভ্যাস আছে। কিন্তু মাইজাকর্তা রাজশেখর সান্যালের ঠাণ্ডা না লেগে যায়।

বৈতাল ঋষিদাস তো সেই ছেলেবেলা থেকেই বলতে গেলে বাবুদের পাত কুড়ুনি খেয়ে মানুষ। বাবুদের সঙ্গে এখানে ওখানে সেখানে খিদমত খেটে বেড়ানই তার কাজ। কোনো প্রশ্ন না করে শুধুই সেবা করে যাওয়া। সেই সব পাখি শিকারের দিন, পদ্মার চরে, চলজ বিল, ডাকিনি বিল, বড়তি বিলের ধারে—যেখানে শীতের অজস্র পাখি। বন্দুক দাগলেই লালচে সূর্যের মুখে, গায়ে কালির ফোঁটা এঁকে দিতে দিতে পাখিরা উড়ে যায়। তারপর শুয়োর বা হরিণ মারার অভিযানে, নয়ত চিতা বাঘ, লেপার্ড বা গুলবাঘা, গোবাঘা খুজে খুঁজে মারার সেই সব বিগ গেমে বৈতাল তো বাবুদের, সায়েবদের সঙ্গী।

শীতের সকালে গুলি বেঁধা, ডানা ভাঙা, মর মর, আধমরা পাখি তুলতে বৈতাল তো দিব্যি গায়ের ত্যানা আর দোলাই খুলে ঝাঁপ দেয় জলে। তার তো জলে নামার আগে সরষের তেলও লাগে না। কারণ সে বৈতাল ঋষিদাস। বার বার লাফ দিয়ে জল তোলপাড় করে বৈতাল। গুলি বেঁধা পাখি ঘাপটি মেরে থাকতে চায় এদিক ওদিক। নদীর চরে তখন শুকনো কাশফুলের ডাঁটা, তার গায়ে কালো কালো ছোপ কারা যেন কাল রাতে আগুন দিয়েছে তাপ পোয়ানোর জন্য, এরকম করেই শীত কাটায় গরীব মানুষ। বড়তি বিলের পাশে পাশে নলখাগড়ার ঝোপে হয়ত জাতি সাপ চুপচাপ বুকে হেঁটে চলে যায় শীত ঘুমে। নয়ত কালাজ বা শাঁখামুটি। জাত গোখরো, শঙ্খচূড় একটুতেই ফোঁস করে, ফণা ধরে। কালাজ বা শাঁখামুটি তেমন নয়। কিন্তু তাদের বিষেও বিপদের নীল ঘন্টা টাঙান থাকে। তাছাড়া জোঁক। বড় বড় জোঁক। জোঁকেরা বড্ড রক্ত ভালোবাসে। বিশেষ করে বৈতাল ঋষিদাসের মতো হাঘরে মানুষের রক্ত। বড় মানুষ, বাবুদের রক্ত পেলেও মন্দ হয় না। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে কোথায়? তারা তো গামবুট আর আরও কি কি সব ঢাকা ঢাকনা দিয়ে তবে আসে। জোঁকেরা রক্ত খেতে খেতে এক সময় একদম টাবটুব হয়ে তারপর খসে পড়ে গা থেকে। খসে পড়ার পর খানিকটা কাঁচা রক্ত বুঝি ছিটকে নামে তাদের গা থেকে। তারপর যদি নুন দেওয়া যায়, তাহলে তো কথাই নেই। রক্ত যখন উপচে বেরিয়ে আসতে থাকে জোঁকের মুখ আর সারা গা দিয়েও। সে এক ঘিনঘিনে দৃশ্য।

বৈতাল ঋষিদাস এরকম নানা কথা মনে করতে পারে নদীর বাতাসে নিজের সারা গা জড়িয়ে নিতে নিতে। রাত ফুরিয়ে আসা আকাশে চাঁদ যেন আরও টসটসে। সে দিকে তাকিয়ে থাকলে নানা কথা মনের ভেতর, বুকের মধ্যে ঘাই মারে।

শীতের সকালে বা বিকেলে সান্যালবাবু আর গোরা সায়েবদের গুলি খাওয়া পাখি কুড়িয়ে আনতে বৈতাল ঋষিদাস গায়ের কাপড় ফেলে দিগম্বর হয়ে ছুটোছুটি করে বার বার যায়, আসে। তার কালোকুলো ন্যাংটো শরীর ছুঁয়ে নদী অথবা বিলের শাদাটে জল কেমন যেন ছবি হয়ে যায়। শাদার গায়ে কালো, নয়ত কালোর গায়ে শাদা—সবটাই সান্যালবাবুদের কাছে, সায়েবদের কাছে বেশ দেখার মতো। বৈতাল ঋষিদাসের প্রথম প্রথম খুব শীত লাগে। হি হি কাঁপুনি। ঠক ঠক করে দাঁতে দাঁত লাগে। কিন্তু বাবুদের জন্য গুলি লেগে লাট খাওয়া পাখি আনতে আনতে গা যেন খানিকটা গরম হয়ে যায় ছোটাছুটিতে। এসব করেও তার সর্দি লাগেনা। জ্বর-জারি হয় না। তার কারণ সে ঋষিদাসদের বাচ্চা। ঋষিদাসদের আবার অসুখ হতে আছে নাকি! তারা তো পাথর নয় তো লোহার তৈরি। কি কি সব কাজে, মহালের আদায়-পত্তরে বাবুরা সব সিরাজগঞ্জ, লালমণির হাট, রংপুর, নাটোর, পুটিয়া, আর আরও আরও কোথাও কোথাও গেলে বৈতাল ঋষিদাসের বাপ তাঁদের সঙ্গে যায়। খিদমত, দেখভাল করে বাবুদের। কারণ সান্যালবাবুরাই তো তাদের অন্নদাতা। মা, বাপ, মালিক।

সাঁতার দিয়ে জলঙ্গি পার হয়ে ইনডিয়ার দিক থেকে বাংলাদেশে আসা দুই মহাগজ চাঁদের আলো সারা গায়ে মেখে নিয়ে একদম চুপচাপ। গাছের কোটরে থাকা প্রাচীন তক্ষক ডাক দেয়—খক খক খক খক খক খক।

বুড়ো তক্ষক কমবয়েসি তক্ষকটিকে বলে, এই যে রাজশেখর সান্যাল নদী সাঁতরে হাতির পেছনে পেছনে ইনডিয়া ছেড়ে বাংলাদেশে চলে এসেছে, তাকে আমি ভালো করে চিনি।

নবীন - কেমন করে চিনলে?

প্রাচীন - ধূলিচন্দনে ওদের বড় এস্টেট।

নবীন - সেটা কোথায়?

প্রাচীন - রাজশাহিতে।

নবীন - অ। তা এখানে, বর্ডার পেরিয়ে অন্যদেশে এসে পড়েছেন এই দুজন। এবার তো বিপদ হবে।

প্রাচীন - তা তো হতেই পারে।

নবীন - বর্ডার খুব ডেনজারাস জিনিস।

প্রাচীন - ডেনজারাস বলে ডেনজারাস! একেবারে সর্বনাশের মাথায় পা।

নবীন - থামো, আর ইংরেজি বলতে হবে না। বাংলা বললেই বুঝতে পারছি আমি।

প্রাচীন - কেন, এই যে তুমি ইংরেজি বললে। তার বেলা বুঝি কিছু না। আর মাঝে মাঝে একটু ইংরেজি বলা ভালো।

নবীন - কেন?

প্রাচীন - তাতে লোকে শিক্ষিত আর স্মার্ট বলে।

নবীন - অ তাই! এদিকে তো তুমি গেঁজু করছ?

প্রাচীন - গেঁজু করছ মানে?

নবীন - গেঁজু হল গিয়ে গেঁজু।

প্রাচীন - সে আবার কি! ভেঙে বল।

নবীন - না, মানে গেঁজু হচ্ছে গিয়ে একেবারেই গেঁজু।

প্রাচীন - ওসব কায়দা করে আড়ে ভিড়ে নয়, একদম সোজাসুজি বল।

নবীন - গেঁজু মানে হল গিয়ে ফেনান। গেঁজান। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা।

প্রাচীন - সে আবার আমি করলাম কোথায়?

নবীন - সব সময়ই করছ। একই কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে...।

প্রাচীন - কোথায় ফেনালাম! তুমি যা জিগ্যেস করেছ, তারই উত্তর দিয়েছি।

নবীন - ঠিক আছে, খুব হয়েছে, এবার থেমে যাও বাবা।

প্রাচীন - ওকে। ওকে। স্যরি, ঠিক আছে। ঠিক আছে।

তক্ষকদের এইসব সংলাপ বৈতাল কান খাড়া করে শোনে। তারপর মিটিমিটি হাসে। এসব ভাষা তার বহুদিনের পরিচিত। খানিকটা দূরে আরও বড়সড় কোনো গাছের মাথায় যে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি চুপচাপ বসে ছিল এতক্ষণ, তারা বলে ওঠে ধূলিচন্দনের সান্যাল বাড়ির সেই যে লোকটা, সে আবার ফিরে এসেছে এই দিকে। এক সঙ্গে একই কথা বলার পর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ব্যাঙ্গমা বলে, আন্ধারে যে দুজন জিন বা খব্বিশ জিনের লাখান আইল ওরা সন্ত্রাসী বা চান্দাবাজ নয়ত।

ব্যাঙ্গমি - জি!

ব্যাঙ্গমা -নদী পার হইয়া এদিক এত রাতে চুপচাপ আসছে। ট্যার পায় নাই কি বি এস এফ? বি ডি আরও কি দ্যাখে না। হ্যারা কি সন্ত্রাসী না চান্দাবাজ?

ব্যাঙ্গমি -জি!

ব্যাঙ্গমা - কি বইয়া বইয়া ঘুমাও আর জি জি কর। চক্ষু দুইখান খুইল্যা দ্যাখ, কারা আইল এই হানে। আমার তো গতিক বিশেষ ভালো মনে হইতাসে না।

ব্যাঙ্গমার ধমকে ব্যাঙ্গমি খানিকটা ধড়মড়িয়ে উঠে কোন কথার কি ধরবে—আগা না মাথা, সে সব ভাবতে ভাবতে আচমকাই বিড় বিড় করে বলতে থাকে, তাই তো, সোনারকাঠি, রূপারকাঠি, পংখিরাজ, কুচবরণ কইন্যা, হেয়ার ম্যাঘবরণ ক্যাশ, দুধকুমার, লালকমল-নীলকমল, বুদ্ধু ভূতুম, মন পবনের নাও, পেরান ভোমরা —আরও কী কী সব বলতে যাচ্ছিল ব্যাঙ্গমি। তাকে এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল ব্যাঙ্গমা। বলল, কথা হইতাসে চন্দাবাজ, সন্ত্রাসীর—অনুপ্রবেশও হইতে পারে, আর উনি আইলেন সদালতি করতে। সোনার কাঠি রূপারকাঠি, কুচবরণ কইন্যা ম্যাঘবরণ ক্যাশ, লালকমল নীলকমল। যত্ত সব অস্বৈরণ—

ব্যাঙ্গমি - কি কমু তা হইলে?

ব্যাঙ্গমা - কিসু কবা না। চুপ কইর‍্যা মুখে পিঠা দিয়া বইয়া থাকবা।

ব্যাঙ্গমি - যদি সত্য সত্যই চান্দাবাজ, সন্ত্রাসী হয়!

ব্যাঙ্গমা - হইলে হইব।

ব্যাঙ্গমি -আমাগো সুখ বহুদিন গেসে গিয়া। অখন শুধু গাছের উপর, বিরিক্ষ শাখায় বইয়া বইয়া ঘুমাই। দ্যাশে রাজা নাই। সইত্য সইত্য রাজা না থাকলে ব্যাবাক মুশকিল। রাজার রক্ত না পাইলে তো আমাগো বাসসা কাসসার চোখ ফুটে না। এমনিতেই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি গো ফেমিলি প্ল্যানিং। চারপাশে এন জিও-র লোকজন ঘুরতাসে। বেশি বাচ্চায় কাম নাই। হেই অবস্থায় যা বাচ্চা বিয়াইতেসে, সব অন্ধ। রাজার রক্ত না হইলে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির বাসসার চক্ষু ফোটে না।

রাজরক্ত কি অত সোজা! চাইলেই পাওয়া যায়! তার জন্য সময়, ক্ষণ, সুযোগ লাগে।

কিন্তু আমাগো পোলা মাইয়ারা তো সব অন্ধ। উপরওয়ালা কি একবার চাইয়াও দ্যাখে না! নাকি তারও চক্ষু দুইখান কানা হইয়া গেসে গিয়া।

ব্যাঙ্গমির এই বিলাপের কোনো জবাব দিতে পারে না ব্যাঙ্গমা।

দলমা থেকে অনেক অনেক দূর হাঁটতে হাঁটতে আসা ইনডিয়ার দুই হাতি এখন জলঙ্গি সাঁতরে এপারে চলে এসে চাঁদের আলোয় আলোয় পেছল হয়ে যাওয়া অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। এখানে কোনো তাড়া নেই। হুলা পার্টির হই-হুল্লোড়, মশালবাজি, পটকা ফাটান—কিছুই নেই। ফলে খানিকটা অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। হা-রে-রে-রে করতে করতে হঠাৎ ছুটে আসা হুলা পার্টি বড্ড জ্বালায়। আগুন মুখে নেওয়া মশাল ছুড়ে মারে আমাদের গয়ে। টায়ার জ্বালান আগুন দিয়ে ভয় দেখায়। তার ওপর পটকার ধুড়ুম ধাড়াম — সে তো আছেই।

এই যে আশ্চর্য নীরবতা, এর মধ্যেই দুই মহাগজ কেমন যেন নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে। তাদের আপাতত কোনো তাড়া নেই। কেন না কেউ তো এখন তেড়ে আসছে না পেছন পেছন।

গাছের অন্ধকার মাখা সবুজের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকিদের কি চমৎকার বসাবসি। তাদের সেই আলো বাহার, দূর থেকে দেখলে মনে হবে হাজার হাজার প্রদীপের আলো বুঝি বা ফুটে আছে অন্ধকার মাঠে। সেই সব আলোর কুচি জোনাকিরা কখনও কখনও দল বেঁধে ইনডিয়া থেকে আসা নদী পেরন হাতিদের গায়েও এসে বসছে। সেই যে আলোর সাজ, তা গায়ে লেগে থাকায় মহা খুশি হাতিরাও। জোনাকি ছোঁয়া দুই হাতিকে হঠাৎ দেখলে মনেই হতে পারে তারা যেন চন্দননগরে তৈরি হওয়া কোনো আলোর কারসাজি।

বৈতাল ঋষিদাস চাঁদের আলোয় খানিকটা স্পষ্ট, কিছুটা আবছা রাজশেখর সান্যালের মুখের দিকে তাকাল। তেমন করে পরিষ্কার কিছু বোঝা না গেলেও বোঝা না বোঝার একটা রেখা যেন তৈরি হয়ে আছে তাদের মধ্যে।

রাজশেকর সান্যাল গলা খাকারি দিয়ে বললেন, বৈতাল!

হ মাইজা কর্তা।

আমার কথা কানে ঢোকসে!

হ কর্তা।

হ কর্তা! কি সৌভাগ্য আমার। এ সৌভাগ্য শুধু আমার না। আমার বাপের। তার বাপের। বলা যাইতে পারে ব্যাবাক সান্যাল গুষ্ঠির।

আইজ্ঞা মাইজা কর্তা।

আইজ্ঞা মাইজা কর্তা! হারামজাদা।

এতক্ষণে বৈতাল ঋষিদাস রাজশেখর সান্যালের মেজাজ যে সঠিক আছে, তা টের পেয়ে গেল। কর্তা যখন গাইল পাড়েন, বৈতাল বোঝে হগগল বিষয় ঠিক আছে। সেই পাগলা বীর হনুমানকে সাহেব শিকারী তিন দিন চার দিন ধরে অনুসরণ করতে করতে শেষে এক দিন ফেলে দিল দোনলা বন্দুকের ধাক্কায়। ডাবল ব্যারেল গান থেকে উড়ে আসা সিসের গরম টুকরো এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল সেই হনুমানকে।

মরার আগে সে নাকি দুহাত জোড় করে ক্ষমা চেয়েছিল শিকারীর কাছে। শিকারী অবশ্য শোনে নি। তার তখন ট্রিগারে ডান হাতের তর্জনী। চোখ স্থির হয়ে আছে বন্দুকের নলে রাখা মাছির গায়ে। তার মানে টার্গেট একেবারে ফাইনাল। এবার শুধুই ঘোড়া দাবিয়ে দাও। ব্যস—সঙ্গে সঙ্গে ধুড়ুম। ধাড়াম।

সেই মহা-লাঙ্গুলের বুকে নাকি ভর্তি শাদা শাদা লোম ছিল। সেখানে নাকি অনেকেই দেখছে বাংলায় লেখা আছে রামসীতা। সাহেব শিকারী তো বাংলা পড়তে পারে না। আর রামে কিংবা সীতায় তার তেমন কোনো আগ্রহ নেই। ফলে গুলি চালাতে দেরি হয় না। আর তারপরেই হনুমন্ত ভূলুণ্ঠিত হয়। ধুলিচন্দনের এইসব সাত পাঁচ টুকরো টাকরা মাঝে মাঝেই চোখে ভাসে বৈতালের। বৈতাল সে সব দেখে। কিন্তু সবটা ঠিক ঠিক বলে সবসময় বুঝিয়ে উঠতে পারে না। ফলে তাকে কখনও কখনও একদম যাকে বলে ভোম মেরে যেতে দেখে সান্যাল গুষ্ঠির মাইজাকর্তা, একদা রাজশাহির ধুলিচন্দন এখন মুর্শিদাবাদ নিবাসী রাজশেখর সান্যাল মাঝে মাঝেই বলে ওঠেন, হারামজাদা, দুই কানই গেছে তোমার! যারে কয় পুরা বয়রা হইয়া গেস গিয়া।

বৈতাল কোন সে অতল থেকে ঝাঁকুনি খেয়ে ফিরে এসে যেন বলে, হ মাইজা কর্তা। আইজ্ঞা।

আবার আইজ্ঞা। করতাস কি তুই। সদা সর্বদা কথা না শুইন্যা আইজ্ঞা। হেয়া তো মাইগ্যা ভাউড়ারা করে, তাগো বউয়ের কথায় সর্বদা সায় দেয়। বউ যা কয়, তাতেই সে রাজি। সম্মতি দিয়া দেয় সর্বক্ষণ।

হ মাইজা কর্তা।

এইবার তরে আমি থাবড় দিমু।

মারেন। কত মাইরই তো খাইসি আপনের হাতে। অখনও খাই। হেয়ায় আমার খুব ব্যাসকম হয় না।

তা আইব ক্যান! ঘাউড়ার পোলা ঘাউড়া। তর বাপে আসিল এক ঘাউড়া। সারা জীবন আমার বাপের জ্বালাইসে। তর ঠাউরদাও তাই—সেও কম হারামজাদা নাকি। এখন তুই হইছস। ঘাউড়ার পোলা ঘাউড়া।

রাজশেখর যখন এসব কথা বলে যান, তখন চুপ করে থাকে বৈতাল। কর্তার কথায় এই সময় বাধা দেওয়া মানে আরও আরও অনেক গালি, কটু কথা শোনা। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না বৈতালের। বরং সান্যাল গুষ্ঠির মাইজা কর্তা যখন কন, হারামজাদা, জুতাইয়া তোমার মুখ আমি ছিড়া ফালামু, তখন তো মনে মনে বেশ মজাই পায় বৈতাল ঋষিদাস। মানুষটি হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেও মন্দ নয়। আর তাকে সঙ্গে নিয়েই তো এত এত বছর কেটে গেল বৈতাল ঋষিদাসের। জীবনের বাকি যে কটা বছর, তাও নয় কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

অন্ধকারে চাঁদের জল-বাতাসা মুখে নিয়ে হঠাৎই যেন হেসে উঠল নদী। সেই হাসির কলধ্বনি চোখ এড়িয়ে গেল বৈতাল আর রাজশেখরের। দূরে দুই হাতি তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বাতাসে আবারও ভেসে এল তক্ষকের ডাক। কেন যে বার বার ডাকে তক্ষকেরা! মনে মনে ভাবল বৈতাল। ধুলিচন্দনে বড়তি বিলের পাশে মস্ত পাকুড় গাছের খোপে বুড়ো তক্ষকের যে বাসা ছিল, তার কাছাকাছি রাতের বেলা তো কোন ছার, সন্ধের পরেও কোনো সম্ভাবনা নেই যাওয়ার, এমন কি দিনের বেলাতেও যেতে বেশ ভয় ভয়ই লাগত। এখনও কি আছে সেই মহা-পাকুড়। কি আলিশান তার শেকড়-বাকড়, ডাল-পালা। বহু বহু বছরের আয়ু পার করা পাকুড়ের ছায়া ভেসে উঠত বড়তি বিলের জলে। সেখানে— সেই জলের গায়ে গাছের ছায়া দেখেও মাঝে মাঝে বুঝি কেঁপে উঠত বুক। সেও তো কত কত দিন হয়ে গেল। কালো জলে পাকুড় গাছের কালো ছায়া। অথচ দুটো কালোর মধ্যে ফারাক অনেক। সেইসব গাছের মাথায় শাদা শাদা বক। সেইসব বগুলার ছায়াছবিও বড়তি বিলের কালো জলে। দূরে দূরে ঝুরি নামান বট, অশ্বত্থ।

পাকুড়ের গভীর কোটর থেকে তক্ষক ডাকে।

একবার দুবার তিন বার। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যায় বৈতাল ঋষিদাসের।

এখন এই ছায়াঘন শেষ রাতে নদীর পাড়ে রাজশেখরের পাশাপাশি, বলতে গেলে তাকে আগলে আগলে দুই হাতির সঙ্গে সাঁতার দিতে দিতে জলঙ্গি পেরিয়ে আসা বৈতাল আকাশের দিকে তাকায়। সেখানে এখনও চাঁদের আশ্চর্য ঘোর। সেই ঘোরের মধ্যে বৈতাল ঋষিদাস আর কিছু খুঁজে না পেয়ে হাতড়াতে থাকে কত কি!

রাজশেখর হঠাৎই বলে ওঠেন, চল, ধুলিচন্দন যাই গিয়া।

সে অনেক কোশ পথ মাইজা কর্তা।

না, এমন কি দূর। চল হাঁটি। আইয়াই যখন পড়সি।

আপনে পাগল হইলেন নাকি! এখান থিকা ধূলিচন্দন, এই আন্ধারে—

আন্ধার তো কি হইসে! দশ আনি সান্যাল বাড়ির পোলা আন্ধাররে ডরায় নাকি! চল আউগাই। বলেই রাজশেখর অন্ধকারে এগিয়ে যেতে চান।

বৈতাল কোনো কথা বলে না। দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। ঘাড় নিচু।

ঘাউড়ার পোলা ঘাউড়া। কথা শোনস না। চল, কইতাসি না। এইবার না গ্যালে তরে আমি সইত্য সইত্য লাথথি মারুম।

বলেই রাজশেখর সামনে হাঁটা দিতে চান।

বৈতাল কি করবে বুঝতে পারে না এই মাথার স্ক্রু খানিকটা ঢিলে হয়ে যাওয়া মানুষকে নিয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে বৈতাল।

হাতি দুইডারে ডাক দে।

বৈতাল মনে মনে ভাবে কি সর্বনাশ! ওরা তো বনের। ঐ দুই হাতির পিঠে চাপতে যাবেন নাকি মেজোকর্তা। এই বয়সে পড়ে গিয়ে, আছাড় খেয়ে হাড়গোড় ভাঙবেন নাকি!

অরা অপানেগো বাড়ির মেঘপাল আর মেঘডম্বরু নয়। চিৎকার করে বলতে চাইল বৈতাল। অরা বনের হাতি। অনেক দূর থিকা আসছে। অগো উপর চড়ন যায় না। কিন্তু এসব কিছুই বলতে পারল না বৈতাল ঋষিদাস। আসলে তার সাহসই হল না। বরং চুপচাপ রাজশেখর সান্যালের পেছন পেছন হাঁটতে লাগল বৈতাল ঋষিদাস।

আকাশে শেষ রাতের চাঁদ দুজনকে দেখতে দেখতে নিজের ঝিমিয়ে পড়া চোখ হঠাৎই বড় বড় করতে চাইল।

চার

আষাঢ়ে প্রথম বৃষ্টি পড়তে না পড়তেই এস. আয়েঙ্গারের 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস' তাঁবু ফেলে দাহিগোড়ার সবুজ ঘাসে মোড়া বড় ময়দানে। ঘাটশিলা স্টেশনে থেকে বেরিয়ে ডানহাতের পিচ রাস্তা ধরে খানিকটা গেলেই রেললাইন।

পিচমোড়া রাস্তা বেশ খাড়াই। রিকশাওলাদের প্যাসেনজার নিয়ে যাওয়ার সময়ে সিট থেকে নেমে হাত আর কোমরের জোরে গাড়ি টানতে হয়। খাড়াইটুকু স্টেশন থেকে দাহিগোড়া যেতে গেলেই, ফেরার পথে নয়।

পিচমোড়া রাস্তার ডান পাশে রেললাইন। অনেকখানি নিচু। বাঁদিকে সবুজ

সবুজ ঘাসে মোড়া মাঠ, নয়ত ফসলে ফসলে হেসে ওঠা ওই সবুজ রঙেরই ক্ষেত, সেখানে কালো কালো পরিশ্রমী মানুষ।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে পাকা রাস্তাটাই চলে গেছে দাহিগোড়া, অপুর পথ, রঙ্কিনী মন্দির, সুবর্ণরেখার দিকে। খানিকটা দূরে হিন্দুস্থান কপার।

রেললাইন ডানপাশে রেখে দাহিগোড়ার দিকে যেতে কিছু ঝুপড়ি চোখে পড়বে। সেখানে পাউরুটি, ঘুগনি, আলুর দম, চা, তেলেভাজা—এইসব আর কি। তারপর বেশ খানিকটা গেলেই দাহিগোড়া, অপুর পথ। সেটা অবশ্য পড়বে রাস্তার বাঁয়ে।

এস. আয়েঙ্গারের 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর নাম খুব। ভরা শীতে কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে থাকলেও ঠাণ্ডা কমার সঙ্গে সঙ্গে আয়েঙ্গার তার সার্কাস পার্টি নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে যাবে বিহার হয়ে ওড়িশার দিকে। বর্ষায় এস. আয়েঙ্গার আর তার সার্কাস থাকবে পুরীতে। তার আগে অবশ্য কটক, ভুবনেশ্বরে শো করার ব্যাপার আছে।

বৃষ্টি হলে জল দাঁড়ানর কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না এখানে। ঝমঝম করে খুব বেশি হলে খানিকটা ফেনাওলা, লালচে ময়লা মতো জল খুব সহজে গড়িয়ে যায় নিচু জমির দিকে। কাদা প্যাচপ্যাচে হয়ে ওঠার কোনো বালাই-ই নেই।

আয়েঙ্গার এই সার্কাসের মালিক হয়েছে বছর কুড়ি। সত্যেন সরকারের 'দ্য গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' তার হাতে পড়ে 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া' হয়েছে। সত্যেনের সার্কাসে রিং মাস্টার ছিল আয়েঙ্গার। নিজের দুই মেয়ে, ছেলে নেই। মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পর তারা আর সার্কাসের দেখভাল করবে না—এরকম ভাবনা থেকে সরকারমশাই অনেকখানি কষ্ট বুকে চেপে হাতছাড়া করলেন তাঁর সার্কাস। 'দ্য গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' অবশ্য অনেকবারই তার নাম বদলেছে এর আগে। 'জয়লক্ষ্মী সার্কাস', 'ভারতমাতা সার্কাস'—এমন অনেক নামেই তাকে চিনত লোকজন। সেসব কথা বলতে পারবেন একটু পুরনো মানুষেরা। 'ভারতমাতা সার্কাস', 'জয়লক্ষ্মী সার্কাস'— দুইয়েরেই মালিক ছিলেন এক পারসি সাহেব। তাঁকে সবাই জানত এম এস দারুওয়ালা বলে। তখন 'ভারতমাতা সার্কাস'-এর যুগ। জয়লক্ষ্মীকে বিয়ে করলেন দারুওয়ালা সাহেব। মাদ্রাজের মেয়ে জয়লক্ষ্মী তাঁর দলে বিপজ্জনক ট্রাপিজের খেলা দেখায়। বয়সে তাঁর থেকে অনেকটাই ছোট জয়লক্ষ্মীকে বিয়ে করার পরপরই পারসি সমাজ থেকে নাম কাটা গেল দারুওয়ালার। পারসিরা এসব বিষয়ে খুব কড়া কি না। তো সে না হয় যা হওয়ার হল। সত্যেন সরকার চাকরি করতেন দারুওয়ালার ভারতমাতায়। ভারতমাতা নাম বদলে জয়লক্ষ্মী হয়ে গেল দারুওয়ালার বিয়ের পর। ম্যানেজার সত্যেন সরকারের সামনে হঠাৎ একদিন চোখ উলটে পটল তুললেন এম. এস দারুওয়ালা। আচমকাই

হল যদিও। ওরকম নিয়মিত অনিয়ম করলে হবে না! ডাক্তারের নিষেধ, অন্যদের না বলা কিছুই শুনতেন না পারসি সাহেব।

সত্যেনের ঘরবাড়ি বলতে কিছুই নেই। বাবা মারা গেছেন সেই কোন ধু ধু ছেলেবেলায়। তাঁকে স্পষ্ট করে মনেও পড়ে না সত্যেনের। মা-ও চলে গেলেন যখন তাঁর বয়স দশ-বারো। হাওড়ার আমতায় যে ভিটেটুকু আর সামান্য জমি-জমা ছিল তা দিব্যি ভোগা দিয়ে ম্যানেজ করে নিজেদের গব্বায় পুরল জ্ঞাতিরা। মানে নিজের কাকা-জ্যাঠামশাইরা। ভাসতে ভাসতে সত্যেন সরকার একদিন এসে ঠেকে গেলেন ভারতমাতা সার্কাসে। তখন সবে স্বাধীন হয়েছে দেশ। ভারতমাতা, তিরঙ্গা পতাকা, জওহরলাল নেহরু, গান্ধীজি, বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, তখনও ছবি হিসেবে বেশ দামী সাধারণজনের কাছে। কখনও কখনও সুভাষচন্দ্রও। এ সময়ই—বাহান্ন তিপান্ন সালে ভারতমাতা জয়লক্ষ্মী হয়ে গেল।

এমন অনেক কথাই পর পর মনে পড়ে এস. আয়েঙ্গারের। ব্যাটারির চাবুক হাতে নিয়ে রোজ শোয়ে স্টেজের ওপর বাঘ-হাতি-সিংহ নাচান।

আয়েঙ্গার 'শান্তিনিবাস'-এ দুপুরের ভাত খেতে এসে মাঝে মাঝেই অনেকরকম সাত পুরনো স্মৃতি ঘিলু থেকে নামিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। কি তাদের রঙ-বাহার। দেখতে দেখতে এই সার্কাসেই চুল, দাড়ি, গোঁফ—সব পেকে গেল এস আয়েঙ্গারের। তেমন লম্বা নয়। চোখে অনেক খানি পুরু কাচের চশমা। কালো ফ্রেমে আঁটা সেই কাচের ওপার থেকে দেখলে কেমন যেন ঘোলা আর ফ্যাকাশে মনে হয় আয়েঙ্গারের চোখের মণি। মাথার চুলে সময়ের পাউডার গুঁড়ো ছড়িয়েছে বহুদিন। অল্প থাক দেওয়া ঢেউ খেলান চুলের অনেকটাই শাদা। তেমন লম্বা না হলেও তার গড়ন বেশ শক্তপোক্ত, হাফ হাতা বুশ শার্ট আর ফুলপ্যানট পরে ভাত খেতে আসে প্রায়দিনই। আসলে তাঁবুতে যে বারোয়ারি রান্না হয়, তা মুখে রোচে না 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর মালিকের। মাথা নিচু করে মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে আয়েঙ্গার মাঝে মাঝেই দেখতে পায় কেরলে ছবি হয়ে জেগে থাকা তার গ্রাম। একেবারে সাজান পট যেন। সবুজ সবুজ নারকেল গাছের সারি। যতদূর চোখ যায় উধাও নীল আকাশ। সবুজে নীলে মেশামেশি সে এক আশ্চর্য রঙ। কোথাও কোনো শব্দ নেই, সমুদ্রের ঢেউ ভাঙা ছাড়া। নীলচে-সবুজ সাগর ঢেউয়ের মাথায় মাথায় শাদাটে ফেনা তুলে নিয়ে আছড়ে পড়ছে নারকেলবনের কাছাকাছি।

এই ছবিটা আজকাল মাঝেমাঝেই দেখে আয়েঙ্গার। ভাত খাওয়ার সময়, শোয়ার সময়, ঘুমে। এমন কি শো চলতে চলতেও। আরও একটা কি যেন হয়েছে হালফিল—কত, কত বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার খুঁটিনাটি, নাম-তারিখ, পাত্র-পাত্রীসমেত মঝে মাঝেই ভিড় করছে, ভেসে উঠছে স্মৃতির কোন অতল থেকে। সব মনে পড়ছে হুবহু। সঙ্গে সঙ্গে কালকে কি হয়েছে, কিংবা পরশু—এমনকি এক ঘণ্টা আগেই বা কি হয়ে গেল, তা আর থাকতে চাইছে না

মনের মধ্যে। উড়ে যাচ্ছে। কিছুতেই স্মরণে আনা যায় না, বহুবার, অনেকক্ষণ ধরে ভেবেও। এরই নাম বোধহয় বুড়ো হওয়া। ফুরিয়ে যাওয়া একটু একটু করে।

এখানে দিনে দুটো শো। তিনটেয় একটা। আর একটা ছটায়। ভিড় অবশ্য মন্দ হচ্ছে না। কিন্তু মুশকিল হল ফতোয়া এসে গেছে সরকার বাহাদুরের—বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, বাঁদর, কাকাতুয়া, শিম্পাঞ্জি নিয়ে আর চলবে না সার্কাসে খেলা দেখান। জীবজন্তুই যদি না থাকে তাহলে সার্কাস দেখতে আসবে কেন লোকে? শুধু ট্রাপিজের খেলা, শূন্য থেকে মরণ ঝাঁপ, মৃত্যুকূপে মোটর সাইকেল সমেত আছড়ে পড়া, অনেকটা বড় গ্লোবের মধ্যে মোটর বাইক নিয়ে অবিরাম ঘুরপাক খেয়ে যাওয়া—এসব দেখতে কেন গাঁটের কড়ি খরচ করে আসবে পাবলিক!

যারা জানোয়ারের খেলা বন্ধ করতে চায় সার্কাসে, কি তাদের যুক্তি?

আয়েঙ্গার নিজেই ভাত মুখে দিয়ে বিড় বিড় করে উত্তর দেয় নিজের প্রশ্নের।

দমচাপা ছোট খাঁচায় পায়ে শেকল বাঁধা হয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ওদের থাকতে বড্ড কষ্ট, সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা।

আরে বাবা, খাঁচা থেকে ভালু, শের, সবাইকে বের করে ছেড়ে দিলেই জঙ্গল ওদের আদর করে ডেকে নেবে? আজাদি নয় হল, কিন্তু ওরা খাবে কি? শিকার করে খাওয়ার অভ্যেসই তো চলে গেছে বহু বছর। হাতিরা পারবে বনে-বাদাড়ে ঢুকে নিজেদের নাশতা, দুপুরের খানা জোগাড় করতে? তারা কি জানে, চেনে সব? এতটাই সোজা ওদের বনে ফিরিয়ে দেওয়া? শুধু মুখে বললেই হল! মাপা খাবার খেয়ে খেয়ে ওদের অভ্যাসই বদলে গেছে। মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে এরকম সব ভাবনাই পরপর ভিড় ঠেলে গুঁতোগুঁতি করতে থাকে এস. আয়েঙ্গারের সামনে। কিন্তু এরকম কিছুই বলা যাবে না মুখে তাই নিজের মধ্যেই একা একা বসে ঢেউ তোলে এস আয়েঙ্গার। তারপর চাপা দেয় সেই ঢেউ। ভাত ভাঙে, মাছের কাঁটা বাছে। ঝোলে ভাত মেখে লেবু চেপে।

ডাল দি আর একটু? শান্তিনিবাস-এর হোটেল মালকিন জানতে চায়।

না। ঘাড় নাড়ে আয়েঙ্গার।

মাছের ঝোল?

ঘাড় হেলায় আয়েঙ্গার। দাও।

তাহলে তো দুটি ভাতও লাগবে।

লাগবে। মাথা নাড়িয়ে কথা না বলেই জানায় 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর মালিক। বেলা দুটো বেজে গেছে। তিনটেয় শো। ওদিকটা সব ঠিকঠাক করে তবেই দুপুরের ভাত খেতে আসে আয়েঙ্গার। স্টেজ দেখা হয়ে গেছে। রিং মাস্টার, জানোয়ার, জোকার—সব ফিট। এখন গিয়ে একবার টিকিটঘরটা দেখে নিতে হবে ওপর ওপর। পরে সব হিসেব হবে রাতে—লাস্ট শো মেটার পর।

মাছটায় একটু কাঁটা আছে। কিন্তু খুব তাজা। ঘাটশিলা স্টেশনের গায়েই মাছ-সবজি, মুরগি, খাসির বাজার। বেশি বড় নয়, কিন্তু সবই ফ্রেশ। বাজারের মধ্যেই প্রায় পেঁড়া, কালাকাঁদের দোকান আছে একটা। সেখানে চমৎকার জিলিপি আর কচুরিও করে ভোরবেলা। কচুরির সঙ্গে অনেক সময়ই দেয় আলু-কুমড়োর একটা দারুণ তরকারি। তাতে মেথি ভাজা মশলা ছড়ান। শুকনো লঙ্কার ফোড়নও থাকে সঙ্গে। এই তরকারি যেদিন হয় না, বিশেষ করে শীতকালে, তখন ছোলার ডাল। একটু বেশি মিষ্টি দেওয়া ডালে ভেসে থাকা শুকনো লঙ্কা চুষে খেতে বেশ লাগে। সেই দোকানের চেহায় তেমন বাহার নেই। কিন্তু খাবার দাবার খুব ভালো।

আয়েঙ্গার তার অনেকটা মোটা চশমার কাচের ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝেই চারপাশ একবার ভালো মতো দেখে নিয়ে মাছ বাছায় মন দেয়। তুষকাঁটাও আছে অনেক। সেসব দেখে, বেছে, বাদ দিয়ে না খেলে গলায় লেগে গেলে বিপদ। অনেকে দিব্যি কাঁটা সমেত চিবিয়ে মেরে দেয়। আয়েঙ্গার পারে না।

'শান্তিনিবাস' নামের এই লজটিতে থাকারও ব্যবস্থা আছে। অনেকগুলো ঘর। একতলা, দোতলায়। বিশাল বাড়ি। এই বাড়ির মালিক থাকে কালীঘাটে। যাবতীয় যা কাজকর্ম চালায় কেয়ারটেকার আর তার বউ। হোটেল খুলে লোক খাওয়ানর ব্যবস্থা ওদেরই।

এক হাতে সবসময় ম্যানেজ করা যায় না মাছের কাঁটা। তখন দু'হাত লাগাতে হয়। প্রথম বর্ষার নবীন ইলিশ, সাইজে খোকা, কাঁটাতো একটু বেশি হবেই। কিন্তু এদিকে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ না করতে পারলে আবার শো শুরু করতে দেরি হয়ে যাবে। এ ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ নয় আয়েঙ্গারের। মেরে কেটে যেভাবে হোক সময়ে খেলা শুরু করতেই হবে। বহু বছর ধরে কি শীত, কি গ্রীষ্ম বর্ষা—এটাই করে আসছে আয়েঙ্গার। এখন সে মালিক, সেই ম্যানেজার। নাম কে ওয়াসতে ম্যানেজারবাবু একজন আছেন বটে। একেবারেই যাকে বলে বেচারা, নির্বিরোধী মানুষ।

সত্যেন সরকার বিয়ে করলেন জয়লক্ষ্মীকে দারুওয়ালা মারা যাওয়ার পর। সেসব অনেক অনেক বছর আগের কথা। জয়লক্ষ্মী তাঁর থেকে বছর চার-পাঁচের বড়। তা-তে কি! দারুওয়ালা চলে যাওয়ার পর সেই তো মালকিন। অবশ্য দারুওয়ালা থাকতে থাকতেই তার জীবনের শেষলগ্নে জয়লক্ষ্মী তো সর্বেসর্বা সার্কাসের। নিজের নামে সার্কাস, সেখান থেকে আয় করা টিকিট বিক্রির টাকা সবটাই বুঝে গুছিয়ে রাখে জয়লক্ষ্মী। মাদ্রাজের মেয়ে, গায়ের রঙ বেশ কালো। কিন্তু মুখখানা যাকে বলে খুবই কাটা কাটা। একদম চোখা নাক, বড় বড় চোখ, চকচকে গাল। বেশ লম্বা আর ছিপছিপে তার গড়ন। এসবই শোনা সত্যেন সরকারের কাছে। নেশার ঘোরে সত্যেন অনেক কিছু বলে যেত হাউ হাউ হাউ হাউ করে। সার্কাস ছেড়ে বেরিয়ে গেল সেই জয়লক্ষ্মী।

এস. আয়েঙ্গার রিং মাস্টার হিসেবে এই 'দ্য গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস'-এ জয়েন করার আগে সুলেমান নামে একজন রিং মাস্টার ছিল এই কোম্পানিতে। তো সেই সুলেমানের সঙ্গেই একদিন বেরিয়ে গেল জয়লক্ষ্মী। সুলেমান তাকে বলেছিল নতুন দল তৈরি করবে। তখন তার দু'দুটো মেয়ে বেশ ছোট। জয়লক্ষ্মী সেই অবস্থাতেই চলে গেল রিং মাস্টার সুলেমানের সঙ্গে নিজের নামে তৈরি সার্কাস ছেড়ে। সুলেমান অনেকটাই ছোট জয়লক্ষ্মীর থেকে, তা বছর তেরো চোদ্দর তো হবেই। বিহারে বেগুসরাইয়ে বাড়ি সুলেমান আলির। তার বাবা নওশের আলি ছিল জঙ্গল হাঁকোয়া। ঠাকুরদা সমশের আলিও তাই। জঙ্গল বিট করার ব্যাপারে তাদের খুব নাম। শিকারীরা শিকারে এলেই খোঁজ পড়ে বাপ ব্যাটার। ক্যানেস্তারা বাজিয়ে, হাল্লাগুল্লা করে, শোর মাটিয়ে গভীর বনের শের, ভালু, বরা—সব টেনে বার করত তারা। পটকা ফাটিয়ে হইচই করে, মোটা লাঠি দিয়ে জঙ্গল পিটিয়ে, খুঁচিয়ে তারা শিকারকে নিয়ে আসত হানটারের সামনে। মাচায় বসা বন্দুকবাজ তখন রাইফেল বা বন্দুক তাক করে দনাদ্দন দনাদ্দন গুলি চালিয়ে ফেলে দিত শের, ভালু বা বরা। নয়ত হরিণ। চিতা, লেপার্ড, ওলবাঘ—এসবও মারা হত খুব। একদম হিসেব না করেই নিকেশ করা। গাছের ওপর মাচা করে থানা গেড়ে বসে থাকা শিকারীদের কাছে তখন খুব কদর এইসব জঙ্গল হাঁকোয়াদের। ভালো শিকার হলে জমিদার, সাহেবরা বেশ পুষিয়ে দেয় এদের। মোটা টাকা বকশিশ। কিন্তু কিসের থেকে কি হল, আইন করে বন্ধ হয়ে গেল শিকার করা। কড়া আইন। আইন ভাঙলে সাজা, জরিমানা। কিন্তু কে আর আইন মানে! ফলে খোলাখুলি শিকার বন্ধ হলেও বাড়ল চোরা শিকার। কিন্তু সেখানে তো আর জঙ্গল-হাঁকোয়া লাগে না। ওভাবে হইচই রইরই করে পুরো বন, গাছপালা নাড়াচাড়া করে এলোমেলো করে দিয়ে শিকার তাড়িয়ে এনে বন্দুকের সামনে ফেলে দেওয়ার কাজটাই উঠে গেল। সমশের-নওশেরদের এই কাজটা বন্ধই হয়ে গেল একটু একটু করে। নিজেদের জমি-জমা ছিল কিছু, তাতে চলে যায়। কিন্তু জমি তো ভাগ হয় আস্তে আস্তে। শরিক বাড়ে। ভাগীদার বেড়ে গেলে ফসলের হিস্যা কমতে থাকে। তখনই বেগুসরাইয়ে নিজের জয়লক্ষ্মী সার্কাস নিয়ে এল সত্যেন সরকার। সুলেমান তখন বছর পনেরর। তারই মধ্যে বেশ লম্বা আর লায়েক হয়ে উঠেছে। খুব সাহস। গায়ে অসম্ভব জোর। শোয়ে আসত সার্কাস দেখতে, ভালো দামের টিকিট কেটে। সঙ্গে তিন-চারজন বন্ধুবান্ধব।

লম্বা হাড় হাড় চেহারা, একটু বসা গাল, খাড়া নাক। মাথার চুল সামান্য লালচে। চোখের মণিতে খয়েরি আভাস। না, ঠিক খয়েরি নয়, বলতে বলতে নিজের কথাকেই কেটে দিল সত্যেন। ওর আঁখ ছিল ভুরা। বলেই একটু থামল সত্যেন। তারপর জানতে চাইল—ভুরা বোঝ?

ঘাড় নাড়ল আয়েঙ্গার।

কি বল তো?

আয়েঙ্গার কিভাবে ভুরা ব্যাপারটা বোঝাবে ঠিক করতে না করতেই বলে উঠল সত্যেন সরকার। বলতে পারলে না তো। জানতাম পারবে না। ভুরা হল গিয়ে, ভুরা হল গিয়ে—হ্যাঁ, ভুরা হল গিয়ে—বেড়াল চোখ বোঝ! বেড়াল চোখ?

এবারও ঘাড় নাড়ল আয়েঙ্গার।

যাক, বোঝ তা হলে। ভুরা হল গিয়ে বেড়াল-চোখ। যাকে সাদা বাংলায় বলে বেড়াল- চোখো। তো সেই ছেলেটাকে দেখে বেশ ভালো লেগে গেল আমার। সার্কাসে কাজ করতে চায় কিনা জানতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে এককথায় রাজি।

ওর বাপ-চাচারা বাধা দিল না? বারণ করেনি?

করেনি আবার! মানা করেছে বহুবার। নানাভাবে আটকাতে চেয়েছে। ভয় দেখিয়েছে পর্যন্ত আমাকেও। বলেছে, বন্দুক দিয়ে উড়িয়ে দেবে।

দুর, বন্দুকে আবার ওড়ান যায় নাকি! কথাটা মনে মনে ভাবল আয়েঙ্গার সরকারমশাইয়ের কথা শুনতে শুনতে। আর তার মুখের দিকে তাকিয়েই হয়ত কি যেন কি বুঝে নিয়ে সত্যেন সরকার বলে উঠল, আসলে বন্দুক দিয়ে নয়, একটু ভুল বলেছি—সুলেমান আলির বাপ-চাচারা সবাই বলে উঠল একসঙ্গে গুলি করে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু সুলেমান শুনলে তো! সে তো 'জয়লক্ষ্মী সাকার্স'-এর ভেতরে ঢুকে পড়ে দিনেরবেলা যখন-তখন। দাঁড়িয়ে থাকে বাঘের খাঁচার সামনে। পায়ে শেকল বাঁধা হাতিদের লক্ষ করে মন দিয়ে। তাদের বিষয়ে এটা ওটা সেটা—খুঁটিনাটি জানতে চায় হাতি দেখভাল করা লোকটির কাছে।

কবে যেন শোনপুরের মেলা থেকে কিনে এনেছিলাম দুটো হাতি। এম. এস দারুওয়ালার সময়কার চারটে হাতিরই বেশ বয়স হয়ে গেছে। তাই আরও দুটো নতুন। এদের নাম কামিনী আর সুন্দরী। আগের চারটের নাম ছিল বিজলি, পার্বতী, রানি আর বাদশা।

সত্যেন সরকারের মুখ থেকে শোনা নানা গল্প টুকরো টুকরো হয়ে এখনও সামনে উড়ে বেড়ায় এস. আয়েঙ্গারের। তার এই ছাপান্ন-সাতান্ন বছরের জীবনে কম কিছু তো দেখা হল না। কত ধরনের মানুষজন, কত রকমের দেশ, আকাশ, মাটি, কি বিচিত্র সব শের, ভালু, হাতি, লেপার্ড, চিতা, কাকাতুয়া। বয়সের তুলনায় বেশ একটু বুড়োটেই দেখায় আয়েঙ্গারকে। তার ওপর ছানি কাটানর পর চোখে ওরকম একটা পুরু কাচের চশমা—সব মিলিয়ে বয়সটা যেন অনেকটাই বেড়ে গেছে। মাছের শেষটুকু মুখে দিয়ে চিবিয়ে খেতে খেতে মনে পড়ে গেল আয়েঙ্গারের এই ঘাটশিলাতেই কত, কত বছর আগে সত্যেন সরকারের সঙ্গে সার্কাস পার্টি নিয়ে রাতমোহনায় যাওয়া। কাছেই ফুলডুংরি পাহাড়, সুবর্ণরেখা। খানিকটা দূরে রাকা মাইনস, জাদুগোড়া—জাদুগোড়ার জঙ্গল, রঙ্কিনী মন্দির। অভ্রের খনি রাকাতে। ঘাটশিলার মাটিতেও এখানে ওখানে অভ্রের গুঁড়ো। আলো

পড়লে কেমন যেন চিকচিক করে ওঠে। তখনও 'অনিন্দিতা, 'সাফারি'—এইসব বড়সড় হোটেল গড়ে ওঠেনি। ফলে ভিড় অনেক কম, শুধু শীতে রমরমা ভিড় চেঞ্জারবাবুদের। গলায় মাফলার, মাথায় হনুমান টুপি, তার ওপর শাল, এন্ডি নয়ত তুষের চাদর বা মলিদা। ধুতির সঙ্গে পা ঢাকা ক্যাম্বিশের জুতো, একটু শৌখিনদের চামড়ার অ্যালবার্ট, নিউকাট বা ফিতে বাঁধা বুট। সব মিলিয়ে একদম নকুড়মামার ড্রেস। সেইসব ট্যুরিস্টবাবুরা লোকাল লোকজনের মুখে মুখে ড্যানচিবাবু।

কেন, ড্যানচি কেন?

বাজারে, নয়তো হাটে গিয়ে তাঁরা যে জিনিস দেখেন, সবই বলেন, ড্যাম চিপ। সেই ড্যাম চিপ থেকে ড্যানচি। পেট রোগা, বারোমাস অম্বল আর আমাশায় ভোগা বাঙালি হজমি জল, খোলা আকাশ, পরিচ্ছন্ন বাতাস পেয়ে বেশ রিপেয়ার করে নিত নিজেদের শরীর। বড়লোকেদের, রাজা জমিদারদের বাড়িই তো ছিল ঘাটশিলা, দেওঘর, মধুপুর, শিমুলতলা, জসিডিতে। পুরী বা কাশীর মতো এখানেও নিয়ম করে থাকতেন তাঁরা। অন্যসময় বড় বড় বাগান, ইঁদারা, আর ফল-ফুলের গাছঅলা সেইসব বাড়ি থাকত কেয়ারটেকারদের হেফাজতে। যাঁদের বাড়ি নেই, তাঁরা এসে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। পনেরদিন, একমাস, দু'মাস, তিনমাসও। বউ, ছেলে, মেয়ে, লট-বহর, কেরোসিন স্টোভ, হ্যারিকেন, টর্চ, বেডিং, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস—দুনিয়ার যাবতীয় অ্যাঁকোটাঁাকো নিয়ে তাদের আসা। তারপ একসময় চলে যাওয়া। আয়েঙ্গারকে এসব গল্প মুখে মুখে বলে গেছেন সত্যেন সরকার। তখন চিরুগোড়া, ফুলডুংরি, রাতমোহানা—এমন সব জায়গায় বেড়াতে যাওয়া তখন বেশ ঝামেলার। সবটাই পায়ে হেঁটে, নয়ত রিকশায়। সেসব দিন বহু বছর হল চলে গেছে।

জয়লক্ষ্মী চলে যাওয়ার পর ছোট ছোট দুই মেয়েকে নিয়ে তো পাগল পাগল পাগল অবস্থা সত্যেনের। প্রথমেই সার্কাসের নামটা বদলে 'দ্য গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' করে দিলেন সত্যেন। তারপর খুঁজতে লাগলেন একজন পাকা রিং মাস্টার।

এস. আয়েঙ্গার অবশ্য পাকাপোক্ত রিং মাস্টার ছিল না তখন। কাজ করতে করতে বুঝে নিয়েছে। কলকাতার চিড়িয়াখানায় বাঘ, চিতা, সিংহদের খাবার দিত আয়েঙ্গার। পার্মানেন্ট নোকরি নয়। তাই সত্যেন সরকারের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আয়েঙ্গার চলে এল 'দ্য গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস'-এ। সত্যেন তাকে রিং মাস্টার হয়ে ওঠার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন অনেক। সে এক লম্বা গল্প। দুজনে মিলে বসে, আলোচনা করে, মাথা খাটিয়ে নতুন নতুন খেলা বার করা। পুরনো খেলাগুলোকে উলটেপালটে আর একটু অন্যরকম করে দেওয়া—খুব ভাবতেন এসব নিয়ে সত্যেন সরকার।

থালার শেষ পাতে রাখা ভাত ঝোল কাচিয়ে খেতে খেতে আয়েঙ্গারের মনে পড়ে গেল সত্যেন সরকারের সেই কথা—শোনো আয়েঙ্গার, তুমি আমি দুজনেই

কোস্টাল ইনডিয়ার লোক। আমাদের প্রিয় খাবার ফিশ কারি অ্যান্ড রাইস। তোমাদের বামুনরা শুনেছি মাছ-মাংস খায় না। তা বেশ, না খেল না খেল—কার তাতে কি! কিন্তু বাঙালি বামুনরা জানো তো মাছ, মাংস সব খায়। এমনকি কচ্ছপও। সে অবশ্য বাঙাল বামুনরা। তাতেই কি বা এল গেল, যেটা বলছিলাম, আমি বেঙ্গলি তুমি কেরালিয়ান। দুজনের চেহারায়ও বহু মিল, কিছু কিছু খাওয়া-দাওয়াতেও এই মিলের ব্যাপারটা থেকেই গেছে। এখন এস না ভাই, আমরা দুজনে মিলে চেষ্টা করে এই সার্কাসটাকে দাঁড় করাই। নতুন নতুন খেলা যদি নাও হয়—

সেই তো, কত আর নতুন খেলা দেব! আয়েঙ্গার তার চুপচাপ থেকে শুধু ঘাড় নেড়ে যাওয়া—এই স্বভাবটিকে দিব্যি কেমন মুছে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে বলল, এস. আয়েঙ্গার।

এই তো ব্যাড হ্যাবিট, কথার মধ্যে কথা বলা। এ বদ অভ্যাস তো তোমার ছিল না আয়েঙ্গার। তুমি তো খালি ঘাড় নাড়তে। মাথা দোলাতে। মুখে বলতে না কিছু। সেই চেনা হিন্দি কহাবতের মতো—মন মন ভাওয়ে মুড়িয়া হিলাওয়ে। তোমার ঘাড় নাড়া দেখেই তো ধরে নিতে হয় হ্যাঁ নাকি না। সেটা অবশ্য বেশ শক্ত ব্যাপার। কিন্তু যাদের অভ্যেস হয়ে গেছে, তারা ঠিক পারে। যেমন পারি আমরা। তোমার সঙ্গে থাকতে থাকতে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছি। তো সে যাক গে যাক। সেনটেনসটা কমপ্লিট করতে দাও আমায়। যা বলছিলাম—। কি যেন বলছিলাম? ও, হ্যাঁ। নতুন নতুন খেলা তৈরি করতে হবে। যদি নিউ আইটেম নেহাতই বানাতে না পারি, তাহলে সামান্য অ্যাডিশান অলটারেশান করে তারপর সেটাকে দেখান। বোঝ না, এটা শো বিজনেস। আমরা যদি শো-ম্যানশিপ ঠিক মতো দেখাতে না পারি, তাহলে পাবলিক টিকিট কেটে আমাদের তাঁবুতে ঢুকবে কেন? কেন হাততালি দিয়ে মাত করে দেবে গোটা শামিয়ানা? ফলে এটা মাথায় রাখতে হবে।

সত্যি সত্যি অনেক কিছু বদল করে দিলেন সত্যেন। জলহস্তী কেনা হল অনেক টাকা খরচ করে। ইয়েস জলহস্তী, হিপোপটেমাস ফ্রম আফ্রিকা। আস্ত একটা হিপো যখন স্টেজের ওপর হাঁ করে ঘুরে বেড়াত, তখন সেটা ছিল রীতিমতো দেখার ব্যাপার। আদ্যন্ত ভেজিটেরিয়ান—ঘাস-পাতা খাওয়া ঐ কুচ্ছিত প্রাণীটি যখন শো-এর সময় স্টেজে ঘোরাফেরা করে, তখন তাকে দেখে তো বেশ ভয়ই হয়। হাতিদের পুরনো খেলার সঙ্গে শুঁড়ে করে নারকেল ধরে মাটিতে আছাড় দিয়ে ভেঙে গণেশ পুজো—এই আইটেমটা জুড়ে দিলেন সত্যেন সরকার। আর সত্যি সত্যি খুব খেয়ে গেল হাতির গণেশ পুজো, মঞ্চে হিপোর চলাফেরা। তখন ইনডিয়ার আর কোনো সার্কাসে হিপো নেই। পুরনো—একটু বয়স হয়ে যাওয়া দুজন জোকারদের বাদ দিয়ে চার চারজন নতুন জোকার কোত্থেকে কোত্থেকে যেন যোগাড় করে আনলেন সত্যেন। তাদের নাম দেওয়া হল কাতু, কুতু, টুপি, লাড্ডু।

এই চার বামন খেলার খ-ও তো জানে না। কিন্তু সত্যেন সরকার তৈরি করে নিলেন ওদের। জাগলিং শেখালেন মাস্টারমশাই রেখে। সঙ্গে ছোরার খেলা, ভাঁড়ামো। ব্যস, জমে গেল। কাতু, কুতু, টুপি আর লাড্ডু হয়ে উঠল 'দ্য গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস'-এর অ্যাসেট।

কাকাতুয়ারা যেভাবে কামান দাগত, প্যারেড করত, সেটাকে সামান্য আদলবদল করা হল। এটা অবশ্য আমার ব্রেন চাইল্ড। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধর ব্যাপারটা ছিলই, তার সঙ্গে ২৬ জানুয়ারি রিপাবলিক ডে আর ১৫ আগস্ট ইনডিপেনডেনস ডে-র কুচকাওয়াজ আর মহড়া কেসটাও জুড়ে দিলাম। মিস্টার সরকার তো খুব খুশি। এভাবেই 'ভারতমাতা'-র পুরনো আইটেমটাকে একটু বদলে বিশ্বশান্তির একটা শো তৈরি করলাম। সেটাও আমার মাথা থেকে। আগে সিংহের ওপর ত্রিশূল হাতে দাঁড়াত জয়লক্ষ্মী। বাকি সব খেলোয়াড়রা হাতজোড় করে থাকত তার চারপাশে। হাতিরা শুঁড় মাথায় ঠেকিয়ে দিত স্যালুট। সঙ্গে ন্যাশনাল অ্যানথেম। জয়লক্ষ্মী চলে যাওয়ার পর খেলাটাও আর দেখান হত না। আমি এসে আরতি বলে একজন ট্রাপিজ গার্লকে ঠিক করলাম। কম বয়স। মুখখানা ঢলঢলে, বেশ মিষ্টি। এরও বড় বড় দু চোখ। তাকে দিয়ে বিশ্বশান্তির আইটেমটা করালাম। সেই আরতিই এখন সার্কাসের অনেক খানি। সার্কাসের সিংহ—সিকান্দারের ওপর তিন রঙা শাড়ি পরা ভারতমাতা রইল। তার ডানহাতে ত্রিশূল, সেটাও যেমন ছিল তেমনই রাখা হল। খালি সার্কাসের পোষা বাঘেদের রাখা হল একটু দূরে। হাতিরা যেমন ছিল মাথায় শুঁড় ছুঁয়ে, তেমনই রইল। খালি গোটা পনের কুড়ি শাদা পায়রা—একদমই লক্কা আর পরপন জাতের ছড়িয়ে দেওয়া হল স্টেজে। সেই কবুতরেরা মাঝে মাঝে একটু নড়াচড়া করে, অল্প ডানা নেড়ে ছোট্ট উড়ানে মাত করে দিল সমস্ত পরিবেশ। বিশ্বশান্তির এই খেলা দিয়ে শেষ হত প্রত্যেক শো। আগে যেমন ভারতমাতা দিয়ে শেষ করা হত, এখন একটু বদল। খেলাটা চালাতে চালাতে দেখা গেল পায়রারা কখনও কখনও উড়ে গিয়ে বসছে 'ভারতমাতা'-র কাঁধে, হাতে। তখন যে কি হাততালি!

এনকোর এনকোর।

সেই ক্ল্যাপ যাঁরা না শুনেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন না।

খাওয়া শেষ। এবার মুখ ধোয়ার পালা। তারপরই দৌড়ন তাঁবুর সামনে। প্রথমে টিকিট কাউনটারের ভিড়টা দেখে নিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর শো-এর সব আইটেম ঠিক আছে কি না ফাইনাল চেক করে নেওয়া। একটাই সমস্যা এখানে। বড্ড ফ্রি পাস দিতে হয়। কমপ্লিমেনটারি দিতে দিতেই জান কয়লা। এমনিতেই কলকাতার তুলনায় টিকিটের দাম কম রাখতে হয়। তার ওপর এত এত বিনা পয়সার টিকিট। কে নেয় না ফ্রি পাস? থানা, গুণ্ডা, হাফ গুণ্ডা, নেতা, হাফ নেতা, নেতার চামচা, লোকাল ক্লাব। ফ্রি পাস দিতে দিতে জীবন শেষ। সবাই ফ্রি পাস

চায়। তবে একটা জিনিস, এখানে অন্য সব খরচা—অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স, অন্যসব ট্যাকসো কলকাতার তুলনায় অনেকটাই কম। সেদিক দিয়ে পয়সা বাঁচে। এছাড়া সার্কাস পার্টির মালিক কাম ম্যানেজার বলে এখানে একটা আলাদা খাতির হয়। ছোট শহর তো। কলকাতায় সেটা কল্পনাই করা যায় না। হোটেলে মাছের বড় পিস, রুই বা কাতলার মুড়ো, টাটকা ভাত, ভাতের ফেন না মেশান ডাল—সবই পাওয়া যায়। সেটুকু এই ম্যানেজারি কাম মালিক হওয়ার দৌলতেই।

খাওয়ার পর ভালো করে বারবার কুল্লি করে মুখ ধুয়ে চিনেমাটির শাদা ডিশ থেকে মৌরি তুলে নিল এস. আয়েঙ্গার। মুখ ধুতে ধুতে বেসিনের ওপরে দেয়ালের সঙ্গে ফিট করা আয়নায় নিজের বুড়োটে মুখ, মাথার কাঁচা-পাকা চুল দেখে মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল আয়েঙ্গারের। শান্তিনিবাস থেকে খরপায়ে বেরিয়ে এসেই লালচে হয়ে যাওয়া শাদা কাগজের গায়ে ঝাড়খণ্ড পার্টির পোস্টার দেখে মনটা কেমন যেন দমে গেল আয়েঙ্গারের। বিহার ভেঙে নতুন রাজ্যের দাবি। হিন্দিতে লেখা সেই সব কাগের ঠ্যাঙ বগের ঠ্যাঙ অক্ষরগুলো পোস্টারে দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা কেমন যেন ছমছম করে উঠল আয়েঙ্গারের। অ্যানাদার নিউ প্রভিন্স। কী হবে একটা স্টেট তৈরি হয়ে! তাতে কি সলভ করা যাবে প্রবলেম? পোস্টারের নিচে ধমসার ছবি আঁকা। সেই আঁকাটিও অপটু হাতের, তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায় কোনো, কোনোটায় হিন্দিতে লেখা —এন ই হোরো জিন্দাবাদ।

পোস্টারগুলো মারা হয়েছে 'শান্তিনিবাস'-এর টিনের গেটে, পাশের পাঁচিলে। এই পাঁচিলের গা দিয়ে খানিকটা রাস্তা এঁকেবেঁকে গেলেই সুবর্ণরেখা। অপুর পথে বড় মাঠের দিকে যেতে যেতে একটা পুকুরে বোঝাই শাপলা পাতা। আর কয়েক মাস পরেই সমস্ত জল আলো করে দিয়ে ফুটে উঠবে নতুন নতুন শাপলা ফুল। এখানেই ফোটে লাল শাপলাও, দেখেছি কয়েক বছর আগে। মনে পড়ে গেল আয়েঙ্গারের।

এখানেও মাটির দেওয়ালে, বেশ পুরনো হয়ে যাওয়া কালচে রঙ ধরা ইটের পাঁচিলে সদ্য মারা পোস্টারে আলাদা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি জ্বলজ্বল করছে দেবনাগরী হরফে। সদ্য মারা হয়েছে এই সব পোস্টার, তা বোঝা যায় একটু তাকিয়ে থাকলেই। কাঁচা আঠার ভিজে ভিজে ভাব ফুটে উঠেছে পোস্টারের গায়ে।

টিকিট ঘরের সামনে বেশ ভালো ভিড়। লোকজনের একটা বড়সড় লাইন এঁকেবেঁকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। আকাশে মেঘ নেই। বরং রোদে রোদে ছয়লাপ উজ্জ্বল চারপাশ। কি আশ্চর্য তার বর্ণালী। বেশি রোদ উঠলে আবার ভ্যাপসা গরম নেমে আসবে। তখন উল্টো বিপত্তি। শের, ভালুরা গরম পড়লে বড্ড থকে থাকে। সেই ক্লান্তি নিয়ে ঠিকঠাক খেলা দেখাতে চায় না তারা। তখন ব্যবহার

করতে হয় ব্যাটারির চাবুক। ওটা খুব একটা কাজে লাগাতে চায় না আয়েঙ্গার। কষ্ট হয়। কিন্তু উপায়ও তো থাকে না, না হলে যে শো ভেস্তে যায়। এতগুলো লোক পকেটের পয়সা খরচ করে টিকিট কেটে সার্কাস দেখতে এসেছে। তাঁরা শুনবে কেন, ষোল আনার ওপর আঠের আনা তো তারা উশুল করে নিতেই চাইবে। পান থেকে সামান্য চুন খসলেই শুরু হয়ে যায় গোলমাল।

একটু মেঘ। একটু মেঘ। সামান্য ছায়া ছড়িয়ে যাক মাথার ওপর—মনে মনে বলতে থাকে আয়েঙ্গার। কাকে? কাকে এসব শোনায় আয়েঙ্গার? তার তো ভগবান নেই। তবু কেন যেন মনে মনে ছায়াকে ডাকে।

পাঁচ

'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর চারজন জোকার গজালি করে সকালবেলা। চারজনেরই হাফ প্যানট আর খালি গা। কাতু, কুতু, লাড্ডু, টুপি—চারজনই খালি গায়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে। একটু আগেই কালচে মেঘে ছেয়ে গেছে সমস্ত আকাশ। তার সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ দু-এক ফোঁটা দু-এক ফোঁটা।

নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝেই বয়স নিয়ে কথা বলে কাতু, কুতু, লাড্ডু, টুপিরা। তিরিশ, আঠাশ, সাতাশ, বাইশ—এমন এমন সব হিসেব লাগায় তারা। সেটা যে কতখানি সত্যি, নাকি মিথ্যে পুরোটাই তা নিয়ে ওরা নিজেরাই বেশ টানাপোড়েনে থাকে মাঝে মাঝে। টুপির থুতনিতে এক-দু' গাছা দাড়ি পেকে উঠছে। আজকাল দাড়ি কামাতে গেলে মাঝে মধ্যেই টের পায় টুপি। তাড়াতাড়ি ব্লেড টেনে সেই শাদা ফুটকি চায় মুছে দিতে।

এমনিতে সকালে উঠে তেমন কাজের তাড়া থাকে না। কিন্তু বাজার যাওয়ার ব্যাপার থাকে এক এক দিন। চারজন জোকারের মধ্যে দু'জন বেরয় ম্যানেজারের সঙ্গে। বামনরা থাকলে খানিকটা ভিড় জমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দোকানিরা অনেক সময় একটু সস্তাতেও মাল দিয়ে দেয়। ওরা নানারকম মজা করে দোকানের সামনে। জোকস বলে। কিন্তু ওদের দিয়ে তো মাল বওয়ান যায় না। লম্বায় এতটাই কম, থলে বইবে কেমন করে? এছাড়া ওদের রোজ প্র্যাকটিস থাকে। শো করার জন্য স্টেজে নামার আগে নিজের নিজের খেলাটাকে ওরা ঝালিয়ে নেয় রীতিমতো। এ ব্যাপারে খুবই কড়া হুকুম এস. আয়েঙ্গারের। প্র্যাকটিস করতে হবে। করে যেতেই হবে— পর পর সব আইটেম। প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস।

হঠাৎ আকাশ একটু জোরেই জল ছেটাতে শুরু করল মাটির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গুড় গুড় গুড় গুড় শব্দে ডেকে উঠল মেঘ। আর যায় কোথায়। কাতু কুতু একে অন্যেকে জাপটে ধরল ভয় পেয়ে। দূরে আবার কোথায় বাজ পড়ল। আকাশ ফালা

হয়ে গেল বিদ্যুতের রেখায়। তারপর গরগর গরগর করে ডেকে উঠল আকাশ। অনেক দূরে দূরে তালগাছের সারি, মহা মহা বট, অশ্বত্থ, সুবর্ণরেখার জল, হিন্দুস্থান কপারের ধোঁয়া ওগরান চিমনি—সব সেই আকাশ-আলোয় অন্যরকম হয়ে গেল মুহূর্তে।

বাজের চড়া শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দু'কানের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে মুখখানা ভিরকুটে রইল টুপি। বাজের আওয়াজে তার বড্ড ভয়। শুধু লাড্ডুই ওদের তিন জন যেমন ভয়ে সিঁটকে গেছে, ততটা সিঁটকে না গিয়ে বরং খানিকটা যেন সাহস দেখিয়েই গলা উঁচু করে এদিক ওদিক কি হচ্ছে, তা দেখতে চাইল।

বাঘের খাঁচার ভেতর পায়চারি করছে হলুদের ওপর কালচে ডোরা। একটা মাথা বাঁকান লম্বা আঁকশি দিয়ে ভেতরের ময়লা সাফ করে নিয়ে গেছে ঝড়ুলাল। ঝড়ুলাল বাঘের ট্রেনার প্রেমজিতের অ্যাসিস্ট্যান্ট। রোজ ভোর ভোর তাকে এই ময়লা ফেলার কাজটি করতে হয়।

আবার বাজ পড়ল দূরে।

কালো মেঘে ঢাকা আকাশ ফালা ফালা হয়ে গেল বিদ্যুৎ চমকে। পায়ে, চেন বাঁধা চারটে হাতি সে দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

একদিন ফুলডুংরি পাহাড়ে যাবি? বৃষ্টির ছাটে ভিজতে ভিজতে বলল লাড্ডু।

কখন যাবি ফুলডুংরি? জানতে চাইল টুপি। কানের ফুটো থেকে আঙুল সরিয়ে এনে লাড্ডুর কথায় মন দিয়েছে টুপি।

কোর্টের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে সোজা—জানিস তো! সেটা দিয়ে গেলে কোথায় যাওয়া যাবে?

কেন, ওটা দিয়ে গেলেই তো ফুলডুংরি পাহাড়।

অনেক উঁচু?

তা তো একটু আছেই।

উঠতে কষ্ট হবে না অতটা?

তা অল্প স্বল্প হতে পারে। কিন্তু ওপরে উঠলেই তো —

কি, কি রে লাড্ডু ওপরে উঠলে?

অনেক, অনেকটা দূর পর্যন্ত ফাঁকা দেখা যাবে। চারপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ। শুধুই সবুজ।

তাতে কি হবে?

বাঃ! সবুজ দেখে বেশ মজা লাগবে না!

মজা আবার কিসের?

মজা না হোক আনন্দ তো হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে জুড়িয়ে যাবে চোখ। তাছাড়া ওপরে—টিলার একদম মাথায় উঠে আসার পর শিলাসন বলে একটা জায়গা আছে। খুবই সুন্দর। সেখানে বসা যাবে।

শুধু এটুকুর জন্য এত কষ্ট! তার চেয়ে স্টেশনের কাছে গিয়ে বাজারের মধ্যে সেই প্যাঁড়া আর কালাকাঁদের দোকানে প্যাঁড়া খেলেই হয়। নয়ত কালাকাঁদ একশো করে। অবশ্য অত ভালো জিনিস একশো করে খেয়ে কিছু হয় না। তার চেয়ে বরং দু'শো করে কালাকাঁদ। তার সঙ্গে গরম দুধ এক গ্লাস। বড় বড় জিলিপি করে ওখানে। কড়াই থেকে সবে তুলে আনা গরম জিলিপি যে কি ভালো খেতে। মুচমুচে ভাজা খোলের ভেতর চিনির একটু মোটা রস। ওফ হো। সিঙারাও করে ওখানে। গরম সিঙারার ময়দায় তৈরি গা-টা ভাঙলেই কেমন ধোঁয়া ওড়ে। ভেতরে বাদাম নারকেল আর আলুর পুর।

তুই থামবি টুপি! বেশ যেন একটু ধমকেই উঠল লাড্ডু। খাবার ব্যাপারে একটা কথা পেলেই হল। সঙ্গে সঙ্গে জিভ সক সক। বড্ড নোলা তোর। খালি খাই খাই।

লাড্ডুর এই বকা শুনে টুপি কিন্তু থামল না। তখন তার সামনে উড়ে বেড়াচ্ছে গরম গরম ফুলকো কচুরি। সেই সব কচুরির পেটের ভেতর পুর হিসেবে ঠাসা হয়েছে আদা মেশান বিউলির ডাল। তাতে হয়ত কখনও কখনও হিংয়ের ফোড়ন। কিন্তু এসব দোকানে তো হিং ব্যবহার হয় না। হিংয়ের যে দাম অনেক। বরং হিংয়ের কথা মনে এলেই লাড্ডুর মনে পড়ে কেমন যেন আবছা আবছা এক শাড়ি। গাঢ় বেগুনি নয়ত ঝকঝকে কমলা রঙের সেই শাড়িতে জড়িয়ে থাকে রসুন আর হিংয়ের গন্ধ। কখনও কখনও গোবরের দুর্গন্ধ। একটা পুরনো ইঁদারা, যার মুখে কোনো ঢাকা নেই। সেই গভীর কুয়োর হা হা মুখ অনেক নিচে কালচে জল, সেই জলের মধ্যে সাঁতার দেওয়া মাকড়শা—সব কেমন এক সঙ্গে তালগোল পাকাতে থাকে টুপির মাথার মধ্যে।

উঠোনের এক কোণে সাত পুরনো একটা কদম গাছ। ওপাশে একটা খিরিশ। কদমের নিচে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে একটা শাদা-কালো ছাগল চার চারটে ছানা নিয়ে দাঁড়িয়ে। সেই ছানারা ক্রমাগত লাফঝাঁপ দিচ্ছে চারপাশে। মায়ের গলায় দড়ি বাঁধা। কোথায় কোথায় সেই জায়গাটা—নিজের মনে মনে হাতড়াতে থাকে টুপি। হিংয়ের গন্ধ মনে পড়াতে কত কি ভেসে উঠল মনে। সেই উজ্জ্বল গাঢ় বেগুনি শাড়ি বা ঝকঝকে কমলা রঙের শাড়ি কার? যার আঁচলে লেগে থাকে হিংয়ের গন্ধ, রসুনের ঝাঁঝওলা কটু গন্ধ?

কদম গাছে ফুল ভরে আসে আষাঢ়-শ্রাবণে। তখন আকাশে ঘন কালো মেঘ। সেই গাঢ় মেঘদলের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই কদম ফুলের পাগল করা সুবাস ঢুকে পড়ে টুপির নাকের মধ্যে। কদমের চেনা গন্ধ, হিংয়ের পরিচিত ঘ্রাণ, ইঁদারার কালো জলের আভাস—সব কিছু মিলেমিশে কোথায় যেন চলে গেল টুপি। তারপরই তার নাকে ঢুকে পড়ল গরম গরম কচুরি ভাজার গন্ধ। কচুরির সঙ্গে কুমড়ো আর আলু দিয়ে একটা তরকারি। কখনও কখনও ছোলার ডাল। হলুদ হলুদ ডালের ভেতর জেগে থাকা ভাজা পোড়া কালো শুকনো লঙ্কাটি তলোয়ারের বাঁকা

খাপ হয়ে জেগে। ডাল থেকে সেই লঙ্কা তুলে চুষে খাওয়ার মজাই আলাদা। সেই মজার সবটুকু একটু একটু করে ছড়িয়ে যাচ্ছে সমস্ত গায়ের মধ্যে। আর তখনই তার কান ধরে কে যেন দিল এক মহাটান। চোখে একসঙ্গে অনেকখানি জল এসে গেল টুপির। সঙ্গে সঙ্গে তার দেখতে থাকা কদম গাছ, ছাগল ছানা, ছাগল মা, গাঢ় বেগুনি আর উজ্জ্বল কমলা রঙের শাড়ি, হিংয়ের গন্ধ, রসুনের কটু ঘ্রাণ, হলুদ-সোনালি ছোলার ডালের ভেতর জেগে থাকা বাজপাখির নখ যেমন ভাজা শুকনো লঙ্কা—সব কিছু এক সঙ্গে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল ইঁদারার কালচে জলে। তারপর সব কেমন এক সঙ্গে ডুবে গেল। জলের মাথায় জেগে থাকল শুধু কয়েকটা ভুড়ভুড়ি। কান টানার যন্ত্রণায় টুপি খানিকটা নড়েচড়ে বেরিয়ে এল তার স্বপনের জগৎ থেকে।

কি ভাবছিস? সেই কচুরি, ডাল, জিলিপি, প্যাঁড়া, কালাকাঁদ!

কার গলা? বোধহয় লাড্ডুর।

ও, মাছ খায় সব পাখি। দোষ হয় শুধু মাছরাঙার—এমনই নিয়ম দুনিয়ার। শুধু আমিই খাবার দাবার নিয়ে ভাবি? নোলা আমার একার? তোরা ভাবিস না কিছু! খাস না! নাকি খেতে চাস না? এসব কথা বলা হয়ে ওঠে না টুপির। বরং তার চোখ থেকে জল গড়াতে থাকে।

ঠিক তখনই 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর হাতি কামিনী নিজের শেকল বাঁধা পা শক্ত মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে কাল রাতে দেখা স্বপ্নটা মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। বৃষ্টিতে মাটি খানিকটা ভিজেছে বটে, কিন্তু নরম হয়নি। ফলে পা ডেবে যায় না। চার পাশে যেমন একটা কামড়ে দেওয়া গরম ছিল, সেটা বদলে গেছে আকাশ থেকে নেমে আসা জলের দাপটে। হাওয়ায় এখন অল্প অল্প আরাম। গায়ে লাগলে মনে হয় বেশ বেশ। বাহ্—

একটু আগেই যেমন চরাচর কালো করা মেঘ ছেয়েছিল আকাশে; এখন আর তেমন নেই। বরং আকাশ বেশ পরিষ্কার। তার থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে আলো।

কামিনী দেখতে পেল বড়সড়, চওড়া নদীর পাড়ে বিশাল মেলা। সেখানে কত কত তাঁবু, শামিয়ানা, দোকান-পসার, হ্যাজাক আর জেনারেটারের রোশনাই, হ্যারিকেনের ঝিম ধরা ময়লাটে আলো। মাথায় ওজনদার পাগড়ি, চওড়া ছুঁচলো গোঁফ, ইয়া চেহারা, কাঁধে রাইফেল নয়ত দোনলা বন্দুক, বুকে মালা হয়ে ঝুলছে গুলির বেল্ট। কিন্তু মালা ঠিক যে জায়গায় ঝোলে, সেখানে নেই বেল্ট। রয়েছে বুকের ওপর কোনাকুনি এক দিকের কাঁধ থেকে অন্য ধারের বগলের তলা দিয়ে জড়ান। অনেকটা যেমন পইতে থাকে। কাঁচা চামড়ার জবরদস্ত ভারি নাগরা পায়ে দিয়ে হাঁটছে কাঁধে বন্দুক রাখা সেই সব লোকজন। নাগরার নিচে আবার কমলালেবুর কোয়া চেহারার লোহার নাল বসান। রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করলে শব্দ ওঠে— খট খট খটা খট। খটা খট খট। খট খটা খট।

রাত নেমে এলে এদিক ওদিক জ্বলে ওঠে মশালের আগুন। সেই লালচে রঙ ছ্যাঁকা দিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারকে। যত না আলো আসছে তা থেকে ততটাই উড়ে বেড়াচ্ছে ধোঁয়া। সেই সব ছায়া ছায়া আলোর মধ্যে গো-গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়া, হাতি।

অনেক অনেক হাতি। কত কত ঘোড়া, উট, মোষ, গরু, বলদ। খানিকটা দূরে নদীর শাদা শাদা বালির ওপর পড়ে আছে ধুলোটে জ্যোৎস্না। চাঁদ একটু দেরি করে উঠেছে আকাশে। সমস্ত আকাশ তারাদের টিমটিমে মোমবাতি বুকে নিয়ে চুপচাপ বসেছিল যতক্ষণ না চাঁদের উদয় হয়। চাঁদ উঠলে তার গোল চেহারা একটা আলোর পুরনো ডোম হয়ে ভেসে উঠল আকাশে। বেশ পুরনো ডোম, যেমনটি থাকে রাজা-মহারাজা, জমিদার, রইস আদমিদের বাড়ি, তো সেই ডোমের ভেতর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে জ্যোৎস্না। চাঁদ ভেসে উঠতেই তারাদের জ্বেলে রাখা সব মোমবাতি কেমন যেন একটু আবছা মতো হয়ে গেল। আকাশে ভাসা চাঁদের ছায়া হঠাৎই ভেসে উঠল কার্তিকের হিম ছোঁয়া নদীর জলে।

বাতাসে অল্প অল্প শীত মিশে রয়েছে। স্বপ্নের মধ্যেই টের পেল কামিনী। বড় শামিয়ানার নিচে এখনও চলছে নওটোঙ্কির আসর। ঘুঙুরের শব্দ, তবলার বোল শুনতে শুনতে কামিনী একবার চাঁদমাখা আকাশের দিকে তাকাল। কি অপূর্ব জ্যোৎস্না। তার আলোয় আলোয় ফুটফুটে হয়ে আছে চারপাশ।

নদীর ধারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান ঝাড়াল গাছেদের ডালে ডালে অনেক অনেক দূর থেকে উড়ে আসা শীতের পাখিরা ঘুম-ঢুলুনির মধ্যেও হঠাৎ জেগে উঠে আকাশের দিকে অভ্যাসে তাকিয়ে অমন চকচকে চাঁদ দেখে ভোর হয়েছে ভেবে নিয়ে ভুল করে দু-একবার ডেকে উঠে তারপর কেন জানি না নিজেরাই চুপ করে গেল। হয়ত ভুল বুঝতে পেরেছে নিজেদের। নয়ত পারেনি। কিন্তু তাদের ডাকাডাকিতে কামিনীর মনে হল আকাশের চাঁদ জাদু জানে। কিসের থেকে যে কি হয়ে যায়! নওটোঙ্কির সঙ্গে সারেঙ্গি বাজাচ্ছে যে লোকটি তার বাজাতে বাজাতে কেমন যেন ঢুলুনি মতো এসেছিল। পাখির ডাক শুনে ভোর হয়ে গেছে ভেবে নিয়ে — সারা রাত বাজালাম, এইরকম একটা গর্ব থেকে সে আবার নতুন করে প্যাঁ পোঁ প্যাঁ পোঁ শুরু করে দিল।

তার সেই জোরদার বাজনা শুনে নিজের ক্লান্ত শরীর, পায়ের কথা ভুলে আরও জোরে নাচতে শুরু করে দিল নওটোঙ্কিওয়ালি। আর যারা নাচ দেখতে বসে রাত জাগতে জাগতে ঢুলে পড়ছে, তারা সবাই প্রায় এক সঙ্গে ঢুল ঢুলুনি ভুলে গিয়ে হঠাৎই একে অন্যের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাহ্ বাহ্ বহোত খুব বলে উঠল।

স্বপ্নের সব কথা মনে আছে কামিনীর! কাল রাতেই তো দেখা। তারপরই কামিনী দেখতে পেল পাশাপাশি তারা ক'জন মাঠ ভাঙছে। তারা সবাই 'দ্য গ্রেট

ইনডিয়া সার্কাস'-এর। পায়ে শেকল নেই কারও। কোথায় যেন চলে গেছে, হারিয়ে গেছে সেই সব শেকল।

আকাশ থেকে চাঁদের আলোর বেশ বড়সড় একখানা কার্পেট নেমে এসেছে মাটির ওপর। জ্যোৎস্নার সেই কার্পেট গায়ে জড়িয়ে আমরা দু'জন হেঁটে চলেছি পাশাপাশি —আমি আর সুন্দরী। টুপি আর লাড্ডু কখন যেন উঠে পড়েছে আমাদের পিঠে। আমার পিঠে টুপি। লাড্ডু চেপেছে সুন্দরীর পিঠে।

কোত্থেকে খানিকটা রাংতা যোগাড় করে দু'টো মুকুট বানিয়েছে দু'জনে। মাথায় রাংতার মুকুট পরে হাতির পিঠে বসে ওরা দু'জন দিব্যি মজায় আছে।

তারপর? তারপর?

তারপর কি হল?

তারপর যে কি হল কিছুতেই আর মনে পড়ছে না কামিনীর। ঘুমের ভেতর দেখা অনেক কথাই মুছে যায় কামিনীর মাথার ভেতর থেকে। রাতে যা দেখা গেছিল, সকালে উঠে তা আর সবটা মনে পড়ে না। তবু সেই যে পিঠের ওপর বসা টুপি, তার মাথায় রাংতার চকচকে রুপুলি মুকুট। সেই মুকুটের গায়ে মিশে গেছে চাঁদের রুপো রঙের আলো।

টুপি আবার মুকুট বলতে পারে না। বলে মটুক। তার বলা এই 'মটুক' শুনে খুব হাসে লাড্ডু। বলে, দিনরাত শুধু যত খাবার দাবার—কালাকাঁদ, প্যাঁড়া, জিলিপি, সিঙারা, কচুরি, ছোলার ডাল নিয়ে ভাবলে এর বেশি আর কি করে হবে?

টুপি কিন্তু লাড্ডুর দাবড়ানি, ঠাট্টায় এতটুকুন দমার পাত্র নয়। বরং সে দ্বিগুণ উৎসাহে নতুন নতুন খাদ্য—সোহন হালুয়া কাজুবাদামের বরফি, ফিরনি—এসবের কথা বলতে থাকে।

টুপির মুখে পরপর একগাদা খাবারের কথা শুনে কামিনীর মনে হয় ইশ, কতদিন এক ছড়া পাকা কলা একসঙ্গে খাওয়া হয়নি খোসাসমেত। ছড়া ছড়া পাকা কলা খোসাসুদ্ধ খাওয়ার মজাই আলাদা। তাও যদি আবার হয় গাছপাকা। কলা তো দূরস্থান, ভালো পাকা কয়েতবেলই খোলা সমেত খাওয়া হয়না কতদিন। কয়েতবেল খেতেও বেশ লাগে, কিন্তু দিচ্ছে কে! এখানে তো সেই একঘেয়ে বরাদ্দের খাবার। সেই কচি কলাগাছ, খোল, ভূষি, গুড়—যেমন অর্ডিনারি মিল হয় আর কি! তবু মাঝে মাঝে একজন টাকমাথা ফরসা ফরসা লোক এসে আমাদের খিদমত করত মুর্শিদাবাদে, সেও তো বেশ কিছু দিন হয়ে গেল।

কাল রাতে দেখা স্বপ্নের অনেকখানিই এতক্ষণ মনে পড়ছিল না কামিনীর। এবার মনে পড়ে গেল। দু'টো—হ্যাঁ, ঠিক দু'টো নাকি একটু বেশি—আরও ছিল পেছনে, আশপাশে চাঁদের ধুলো মেখে পাহাড় পাহাড় চেহারার সেই চারপেয়েরা। বিশাল বিশাল কান, বড় বড় শুঁড়, গোদা গোদা চারটে পা। এসব কিছু যোগ বিয়োগ করলে দেখা যাবে তারা তো ঠিক আমার মতো নয় চেহারায়। অনেক

অনেক বড়—সব মিলিয়ে। আর তাদের গায়ের রঙে যেন মেঘ। বর্ষার মেঘদল। সেই কালচে চেহারা মাঝে মাঝেই ডেকে উঠছে শুঁড় তুলে।

কোথা থেকে এলে তোমরা? স্বপ্নের মধ্যেই জানতে চাইল কামিনী।

কেন, জঙ্গল থেকে।

কোন জঙ্গল? কোথাকার জঙ্গল।

কোনো উত্তর নেই।

কি, বলবে তো!

ঘুমের মধ্যেই ফিস ফিস করে কামিনী।

কিন্তু এবারও কোনো রকম জবাব পাওয়া যায় না।

মাথার ওপর ভরা একখানা চাঁদ। বেশ গোল আর চকচকে। সেই চাঁদের পাঠানো জ্যোৎস্নায় চারপাশ দুধ রঙের আলোয় আলোয় একেবারেই অন্যরকম।

কামিনীর পাশে ঘুমোতে থাকা সুন্দরী একই সঙ্গে ঘুমের মধ্যে বন থেকে বেরন মেঘবরণ হাতিদের দেখতে পেল। চাঁদ ভাসা পৃথিবীতে তারা একেবারেই আলাদা চেহারার। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা সেই সব হাতিরা কি বারে বারে ডাক দিয়ে যাচ্ছে ওদের! কেন ডাকছে ওরা? কি কারণে? কেনই বা যাব ওদের সঙ্গে? এসব কথার উত্তর কিছুতেই নিজের ভেতর থেকে শুনতে পেল না সুন্দরী।

দূরে কোথায় বুঝি কাঠচাঁপা ফুটেছে। সেই মৃদুমধুর গন্ধে বাতাস একদম আমোদ। ওই সুরভিটুকু বুকের মধ্যে টেনে নিতে নিতে সুন্দরীর মনে হল কেন চলে যাব এই সার্কাস ছেড়ে?

শেষ রাতে গরম লাগছে। ঘুমও ভেঙে গেল হঠাৎ। বাইরে এসে আয়েঙ্গার দেখল তার তাঁবুর রঙিন শামিয়ানা ভেদ করে জ্যোৎস্না এসে গড়াচ্ছে উঠোনে। সেই ছায়া ছায়া চাঁদের আলোর দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। কেমন যেন ছম ছম করে ওঠে বুকের ভেতর। চাঁদের এই ছায়াময় আলোর দিকে তাকিয়ে আয়েঙ্গারের মনে পড়ল সত্যেন সরকার তাকে নিয়ে এমন জ্যোৎস্না রাতে চলে যেতেন সুবর্ণরেখার পাশে। টানা গ্রীষ্মের পর অল্প অল্প নেমে আসা বর্ষায় সুবর্ণরেখা সামান্য জল পেয়ে খলবলে। মাঝে মাঝে পাথর। তারপর জলের স্রোত। গভীরতা বেশি নয়, কিন্তু টান আছে। পাথরের পাশে পাশে কখনও কখনও সবুজ পাতাওলা এক ধরনের গাছ। তার ডাঁটা সরু, মাথার ওপর পাতা অনেকটা যেন তালপাতা চেহারার।

রাতে জ্যোৎস্না ডোবা সুবর্ণরেখা একেবারেই অন্যরকম। দিনের বেলায় তার রূপ বদলে যায় সূর্যের বন্ধুত্বে। তখন তার কুলুকুলু বুকে, বালির ওপর রোদ্দুরের জমাট দোস্তি। ওপার থেকে লোকজন আসছে নদী পেরিয়ে। তখন জলের ওপর সূর্য। ঘাড়ের ওপর সাইকেল নিয়ে কাঁধে ছাগল রেখে নদী পেরচ্ছে লোকজন।

তাদের সেই চলাচলটুকুতে সূর্য নড়ে যাচ্ছে বারবার। একটু দূরেই হিন্দুস্থান কপার। তার তেল-ময়লা ভেসে আসছে নদীর জলে।

পাড়ে, এদিকটায় সুবর্ণরেখার বালি, কাদার ওপর ছোট ছোট রঙিন মাছ। ছোট্ট কিন্তু রঙবাহারি। তার শাদা বালির ওপর স্থির হয়ে থাকা টলটলে জলের নিচে মাছেদের কি অপূর্ব ঘোরাফেরা। কাচ কাচ রঙের সেই জলে হালকা হালকা শ্যাওলা জেগে আছে।

এইখানে একজন খুব বিখ্যাত বাঙালি লেখকের বাড়ি ছিল। বলতে বলতে সত্যেন সরকার যেখানে তারা দাঁড়িয়ে তার পেছন দিকে আঙুল দেখাতেন। এখানে একটা পাথর আছে জান, তাকে তিনি কুমির পাথর বলতেন। সেখানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকতেন তিনি। সূর্যাস্ত দেখতেন। শুনতেন পাখির ডাক, পাতা ঝরার শব্দ।

আয়েঙ্গার দেখতে পেল কথা বলতে বলতে বুজে আসছে সত্যেন সরকারের চোখ। ওপারে আবছা মতো নীলচে পাহাড়ের সারি। তার ওপর চাঁদের ভৌতিক আলো। ডান দিকে হিন্দুস্থান কপারের আলো, চিমনি থেকে বেরিয়ে আসা কালো কালো ধোঁয়া। জ্যোৎস্না ছোঁয়া আকাশের গায়ে সেই কালচে ধোঁয়ার ছাপ একটু একটু করে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

সত্যেন সরকার সামনের বহে যাওয়া জল পেরিয়ে কালচে পাথরের ওপর গিয়ে বসল। পেছন পেছন আয়েঙ্গার। চারপাশ ডোবান চাঁদের আলোয় সেইসব এবড়ো খেবড়ো পাথরেরা এক একটা ছোটখাটো ডায়ানোসর, তাদের কালচে পিঠে থই থই জ্যোৎস্না, আকাশের কাছাকাছি হিন্দুস্থান কপারের লালচে আলো। নদী পেরিয়ে পাথরে বসে আবার খানিকটা নদী ছুঁয়ে ফেলা যায়। জলস্রোতের বহে যাওয়ায় কোনো বিরতি নেই। বর্ষায় নতুন নতুন জল এসে মেশে সুবর্ণরেখার বুকে। পাহাড় ধোয়া সেই স্রোত বুকে নিয়ে আরও খানিক চনমনে হয়ে ওঠে নদী। সত্যেন সরকারের দু' চোখে ঘন বিষাদ। বেশ বড় বড় চোখে আঁখি পল্লব অনেকটাই দীর্ঘ আর ঘন। দাঁড়িগোঁফ কামানো ফরসা একটু চৌকো মতো মুখ। মাথায় না আঁচড়ানো এলোমেলো কোঁকড়া চুল। নদী পেরোতে গিয়ে তাঁর চওড়া কালো পাড় ধুতির খানিকটা ভিজেছে। মিলের ধুতির সঙ্গে আদ্দির পাঞ্জাবি। এস. আয়েঙ্গারের মনে আছে সরকার মশাই এক দিন কথায় কথায় বলেছিলেন তাঁর বাবা বিধান সরকার ছ আনা জোড়া সেনগুপ্তর ফাইন কাঁচি ধুতি কিনেছেন। একটা কাফ লেদারের পাম্প শুর দাম ছ' টাকা, সাত টাকা বড় জোর। তখনও সেকেনড গ্রেট ওয়ার লাগেনি।

সত্যেন সরকারের পায়েও চিনেবাড়ির মসমসান কালো পাম্প শু। সুবর্ণরেখার জল আর বালি পেরোনোর সময় তিনি তাদের হাতে করে হেঁটেছেন। জল-কাদায় জুতো নষ্ট হবে। নদীর জল, বালি, পাথর সবই চাঁদ মাখামাখি হয়ে একেবারে

অন্যরকম। আকাশ মাঝে মাঝে মেঘে ঢেকে গেলে কালচে হয়ে যায় চারপাশ। তার মধ্যেই সত্যেন সরকারের গলা শোনা যায়। — সেই ফেমাস বাঙালি রাইটারের নাম জান?

মাথা নাড়ে আয়েঙ্গার। জানে না।

এই এক ব্যাড হ্যাবিট তোমার আয়েঙ্গার। সবই ইশারায় সেরে দাও। মুখে কিছু বল না। এতক্ষণ ধরে আমি বাঙালি রাইটার বাঙালি রাইটার করছি, তুমি কিছু জানতে চাইছ না। বলিহারি যাই তোমার কৌতূহল না থাকাকে।

কে, ট্যাগোর?

না ট্যাগোর নয়। তোমরা তো—মানে বাংলাভাষী নন, এমন অনেকেই তো রাইটার, পোয়েট শুনলেই ভাবেন তিনি অবশ্যই টেগোর হবেন। কোনো দোষ দেওয়া যায় না। কারণ রবীন্দ্রনাথই তো পরিচিত সকলের চেয়ে।

তাহলে কে তিনি?

দাঁড়াও আয়েঙ্গার। এতটা উত্তেজিত হয়ে তাড়াহুড়ো ক'র না বাবা। তোমার তো স্বভাব এটা নয়। তুমি তো খালি ঘাড় নাড় বাবা।

দূর আকাশে চাঁদ তেমনই নির্মল। আনন্দময়। সেদিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন সত্যেন সরকার। তারপর অসম্ভব চাপা গলায় বলে উঠলেন, তাঁর নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব নামকরা লেখক ছিলেন তিনি। শুনেছি এখানেই —এই যে তাঁর বাড়ি, সেখানেই মারা গেছিলেন তিনি। কথাটা শেষ করে একদম চুপ করে গেলেন সরকারমশাই। তারপর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়েই থাকলেন। কিউসেকের হিসেবে কত কত জল বয়ে গেল সুবর্ণরেখার পাথর আর বালি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। চারপাশে নদীর কলধ্বনি ছাড়া আর কোনো শব্দই নেই।

আয়েঙ্গারের মনে পড়ল এমনই এক প্রায় থমকে থাকা সন্ধ্যায় সরকারমশাই তাকে বলেছিলেন, সুবর্ণরেখার বালি খুঁড়ে সোনার কুচি, গুঁড়ো পাওয়া যায়। সেও তো কত বছর হয়ে গেল। আর আজ—ঠিক এখনই চাঁদে চাঁদে ভাসাভাসি আষাঢ়ি নীল আকাশের নিচে একা একা দাঁড়িয়ে নিজের 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর দুই খেলোয়াড় হাতি কামিনী আর সুন্দরীকে দেখে আয়েঙ্গারের মনে পড়ল নতুন আইন হচ্ছে নাকি এই সব হাতি-ঘোড়া, বাঘ-সিংহ, লেপার্ড সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে। কোথায় ছাড়বে এদের আয়েঙ্গার। কে বা কারা দায়িত্ব নেবে? কেনই বা নিতে যাবে?

জ্যোৎস্না ছোপানো অন্ধকারে 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর দুই হাতি কামিনী আর সুন্দরী নিজেদের সুন্দর সুন্দর স্বপ্নের ভেতর হঠাৎই দেখতে পেয়ে গেল এস. আয়েঙ্গারকে।

আমাদের সামনে মালিক এসেছে। নিজেদের বড়সড় কান নাচাতে নাচাতে মনে করল কামিনী আর সুন্দরী। জ্যোৎস্নার ঢেউয়ে প্রায় ভেসে যাওয়া চারপাশ।

তার মাঝ খানে এই দুই গজ। তাদের পায়ে মোটা মোটা শেকল। এদের ছেড়ে দিতে হবে। স্বাধীনতা দিতে হবে। বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক, লেপার্ড, শিম্পাঞ্জি, কাকাতুয়া, ম্যাকাও, টিয়া পাখি—এই সব কিছু বাদ দিয়ে তৈরি করতে হবে সার্কাসের নতুন নতুন আইটেম। কুকুর, গরু, বেড়াল—এসব দিয়ে কি সার্কাস চলে? এরপর হয়তো আইন করে কেড়ে নেওয়া হবে এদের।

সুন্দরীর মোটা মোটা পায়ে, নিজের হাত আলতোভাবে ছোঁয়াল আয়েঙ্গার। সেই স্পর্শটুকু পেয়েই যেন আহ্লাদে ষোলখানা হতে থাকে সুন্দরী। তার স্বপ্ন তখনও দু'চোখ জুড়ে। মাথার ভেতর। সুন্দরী ভাবে তবে কি এল, এল সেই মহাগজ, যার গায়ের রঙে শ্রাবণ আকাশ! মেঘদল সাজা আকাশ থেকে কি নেমে এল সেই গজরাজ বা গজরানি? যার দীর্ঘ, শাদা দাঁতের দিগন্ত বিস্তারি শোভায় ছিন্ন হয়ে যায় সমস্ত অন্ধকার। এবার কি কেটে যাবে আমাদের বছরের পর বছর ধরে লেগে থাকা পায়ের শেকল।

সুন্দরী চোখ পিট পিট করতে থাকে। তারপর অল্প অল্প ল্যাজ দোলায়। আয়েঙ্গার আলতো হাতে পেট খোঁয় সুন্দরীর। তার চোখের জল বাঁধ মানে না। গড়িয়ে পড়ে গালে। মনে মনে বিড়বিড় বিড়বিড় করে আয়েঙ্গার—ছেড়ে দিতে হবে রে তোদের। ছাড়তেই হবে। কোনো উপায় নেই। এবার আইন আসছে। আইন হয়ে গেলে তখন তো আর কিছু করা যাবে না। আমি কি করব বল তো সুন্দরী! সার্কাস উঠিয়ে দিলে আমার চলবে কি করে? খাব কি? আর তো তেমন কোনো কাজ জানি না। শিখিইনি ভালো করে। এই বয়সে নতুন করে আর কিছু শেখা যায় না কি!

সুন্দরীর পাশে থাকা কামিনী তখনও স্বপ্নে তার পিঠে বসা রাংতার রুপুলি মুকুট মাথায় টুপিকে আরও কতকি বলে যেন কথা বলতে শুনল।

টুপি মুকুট মাথায় দিয়ে অনেক রকম কথা বলে যাচ্ছে হাত-পা নেড়ে নেড়ে। কি বলতে চাইছে টুপি! স্বপ্নের এই সব গুঁড়ো দু চোখে নিয়েই কামিনী টের পেল তার পেছনের পায়ে তুলকালাম মশার কামড়। ডাঁশও হতে পারে। পেছনের দিকে টিকটিকি ল্যাজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে কামিনী উড়িয়ে দিতে চাইল হুল ফোটানো পোকামাকড়দের।

টুপিকে পিঠে বসিয়ে কেমন করে দেখবে কামিনী? বাস্তবে আবার তা হয় নাকি? কিন্তু নিজের পিঠে দিব্যি জমকালো সাজগোজ করে বসা টুপিকে দেখতে দেখতে কামিনী বুঝতে পারল আজ একটা বোধহয় কিছু একটা হয়ে যাবে।

ঝলমলে ঢোলকা মতো একটা জোব্বা পরেছে টুপি। মাথায় বসিয়েছে রাংতার সেই মুকুট। অনেকটা দূরে চাঁদ মাখামাখি চরাচরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে মাঝে মাঝেই কি যেন কি বলছে টুপি। তার সেই কথাবার্তা সঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে

না। কিন্তু একটা কিছু যে দেখাতে চাইছে হাত নাড়ানাড়ি করে, সেটা বেশ খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মাথার ওপর ঢলঢলে চাঁদ নিয়ে আয়েঙ্গার দাঁড়িয়ে। তার খালি গা, রোমহীন পাটা চেহারার বুক, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, চশমা পরা দু'চোখের ঘোলা দৃষ্টি—সবটাই যে কোনো লোকের মন খারাপ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

মাঝে মাঝেই আলগা হয়ে নাভির নিচে নেমে আসা সিন্থেটিক লুঙ্গি সামান্য তুলে ঘাড় অনেকটাই নামিয়ে এনে চোখ মুছতে চাইছে এস. আয়েঙ্গার। একটা বয়সের পর কেন যে এত কারণে অকারণে কান্না পায়!

দল ভেঙে গেলে যে একদম একা হয়ে যাব আমি! কোথায় যাব? কার কাছে থাকব? কেরলের গ্রামেও তো তেমন কেউ নেই। তা ছাড়া বহু দিন যোগাযোগও নেই দেশের সঙ্গে। নিজের দেশ, গ্রাম, ভিটে, আত্মীয় বলে আজ আর কিছু নেই। ভাবতে ভাবতে হু হু করে কেঁদে উঠল আয়েঙ্গার। কান্নার দমকে চমকে চমকে উঠতে লাগল তার পিঠ।

কামিনী তার পিঠে বসা টুপিকে দেখতে দেখতে টুপির হাতের দিকে নজর করতেই দেখতে পেল সেই চকচকে ঢিলেঢালা পোশাক পরা হাত যেন আঙুল দেখাচ্ছে দূর — কত দূরে। তার হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে সে দিকে চোখ নিয়ে গেলে দেখা যাবে মেঘবরণ তারা এসে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় কান। অনেকটা উঁচু পিঠ, ঝকঝকে দাঁত। শাদা থেকে হলুদ হয়ে আসতে চাওয়া সেই দাঁতে চাঁদের লুটোপুটি।

সেইসব গজরাজের গায়ে বন, লতাপাতা, নদীর গন্ধ। পাহাড় তার গায়ে আদর করে ছিটিয়ে দিয়েছে নিজের ধুলো। সেই ধুলোটুকু মেখে মহা আনন্দে আছে এই সব মহা হস্তীরা।

বিশাল বিশাল কান নেড়ে নেড়ে, শুঁড় নাড়িয়ে তারা কামিনীকে ডাকছে। তখনই সুন্দরী দেখতে পেল সেই আবছা মতো বিশাল বিশাল হাতিরা একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাদের পায়ের নিচে ঘাটশিলার লালচে মাটি পড়ে আছে চুপচাপ।

চলে এসো। চলে এসো। গম গম করে ডেকে উঠল বনের হাতি।

স্বপ্ন ঘোরে একই কথা শুনতে পেল সুন্দরী।

কোথায় যাব আমরা?

কেন, কত কত জায়গা আছে যাওয়ার।

তাও বলনা কোথায় যাব? খানিকটা যেন হালছাড়া গলাতেই জানতে চাইল কামিনী।

যাওয়ার জায়গার কি অভাব? রাতমোহানা, ফুলডুংরি, কিরিবুরু, চিরিবুরু।

ফুলডুংরি! ফুলডুংরি যাবে? সত্যি! কত দিনের ইচ্ছে যাব সেখানে। কিন্তু হয়েই আর ওঠে না।

কে যেন বলল একথা। কামিনীর পিঠে বসা টুপি কি! নাকি লাড্ডু? যে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসেছে সুন্দরীর ওপর।

যেই বলুক, জ্যোৎস্না রাতে অমন কত কথাই তো ভেসে আসে। সব কথা কি মনে থাকে, নাকি শুনতে পায় সবাই কানে?

আয়েঙ্গার তখনই তার 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর দুই খেলুড়ে কামিনী আর সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেশ কয়েক বছর আগে হঠাৎ এক দিন খাঁচার ভেতর দাপিয়ে দাপিয়ে একা একা মরে যাওয়া হিপোপটেমাসটিকে দেখতে পেল।

তার নাম ছিল জাম্বো।

সেই বিশাল চেহারার জলহস্তীটি কেমন অসহায়ভাবে একা একা ছটফট করতে করতে ককিয়ে ককিয়ে মারা যাচ্ছে। সব দেখেও কিছু করা যাচ্ছে না। অমন শান্ত প্রাণী, কিন্তু কি অস্থির আর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। তার ধারে কাছে যেতে। কে যাবে? ট্রেনার তো সামনেই নেই। নবীন রিং মাস্টার হিসেবে এস. আয়েঙ্গার তো বুঝতেই পারছে না কি করতে হবে। কি করা দরকার। সত্যেন সরকার মশাই অসম্ভব স্থির। একটুও নার্ভাস নন তিনি।

অনেক দিন পরে আয়েঙ্গার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, সে দিন আপনি অমন চুপচাপ ছিলেন কি করে! কোনো উত্তেজনা ছিল না। আশ্চর্য। আপনাকে দেখে অনেক কিছু শেখার আছে। আমরা সবাই প্রায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছি ভেতরে, বাইরে। আপনি খুব ধীর গলায় দু-একটা ওষুধ যদি দেওয়া যায়, এমনই কিছু বলছিলেন।

আয়েঙ্গারের কথা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন সত্যেন সরকার। তারপর বললেন, এটাই তো স্বাভাবিক আয়েঙ্গার। যত বড় হবে, তত তুমি বুঝতে পারবে। উথাল-পাথাল হয়ে কি করব বল তো! আমি কি কিছু করতে পারব! বরং নার্ভাস হয়ে গিয়ে আরও গুবলেট করে ফেলব সব কিছু। তার থেকে চুপচাপ ধীর স্থির হয়ে কাজ করে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু সবাই তা তো পারে না।

সেটা মানি যে, তা পারে না। কিন্তু এছাড়াও রাস্তা নেই কোনো। উদ্বেলিত হলে আমি তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। এটা মনে রেখ আয়েঙ্গার।

সরকারমশাই, আপনার বলে যাওয়া কথা মনে রাখা হয়ত সহজ। কিন্তু তা পালন করা খুবই কঠিন। অসম্ভবও প্রায়।

অসম্ভব বলে কিছু নেই আয়েঙ্গার। এই দেখ, জয়লক্ষ্মী চলে গেল সুলেমানের সঙ্গে দু'-দুটো ছোট মেয়েকে রেখে। প্রথম প্রথম কিছুটা ভ্যাবলা হয়ে গেলেও সেই বিহ্বল ভাব কাটিয়ে আমি তো বুক বেঁধেছি। জয়লক্ষ্মীর নাম পালটে দ্য গ্রেট বেঙ্গল করতে হয়েছে। তার জন্য পরিশ্রম কম করতে হয়নি। পয়সা-কড়িও খরচা করতে

হয়েছে বেশ কিছু। সময় গেছে। সাদা বাংলায় বলতে গেলে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কাঠখড় বোঝ আয়েঙ্গার। সত্যেন সরকারের কথা শুনে ঘাড় নাড়ল আয়েঙ্গার।

এই তো তোমার পুরনো অভ্যাস। ঘাড় নাড়। কিন্তু মুখে কিছু বল না। অনেক সময়ই আমি হ্যাঁ না কি না বলছ তুমি বুঝি না।

জানি, কাঠখড় মানে।

অ। সেটা বললেই হয়।

এই তো বললাম।

আচ্ছা। তা জয়লক্ষ্মী থেকে দ্য গ্রেট বেঙ্গল-এ নিয়ে যেতে কম কিছু করতে হয়নি। তাই বলে অত বড় একটা হিপোর মৃত্যুতে—জাম্বোর দামও তো অনেক, একটুও বিচলিত হবেন না! মরে গেলে সার্কাসেরও তো অনেক ক্ষতি। বহু বহু টাকা লস। নতুন করে কি আর কেনা যাবে হিপো? সম্ভব! অথচ জলহস্তী ছিল বলে 'দ্য গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস'-এর একটা আলাদা, অন্যরকম কদর আছে পাবলিকের কাছে। তাই জাম্বো না থাকলে খানিকটা ভিড় তো কম হবেই। হতে বাধ্য। এখন তো আর রাস্তার পাশে বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে, পাঁচিলের গায়ে, স্টেশনের পাশে, বাস স্ট্যান্ডে, 'দ্য গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস'-এর পোস্টারে রাখা যাবে না জাম্বোর বড় বড় দাঁত বেরনো হাঁ করা ছবি। তাতে তো টিকিট বিক্রি কমবে কোম্পানির। এতজনের মাস মাইনে, খেলা দেখান সমস্ত প্রাণীদের ডায়েট, ওষুধ, আরও অনেক খরচ আছে এছাড়া। ও সব সামাল দেওয়া যাবে কী ভাবে?

তোমার সব কথাই মানছি আয়েঙ্গার। একশোর ওপর একশো দশ ভাগ সত্যি, তুমি যা বলছ। কিন্তু মিস্টার এস. আয়েঙ্গার, বিচলিত হলে আমি যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। একেবারে ফৌত হতে কি কেউ চায়? তুমি চাও?

না। মাথা নাড়ল আয়েঙ্গার। মুখে কোনো কথা নেই। মনে মনে বলল, আশ্চর্য মানুষ আপনি সরকার মশাই। আপনাকে চেনা মুশকিল।

নাও, রেডি হও। দেখ, কি দাঁড়ায়। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। খাঁচার মধ্যে দাপিয়ে দাপিয়ে ততক্ষণে মোটা মোটা চার পা তুলে একদম শুয়ে পড়েছে জাম্বো। তার কাছাকাছি গেলে দেখা যাবে চোখের কোণে ফুটে ওঠা জলের ফোঁটা। দেখলে বুকের মধ্যে কেমন যেন করে ওঠে।

যদি জাম্বো মারা যায়, মারা যাবেই মনে হচ্ছে, তাহলে প্রথমে সমস্ত অথরিটি, লোকাল থানাকে জানিয়ে বডি মাটিতে কবর দেওয়ার কথা ভাবতে হবে। পোস্টমর্টেম যদি এড়ানো যায় তো গেল, না হলে তো কাটাছেঁড়া করতে হবে জাম্বোর। বলেই মাথা নামালেন সত্যেন সরকার। তাঁর চোখের পাতা কি ভারি হয়ে এল, নাকি এমনি এমনি!

যাও, দাঁড়িয়ে থেক না আয়েঙ্গার। রেডি হও। একটু থেমে আবারও তাড়া দিলেন সরকারমশাই।

যাচ্ছি—মুখে না বলে মাথা নাড়ল আয়েঙ্গার।

সেদিন বাঁচানো যায়নি জাম্বোকে। মৃত্যু তাকে গ্রাস করেছে একটু একটু করে। যা ছিল, তা শুধুই সময়ের প্রতীক্ষা করা। এক সময়ে তাই হল।

তখন 'দ্য গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' পুরুলিয়ায় লাল মাটি, টাঁড়-টিকরের দেশে, রুখো-শুখা জমিনের গভীরে মস্ত একটা গর্ত করে, তার মধ্যে অনেককানি নুন ফেলে তারপর শুইয়ে দেওয়া হল জাম্বোকে। এরপর আশেপাশে, ওপরে আরও কিছুটা নুন বিছিয়ে একটু একটু করে মাটি দেওয়া হল কোদালে করে এনে এনে। কাছেই পুটুস ঝোপ, সূর্যশিশিরের এলোমেলো বেড়ে ওঠা। আরও খানিক দূরে আকাশমণি, ইউক্যালিপটাসের সারি। তার মধ্যেই নিশ্চিন্তে শুয়ে রইল আফ্রিকার জাম্বো। কে যে কোথায় যায়!

এই ঘন জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে সুন্দরী আর কামিনীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আবারও নোনা জলে দু'চোখ ভরে গেল এস. আয়েঙ্গারের।

ছেড়ে দিতে হবে এদের। ওরা আমায় একলা রেখে চলে যাবে। উপায় নেই। কোনো রাস্তা নেই। ভাবতে ভাবতে চোখের পুরু চশমার কাচ নামিয়ে এনে তার ঝাপসাটুকু মুছে কি করতে চাইল আয়েঙ্গার।

লাল, নীল, সবুজ, হলুদ—নানান চড়া রঙের কাপড়ে তৈরি হয়েছে শামিয়ানা। সেই বড়সড় ছাঁকনির ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো একদম অন্যরকম হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এখানে ওখানে, সেখানে। সেদিকে তাকিয়ে বড় করে শ্বাস পড়ল আয়েঙ্গারের।

বাইরে পায়ে শেকল বাঁধা হাতিরা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করতে শুরু করল। আর সঙ্গে বাতাস ভরে উঠল বনের গন্ধে। চাঁদের আলো পেরিয়ে আসা দুই মহাগজ তখনও এগিয়ে আসছে ধীরে। তাদের এই গদাইলশকরি চালে হেঁটে হেঁটে চলে আসা দেখতে পেল না আয়েঙ্গার। খুব মন খারাপ নিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরতে চাইল এস. আয়েঙ্গার। তার ঝ্যালঝ্যালে ফুলছাপ সিন্থেটিক লুঙ্গিতে জ্যোৎস্না কোনো বাড়তি রঙ আর পারল না যোগ করতে।

বনের দুই হাতির মধ্যে একজন ফিস ফিস করে বলে উঠল, এবার আমরা যাব রাতমোহানা, ফুলডুংরি।

আমরা যাব চিরুগোড়া, কিরিবুরু, জাদুগোড়া, বলল আর এক বনহস্তী। আর কোথায় কোথায় যাব? জানতে চাইল কামিনী।

আরও বহু জায়গায়। দলমা পাহাড়ের কাছেও চলে যেতে পারি। নয়ত দুমকাতেও।

সত্যি? বলল কামিনী।

তোমারা মিথ্যে বলছ না তো! জানতে চাইল সুন্দরী।

না, না মিথ্যে বলব কেন! সত্যি যাব।

কামিনী আর সুন্দরীদের পিঠে গ্যাঁট হয়ে বসা টুপি ও লাড্ডু সঙ্গে সঙ্গে কি একটা বলে যেন চিৎকার করে উঠল।

পিঠে বসে থাকা ওদের নিয়ে যেতে পারি রাতমোহানা?

থাক না, কি আর হবে? চলুক আমাদের সঙ্গে—বলেই বনের হাতি তার ডান দিকের দাঁতটি সামান্য নাড়াল। নাকি নাড়াল না। এমনি এমনিই এরকম মনে হল কামিনীর।

কিন্তু যাব কি করে? জানতে চাইল কামিনী।

শামিয়ানার ওপার থেকে খুব আস্তে আস্তে জানতে চাইল গজরাজ, কেন?

আমাদের পায়ে যে শেকল। বলেই কামিনী দেখল লাল, হলুদ, সবুজ — সবরকম গাঢ় রঙের কাপড়ে তৈরি পাতলা দেওয়ালের বাইরে আবছা মতো দাঁড়িয়ে সেই মহাগজ। তার ছায়া ছায়া গা, পা, শুঁড়, লম্বা লম্বা পুরুষ্টু দাঁত—সবই দেখা যাচ্ছে কিন্তু সবটাই ছায়া ছায়া।

আমাদের পায়ে যে লোহার মোটা মোটা শেকল। যাব কি ভাবে? মরিয়া গলায় জানতে চাইল সুন্দরী।

ও থাকবে না, ঠিক খসে যাবে।

খসে যাবে! ম্যাজিক নাকি! মিন মিন করে জানতে চাইল কামিনী।

ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।

তাই!

সত্যি বলছ?

কামিনী আর সুন্দরীদের কথা শুনে বন থেকে আসা হাতি বলল, ইচ্ছে করেই দেখ না কি হয় দেখতে পাবে। ওদের মাথার ওপর ঝুঁকে থাকা লাড্ডু আর টুপি বলল, করেই দেখ না। করেই দেখ না। বুনোবাবা বলছে যখন।

বাব্বা! বুনোবাবা! এর মধ্যেই নাম হয়ে গেল বন থেকে বেরিয়ে আসা হাতির! মনে মনে বলল কামিনী।

তা তো হবেই। তাতো হবেই। খুব আস্তে আস্তে বলল সুন্দরী।

তা হলে!

তা হলে ইচ্ছে হোক!

আর কি আশ্চর্য, সুন্দরী আর কামিনী মনে মনে ভাবা মাত্র তাদের পায়ে লাগান মোটা মোটা ওজনদার শিকলি মুহূর্তের মধ্যে হয়ে গেল টুকরো টুকরো।

কিন্তু আমাদের সার্কাসের কি হবে? এতদিন যে খাবার যুগিয়েছে আমাদের। পায়ের থেকে নেমে যাওয়া শেকল দেখতে দেখতে জানতে চাইল কামিনী।

এরকম পশু-পাখিওয়ালা সার্কাস তো এমনিই তো থাকবে না কয়েক দিন পর। আইন করার কথা খুব হচ্ছে। এখন সেই আইন চালু হতে যা সময় লাগে। আয়েঙ্গার তো এমনিই রাখতে পারবে না তোমাদের।

আমরা চলে যাব তাহলে আয়েঙ্গার, এই সার্কাস ছেড়ে?

তোমরা না গেলেও আয়েঙ্গার ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন তোমাদের। কেন না আইন করে জীব-জন্তু পাখিদের খেলা বন্ধ করান হবে সার্কাসে। তোমাদের তখন তো যেতেই হবে। না গিয়ে উপায় থাকবে না কোনো।

তাহলে যাই! সুন্দরী বলল।

চলো। কামিনীর গলায় শোনা গেল এই কথা। তাদের পিঠে চড়ে বসা টুপি আর লাড্ডু বলল, বেশ তো, যাওয়া যাক তাহলে। তারপর পায়ের শেকল খোলা কামিনী আর সুন্দরী একটু একটু করে বেরিয়ে এল শামিয়ানার চৌহদ্দির বাইরে। তাদের আসার চেষ্টাই অবশ্য বাঁশ ভাঙল, শামিয়ানার কাপড় ফর্দা-ফাঁই। বাইরে এসে চাঁদের আলোয় দাঁড়াল বাঁধন খোলা সুন্দরী আর কামিনী। বনের থেকে বেরিয়ে আসা দুই হাতি অপেক্ষা করছে তাদেরই জন্যে। এমনটি মনে হল দেখেই।

খানিকটা দূরে হিন্দুস্থান কপারের আবছা আলো, আকাশে অনেক অনেক তারা, বাহারি চাঁদকে সাক্ষী রেখে দুই হাতি নিজেদের পিঠে দুই জোকারকে বসিয়ে হাঁটতে শুরু করল নতুন রাস্তায়। সামনে দুই মহা গজ। পেছন পেছন কামিনী আর সুন্দরী।

তাহলে আমরা কি এখন রাতমোহনার দিকে যাব? হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইল কামিনী। সঙ্গে সুন্দরীও।

দেখি, চলো না। দেখা যাক যাওয়া যায় কোন দিকে। বলেই পা চালাল বনের দুই হাতি।

লাড্ডু আর টুপি মহা উৎসাহে কি যেন বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে। তাদের চকমকে ঝলঝলে পোশাকে চাঁদের আলো পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ দেখলে মনে হবে রঙের নদী। নিজেদের মাথায় রাংতার মুকুট এক হাত দিয়ে ভালো মতো বসাতে বসাতে বলল টুপি, বেশি জোরে হাওয়া দিলে উড়ে যাবে কিন্তু। চেপে ধরে রাখ লাড্ডু। ঠিক করে ধরে রাখ, নইলে মুকুট পালিয়ে যাবে।

সুন্দরী আর কামিনী-- দুই হাতিই সেই কথা শুনে সামান্য হাসল। সামনের পথ ততক্ষণে শেষ রাতের চাঁদের আলোয় একদম অন্যরকম হয়ে গেছে। রাতমোহানার সেই আলোয় ছায়া পড়ছে চার হাতির। আর তাদের পিঠে বসা দুই বামনের।

ছয়

আতপত্র, আতপত্র কাহারে কহে,বলিতে পারে?

ঠাকুরদার গলা গম্ভীর। বয়স্ক দুচোখ এখনও কেমন চকচকে। বিশেষ করে চোখের মণি। সাধারণভাবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু চোখের মণি কেমন যেন ঝাপসা আর ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর তা হয় নি। মাথার চুলে অল্প অল্প শাদা গুঁড়ো, শরীর এখনও বেশ টানটান। বিশেষ করে গলা আর হাতের চামড়া, যা সময়ের নিয়মে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলগা হয়ে গিয়ে কুঁচকে যেতে থাকে।

আতপত্র কাহারে কহে? নাতি রাজশেখরের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ভুপতিরঞ্জন সান্যাল।

আতপত্র। আতপত্র। আতপত্র নিজের মনেই শব্দটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন রাজশেখর। একটা পুরনো কুলকাঁটা হয়ে বারে বারে খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে যেন মাথার ভেতর। হাতড়াতে হাতড়াতে কিছুতেই তার আগামুড়ো খুঁজে পাচ্ছেন না রাজশেখর।

কি ছাতার মাথা পড়াশুনো হয় স্কুলে।

রাজশেখর কোনো জবাব দিতে পারছেন না।

শিক্ষকরা কি সব ঘোড়ায় ঘাস কাটেন! কি পড়ান তাঁরা!

রাজশেখর চুপ। মুখে একটাও কথা নেই। এমন কি একটা শব্দও না। তাঁর মনে হচ্ছে যদি কোনো রকমে রামায়ণে সীতা যেমন চলে যেতে পেরেছিল পাতালে, সে রকম কিছু একটা হলে, মানে মুর্শিদাবাদের এই সান্যাল পাড়ার মাটি কোন অজানা মন্ত্রবলে পরিষ্কার দু ফাঁক হয়ে গেলে, তার মধ্যে চোখ কান বুজে সোজা ঢুকে পড়লে অন্তত এই পোড়াইনা পোড়াইনা কথা থেকে তো বাঁচা যেত।

এক দেশ ভেঙে দুই হয়ে গেছে ততদিনে —ভারত আর পাকিস্তান। রাজশাহি জেলা, ধূলিচন্দন গ্রাম, পদ্মা নদী, সান্যালদের প্রাসাদ, কাছারিবাড়ি, জমি-জিরেত—সবই এনিমি প্রপার্টি।

কি ছাইয়ের পড়াশুনো হয় স্কুলে? ইহার থিকা তো অনেক অনেক ভালো ছিল আমাদিগের ধূলিচন্দনের বরদাসুন্দরী বিদ্যাপীঠ। আমার ঠাকুরমার শাশুড়ির নামে উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার চর্চা অন্যরকম ছিল। ঢাকা হইতে ইংরাজ পরিদর্শক রবার্টসন উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়া যারপরনাই খুশি হইয়া ছিলেন। তিনি তিন রাত্রি আমাদিগের প্রাসাদের বাহির মহলে অবস্থান করিয়াছিলেন। পদ্মা চরে শীতের পাখি শিকারে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। বাবা তাঁহার লোকলশকর, বন্দুক, রাইফেল, হাতি লইয়া রবার্টসন সাহেবের শিকার সঙ্গী হইয়াছিলেন। তিনি পদ্মা

বক্ষে এক রাত্র বোটে অতিবাহিত করেন। চন্দ্রালোকিত রাত-ছিল। তখন পদ্মার শোভা অপূর্ব। ইহা ছাড়া ভোর হইতে না হইতেই পক্ষী শিকারে ব্যস্ত হওয়া যাইবে সাহেবের মনে এরূপ বাসনাও ছিল। মেঘডম্বরু, মেঘপাল—সান্যালদিগের এস্টেটের দুই পূর্ণবয়স্ক হস্তী অনুসরণ করিয়াছে সাহেবকে। তাহারা সর্বদা সে স্থলে মজুদ। বলিতে গেলে রবার্টসন সাহেবের নিমিত্ত মেলা লাগিয়া গিয়াছে ধূলিচন্দনে। শেষের দিন আবার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডবসন সাহেব আসিলেন। যোগ দিলেন শিকারে। সে এক মহামারি কাণ্ড। শেষ পর্যন্ত মেঘডম্বরুর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন ডবসন। মেঘপাল পৃষ্ঠে ধরিয়াছে রবার্টসনকে। দুই ইউরোপিয় রাজপুরুষের মস্তকেই আতপত্র। মহার্ঘ রেশমি বস্ত্রে তৈয়ারি সেই আতপত্র তাহাদিগের মস্তকোপরি শোভা পাইতেছে। দুই ইংরাজ রাজপুরুষ তো সান্যালদিগের এমত আচরণে বিমোহিত। রায়বাহাদুর, রায়সাহেবের পর আরও যদি কোনো খেতাব থাকিত হিজ অর হার ম্যাজেস্টির, দুই সাহেবই তাহা ভাবে।

আতপত্রটি বিশেষ অর্ডার দিয়া আনান হইয়াছে ঢাকা হইতে। যদিও তাহা খোলা বন্ধের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। সর্বদাই যাহার শিরে রৌদ্র নিবারণার্থ ধরা হইয়ছে, সেরূপেই ধরিয়া থাকিতে হইবে একনিষ্ঠ ভাবে। কিন্তু তাহার রূপ, সৌন্দর্য অসাধারণ। রেশম নির্মিত সেই আতপত্র দেখিয়া দুই ইংরাজ একেবারে বিগলিত, বিমোহিত।

ভূপতিরঞ্জনের মুখে নিজেদের বাড়ির এরকম টুকরো টুকরো অনেক গপপো শুনতে পান রাজশেখর। আর সেইসব পুরনো কাহিনির ভিতর সাঁতার কাটতে কাটতে ডুব দিয়ে ভূপতি তুলে আনেন স্মৃতির নানা টুকরো টাকরা। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রসঙ্গ ঘুরে যায় ধূলিচন্দন গ্রামের দিকে। এসে যায় রাজশাহির ফেলে আসা নানা কথা। আর অবশ্যই সান্যালদের এস্টেট, তাঁদের বৈভব। আর এসব কিছু বলতে গিয়ে সবটাই সাধু ভাষা প্রয়োগ করেন ভূপতিরঞ্জন। আজ পর্যন্ত এর অন্যথা হতে দেখেন নি রাজশেখর। কেমন করে যেন ঠাকুরদা ঠিক ফিরে যাবেন শুদ্ধ বাংলায়। কথা বলবেন সেই রীতি মেনে। উঠে আসবে ধূলিচন্দনের কথা।

ম্যাজিস্ট্রেট আর স্কুল পরিদর্শকের মাথায় ধরা হয়েছিল সিল্কের বাহারি ছাতা। যা আনান হয়েছিল বিশেষ অর্ডার দিয়ে ঢাকা থেকে। মনে মনে গোটা ব্যাপারটা বুঝে নিলেন রাজশেখর। তার মানে আতপত্র বলতে ছাতাই বোঝাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে ছাতা—মানে হল গিয়ে ছাতা, মনে হইতাসে ছাতা, এটুকু উচ্চারণ করেই যাকে বলে আরও বেশি করে বিপদে পড়ে গেলেন রাজশেখর।

ছাতা! ছাতা কেন? কেন ছাতা বলা হয় আতপত্রকে?

এইরে, মানে বলে তো বিপদ বাড়ল আরও। মনে মনে ঠাকুরকে ডাকতে শুরু করলেন রাজশেখর। এবারের মতো বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর। রক্ষা কর, রক্ষা কর।

আতপত্র অর্থ ছাতা হবে কেন? বল, জবাব দাও।

না, মানে—রাজশেখর যেন তাঁর সামনে পেছনে পাশে থেকে যাওয়া বাতাসের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন 'আতপত্র'-র প্রকৃত অর্থ। তাহলে কি আতপত্র মানে ছাতা নয়? কিন্তু ভূপতিরঞ্জন যে বললেন, ইউরোপিয়ান ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আর শিক্ষা অধিকর্তাকে ধূলিচন্দনের সান্যাল বাড়ির পোষা হাতি মেঘডম্বরু আর মেঘপালের পিঠে বসিয়ে মাথায় সিল্কের বাহারি, চটকদার আতপত্র রেখে ঘোরান হল। তাহলে তো আতপত্র মানে ছাতাই হল। রাজশেখরের সাধারণ বুদ্ধিতে অন্তত তাই বলে। কিন্তু নিজের নাতির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ক্রমাগত শুদ্ধ বাংলা বলা ভূপতিরঞ্জন সান্যাল তাকে তো পেড়ে ফেলেছেন প্রায়। এখন রাজশেখর কিছুতেই বুঝতে পারছেন না তিনি আসলে কি করবেন। কি করতে পারেন আদৌ।

অ্যাঁ—মানে—বলে আস্তে আস্তে ঘাড় মাথা চুলকোলেন রাজশেখর।

অ্যাঁ—হ্যাঁ—অঃ হঃ। অঃ হঃ। বলে খানিকটা মুখ বিকৃত করেন ভূপতিরঞ্জন।

এই অঃ হঃ বলে ভ্যাঙান তাঁর রক্তে মিশে আছে বহু বছর। কাউকে নস্যাৎ করতে হলে তিনি সহজেই অঃ হঃ অঃ হঃ করে ওঠেন।

আলতো হাতে ঘাড় চুলকোন রাজশেখর মাথা নিচু থাকেন।

কিসুই তো পড়বা না। না বাঙ্গলা, না ইংরাজি। আর তোমরা তো বামনার ঘরের গরু, সুতরাং সংস্কৃতই বা পড়বা ক্যান? ফলে যা হওনের হইতাসে। সবটাই আমার পোড়াকপাল। আমার নাতি, সে কিনা আতপত্র অর্থ জানে না।

জানি না কোথায়? বললাম তো আতপত্র মানে ছাতা। মনে মনে এটুকু বলে মাথা নিচু করে রইল রাজশেখর।

কথা বল না। চুপ কইর‍্যা থাক, যেন ভয়ানক পণ্ডিত। অথচ মস্তিষ্কের সর্বত্র ঝুড়ি ঝুড়ি কাউ ডাং। আমি মুখ দেখলেই বোঝতে পারি। কাউ ডাং—কইলেও ভুল হয়। বলদের গু মাথা ভর্তি। ছি ছি ছিঃ—আমার নাতি বলিয়া পরিচয় দিতেও কেমুন যেন লাগে—

কিন্তু আতপত্র মানে তাহলে কি হল? ক্লাস ফাইভে পরা রাজশেখরের সামনে মোটা টিকি সমেত ন্যাড়া মাথার একজন মানুষকে মাথায় ছাতা নিয়ে হাঁটার ছবিটা ফুটে উঠল হঠাৎ। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল-এ বেড়াতে গিয়ে কোন এক সাহেবের আঁকা পুরনো কলকাতার রাস্তায় খালি পায়ে শাদা ধুতি আর ঐ একই রঙের উড়নি গায়ে হাঁটা টিকি সমেত ন্যাড়া মাথা মানুষটিকে নিজের ডান হাতে ধরে আছেন প্রায় ভূপতিরঞ্জনের বলা মতো একটি জিনিস।

এই ছবিটি অরিজিনাল নয়। প্রিন্ট। অনেক পরে বুঝতে পারি সেটা, তখন বয়স বেড়েছে আরও। এসব কথা সাঁতার দিয়ে জলঙ্গি পেরিয়ে আসা যাট পেরন রাজশেখর সান্যাল মনে করতে পারলেন মাথার ওপর হঠাৎ দু এক ফোঁটা বৃষ্টি খসে পড়ার পর। আচমকা এভাবে বৃষ্টি পড়তেই রাজশেখরের মনে হল ছাতা থাকলে সহজেই আটাকান যায় বৃষ্টি। একবার দুবার তিনবার আকাশ-জল ছুঁয়ে

গেল কপাল, গাল। যদিও সাঁতরে অতটা নদী পেরিয়ে আসার পর সমস্ত শরীরই কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে, ভিজে।

পরনের কাপড় ভিজে লেপ্টে গেছে গায়ের সঙ্গে। বৈতাল ঋষিদাসেরও একই অবস্থা। বৈশাখে তেমন করে বৃষ্টি নামে নি। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের মতোই পয়লা বৈশাখেও কোনো কোনো বছর যে রকম শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার দু-এক ফোঁটা—'যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে'-র কায়দাতে যেকম হয়, সেরকম হয়েছে ছিঁটেফোঁটা কোথাও কোথাও যাকে বলে। তাকে কোনো ভাবেই বলা যায় না বরিষণ ধারা। তো সেভাবেই আজও ছিল চাঁদ ফটফটে রাত্রি। আর তারই মধ্যে দলমার পাহাড় থেকে নেমে আসা দুই বুনো হাতির সঙ্গে জলঙ্গি সাঁতার দিয়ে পেরতে পেরতে কেমন যেন এক ঘোরের মধ্যে ছিলেন রাজশেখর সান্যাল আর বৈতাল ঋষিদাস। আকাশ থেকে নেমে আসা আলোর বিভঙ্গে অন্য কোনো এক নেশা যেন জড়িয়ে আছে। এমন কি নদী মারফত এক দেশের বর্ডার পেরিয়ে হাতিদের পেছন পেছন অন্য দেশে ঢুকে পড়ে এখন তো বেশ ভ্যাবাচাকা খাওয়া অবস্থা রাজশেখর সান্যাল ও বৈতাল ঋষিদাসের।

দূরে নতুন করে খক খক খক শব্দে ডেকে উঠছে বুড়ো তক্ষক কোনো সাত পুরনো গাছের কোটরে। অন্ধকার থেকে আবারও ভেসে এল তার ডাক। দুপায়ে হাতে পিঠে বড় বড় মশা ক্রমাগত কামড়ে যাচ্ছে। গালেও বসছে এক আধটা। চড়-চাপড় দিয়ে কত আর মারা যায়! অসম্ভব জ্বলুনি সেই কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে।

ধূলিচন্দনে সান্যালদের এস্টেটের দুই হাতি মেঘডম্বরু আর মেঘপাল মাঝে মাঝেই রাজশেখর সান্যালের মাথার মধ্যে হেঁটে বেড়ায়। শুধু মেঘডম্বরু বা মেঘপালই বা কেন, ধূলিচন্দনের যে বিশাল প্রাসাদ তার আরও কত কি হাঁটতে থাকে মাথার মধ্যে। পেতলের চোঙাঅলা খাট-পালঙ্ক, কাচকড়ার বিলিতি ফুলদানি, বাহারি কাট গ্লাসের ফরাসি ঝাড়, ঘোড়ার গাড়ি, দোনলা বন্দুক, রাইফেল, ফরাসি পারফিউমের সুরভি।

বড় বড় পুকুর, বাগান, ফসলের ক্ষেত, আলিশান বাড়ি, দেউড়ি, পিলখানা, আস্তাবল।

পদ্মার পাথাল ঢেউয়ে মাথায় মাথায় কখনও চাঁদ ভাসে, সূর্য ভাঙে কখনও। দুর্গা মণ্ডপে বাজনা বাজে সন্ধিপুজোর। পুরোহিত আর তন্ত্রধারদের চেষ্টায়, আঙুলের কারিকুরিতে একটু একটু করে ফুটে উঠতে থাকে একশো আটটি পদ্ম, জ্বলে ওঠে একশো আটটি প্রদীপ।

আবারও ডেকে ওঠে তক্ষক।

আকাশ থেকে গড়িয়ে নামে এক ফোঁটা দু' ফোঁটা। এখন একটা ছাতা হলে মন্দ হত না, অন্তত নদী সাঁতরে উঠে আবার নতুন করে ভিজে মরতে হবে না রাজশেখরদের। অবশ্য এই টুপটাপ কতক্ষণ হবে কেউ জানে না। কারণ গরম এখন

এতটাই যে দলমা নাকি দুমকা থেকে নেমে আসা দুটি মহাগজের সঙ্গে সঙ্গে নদী পেরতে সেভাবে কোনো কষ্টই হল না। জল কোথাও তেমন গভীর নয়। তাছাড়া নদীতে স্রোতও কম। শুধু দুই মহাহস্তীর পাশাপাশি ভেসে থাকলেই হয়।

আবারও রাতের চুপ করে থাকার ছবি ছিঁড়ে দিয়ে ডেকে উঠল তক্ষক। নদীর এপারে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকির জ্বলা নেভা টুনি বালবেরা ক্যারামের ঘুঁটি হয়েই যেন ছেতরে গেল সেই ডাকাডাকিতে। আর তখনই আরও দু এক ফোঁটা জল নেমে এল আশমান থেকে রাজশেখরের চাঁদিতে।

এই সময় একটা ছাতা—নিজের মনেই প্রায় চুপসে যাওয়া গলায় বললেন রাজশেখর।

হ, ছাতা, লণ্ঠন, লাঠি, গাড়ু, গামছা—সব লইয়াই নদীতে উদমা হইয়া পড়া উচিত আসিল, এসব বলতে বলতে বৈতালের গলায় হঠাৎই ফুটে ওঠা ঠাণ্ডার কাঁপ।

কিন্তু ছাতা থাকলে যদি বৃষ্টি নামে তাহলে আর বেঘোরে ভিজতে হবে না। সেটা একটা মস্ত সুবিধে। মনে মনেই এটুকুই বলে ফেললেন রাজশেখর। আর তখনই তাঁর আবারও মনে পড়ল আতপত্র শব্দটি। ঠাকুরদা ভূপতিরঞ্জন সেই কত কত বছর আগে—রাজশেখরের তখন নেহাতই কিশোরবেলা, আতপত্র শব্দটি নিয়ে অনেক, অনেকক্ষণ ধরে কচলেছিলেন। ভূপতিরঞ্জনতো এরকমই। একটা কিছু একবার ধরতে পারলেই হলো। তার আর ছাড়ান ছিড়েন নেই। সেটা নিয়েই কচলে, রগড়ে একসা করবেন। যতক্ষণ না সেটা বেশ তেতো হয়ে যায়।

অঃ হঃ অঃ হঃ—বলতে বলতে তাঁর নিজস্ব অপমানের ফণা একেবারে আস্ত কুলোপানা চক্কর বিছিয়ে তেড়ে তেড়ে আসবে। সেদিনও—সেই কিশোরবেলায়, এখনও মনে পড়ে রাজশেখরের তাঁর সঙ্গে ছাতা নিয়ে কত কথাই তো হল। কেন আতপত্র, তাওতো এই সব আলোচনার শেষে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন ভূপতিরঞ্জন। আতপ অর্থে রৌদ্র। রৌদ্র বা রোদ ঢাকার পত্র হল অতপত্র। তার আগে তিনি তো একটা সুতোও ধরিয়ে দিয়েছিলেন রাজশেখরের হাতে। যদি তাঁর নাতি পেরে যায় আতপত্র শব্দটির অর্থ, হয়ত সেই কথা ভেবেই।

চেম্বারলেন—চেম্বারলেন—ভূপতিরঞ্জনের ভরাট গলা এখনও কানে বাজে রাজশেখরের।

কোথাকার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি?

কে?

অঃ হঃ। অঃ হঃ। কে! হায় হায়! এতটাই অমনোযোগ—

না, মানে—

তুমি নিশ্চিতরূপে ছিলে না কোনো রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী। ছিলে কি?

রাজশেখর তখনও তাঁর পাতাল প্রবেশের কামনাই করছেন।

একটু থেমেই ভূপতিরঞ্জন জানতে চাইলেন, ?আমি চেম্বারলেনের নাম বলিয়াছি। তুমি নিশ্চয়ই শুনিয়াছ তাহার নাম। শুনিয়াছ কি?

রাজশেখর চুপ।

কি, শোনো নাই। সাধারণজ্ঞানের এতটাই অভাব, কিসুই অবগত নও।

চেম্বারলেন ছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। এবার বুঝিতে পারিলে?

রাজশেখর ঘাড় নাড়লেন। সেটা পারা নাকি পারা নয়, তা তেমন করে স্পষ্ট করে বোঝা গেল না।

শোনো, এই চেম্বারলেনের সহিত আতপত্রের এক বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের নাম উচ্চারিত হইলেই যে অবয়ব ভাসিয়া উঠে, তাহার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত আতপত্র। অর্থাৎ আরও বিশদে বলিতে গেলে চেম্বারলেনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই যে চিত্র আমাদিগের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, তাহার সহিত আতপত্রের আরও নিবিড় যোগ।

রাজশেখরের ঘাড় নিচু। মুখে কথা নেই।

অঃ হঃ। অঃ হঃ। কিসুই তো খবর রাখ না। পুরোদস্তর অর্বাচীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এতগুলি সূত্র উপস্থাপিত করিলাম, তথাপি তোমার কাউ ডাং—বলদ বিষ্ঠা চিহ্নিত মস্তিষ্ক কিছুমাত্র আভাস ধরিতে পারিল না। ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী-ই হইতে পারে! অতীব দুঃখজনক ঘটনা—ভূপতিরঞ্জন সান্যাল যেন বা হায় হায় করে উঠলেন নতুন করে। গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন তাঁহার হস্তে শোভা পাইতে থাকে আতপত্র।

প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকে, তার মানে কি লাঠি, পেন, পিস্তল? নিজের ভেতর প্রবলভাবে মাথা খুঁড়ে চলেছেন রাজশেখর সান্যাল। কিছুতেই কোনোভাবে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। আন্দাজে বলতেও ভয় লাগে। দুম করে কিছু একটা বলে দিলেই বিপদ। ভুল হওয়া মাত্র ভূপতিরঞ্জন অঃ হঃ অঃ হঃ বলে ভেঙিয়ে উঠবেন। সেই ভ্যাঙচানি গায়ের মধ্যে জল- বিছুটি ঘষে দিয়ে যায়। তার চিড়বিড়োনি, জ্বলুনি চলতে থাকে অনেকক্ষণ। সহজে কমতে চায় না সেই জ্বালা। তাই আন্দাজে কিছু বলাও যাচ্ছে না। তাই ভূপতিরঞ্জনের যাবতীয় তাচ্ছিল্য হজম করে যেতে হচ্ছে।

বৈতাল! ছেলেবেলার ঘোর থেকে বেরিয়ে এসে ডাক দিলেন রাজশেখর। মাথার ওপর গা গলিয়ে গলিয়ে অবিরাম জ্যোস্না দিতে থাকা চাঁদ একদম চুপচাপ। তার গায়ে কখনও কখনও মেঘের ছিন্নপত্রাবলী। অনেকটা কইর‍্যা জল পেরিয়ে আসা দুই হাতি চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তাদের সেই নীরবতা চোখে পড়ার মতোই। অন্ধকার ফুঁড়ে জেগে থাকা অনেক অনেক জোনাকিদের অনেকে সেই মহাগজদের পেটে পিঠে পায়ে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো সেঁটে গেলে অজস্র চুমকির

চিকিমিকি যেন জেগে ওঠে সেই দুই দলমা অথবা দুমকা-দামালের গায়ে। তাদের হলদেটে শাদা দাঁতে দাঁতে চাঁদের ভুলভুলাইয়া।

বৈতাল, অ্যাই হারামজাদা—

হ, যাই মাইজা কর্তা।

হারামজাদা, ডাকতাসি, শোন না! চক্ষু দুইখান তো খাইসই। কানের মাথাডাও খাইস নাকি!

হ কর্তা, হগগল কথা শোনতে পারি না।

বয়রা হইস। কানে শোন না। তাম্‌শা। হালা জুতাইয়া তোমারে সিধা করুম আমি।

আইজ্ঞা কর্তা।

জুতামু কইলাম, এই হানেও আইজ্ঞা কর্তা—তুই কি মাইনষের পদবাচ্য কোনো দিনই হইবি না?

যা কন আপনে।

বৈতাল, আমরা এখন যামু কোন হানে? দুই হাতির পিছন পিছন জলঙ্গি সাতরাইয়া আমরা তো ঐ পার থিকা এই পারে আইসা পৌঁছাইলাম। এখান থিকা কতদূর ধূলিচন্দন। আন্তাজে কিছুমাত্র বোঝতে পারি না।

রাত্রকাল, আমিও তো কিছুই বুঝতাসি না আন্তাজে। কত দূর হইব ধূলিচন্দন। কিসুই তো ঠাওর পাই না আন্ধারে!

মাথার ওপর আকাশের গায়ে জ্যোৎস্না সাপ্লাই করতে করতে লুটোপুটি খায় চাঁদ। সেদিকে না তাকিয়েও খানিকটা ভয়ে ভয়েই যেন বলে বৈতাল, মাইজা কর্তা, একটা কথা কমু!

কইয়া ফ্যালাও।

না, থাউক গিয়।

ক্যান, থাকব ক্যান, যা কইথাসিলা —কও।

না আসলে এই ভাবে চইল্যা আসন কি ঠিক হইল?

কী ভাবে?

এই যে হাতি গো পাছে পাছে নদী পারাইলাম। পার হইয়া চইলা আইলাম এই পাড়ে, কারেও কোনো কথা কই নাই, কেও জানে না। যদি আমাগো কোনো বিপদ হয়, তখন!

হইতেই পারে।

এইটা আপনে কি কইলেন, মাইজা কত্তা!

ঠিকই কইসি। বিপদ হইলে হইবে। তারে তো কোনো ভাবেই ঠেকাইয়া রাখতে পারুম না। নিয়তি কেন বাধ্যতে। নিয়তি নির্ধারিত বিষয় কে-ই বা খণ্ডাইতে পারে? কপালের লিখন—

ভ্যাদরা প্যাচাল ছাড়েন তো মাইজা কর্তা, আমি মরতাসি অখন নিজের জ্বালায়। কেমুন কইর‍্যা বাড়ি ফিরা যামু ভাবতাসি। আর উনি আইলেন অং বং চং মন্ত্র লইয়া। পিত্তি জ্বইলা যায় দেইখ্যা। কামের কাম কিসু নাই। আকাশ লাথথাইনা কথা কওনের বিরাম নাই। এদিকে উনার কথা মতো নদীতে নাইম্যা হাতি গো লগে নদী সাতরাইতে সাতরাইতে আমি তো ভিজা ভুইজ্যা একসা। যারে কয় এক্কেরে ছন চোরের দশা আমার। উনারও তাই। হেই অবস্থায় আবার জ্ঞানের ধূপতি লইয়া উনি আইলেন। সেই যে মায়ে কইতেন না, কে মরে কার রঙ্গে/কানি মরে তার দুই চক্ষের রঙ্গে। তো আমাগো মাইজা কর্তার হইসে হেই দশা। এতসব পরপর মনে মনে ভেবে নিল বৈতাল ঋষিদাস। কিন্তু মুখে কিছু বলার সাহস নেই, উপায়ও নেই।

এই বৈতাল, বয়রা হারামজাদা।

হ, কন মাইজা কর্তা।

বাইচ্যা আছস তা অইলে!

সবই আপনেগো দয়ায় মাইজা কর্তা।

হঃ থোঃ। থো তো। বলতে বলতেই এবার ডান গালে বৃষ্টি পড়ার ছোঁয়া টের পেলেন রাজশেখর। সেই গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসা জলবিন্দুর ছোঁয়ায় তাঁর আবারও মনে পড়ল ঠাকুরদা ভূপতিরঞ্জনের জিগ্যেস করা আতপত্রর মানে, সূত্র হিসেবে বলে দেওয়া চেম্বারলেন আর বালকবেলা, নয়তা বা কিশোরকালের সেই আলো-অন্ধকার।

শেষ পর্যন্ত আতপত্রের বাংলা অর্থটি বলে দিয়েছিলেন ভূপতিরঞ্জন। কিসুই খবর রাখ না। ল্যাখাপড়ায় তো দিন দিন যা হইতাসে—বলেই তিনি অঃ হঃ অঃ হঃ করে সবই তুচ্ছ, নগণ্য, এই পৃথিবীতে—অন্তত তাঁর সামনে যা পড়ে,এরকম সংকেত দিলেন। তারপর বললেন, ছাতা বুঝ, ছাতা—

নবীন রাজশেখর তখনও মনে মনে হয়ত বা জুড়ে জুড়ে তৈরি করতে চাইছিলেন ছাতার ছবিই। যেমন কিনা পুরনো ডিহি কলকাতার মানুষজন কেউ কেউ ছত্র মাথায় রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন। তার আশেপাশে ঘোড়ার গাড়ি, মশক কাঁধে ভিশতি, ঘোড়ায় চড়া সাহেব, পথ হাঁটা বাবু, এদিক ওদিকে পালকি বেহারারা। সেই ছাতা বন্ধ করা যায় না। খুলেই রাখতে হয়। বহু বছর পর পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের সামনে অমন ছাতা মাথায় দেওয়া, মাথা কামানো, তার সঙ্গে পুরুষ্টু টিকি রাখা লোকজন দেখেছেন রাজশেখর। সেও তো এই আতপত্র শব্দটির মানে জেনে নেওয়ার কথ কত বছর পরে। জীবন তো এ ভাবেই গড়াতে থাকে। তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে কোথায় যে চলে যায়!

এত বছর পর সাঁতরে নদী পেরিয়ে আসা দুই হাতির সঙ্গে এপারে উঠে এসে রাজশেখর সান্যালের হঠাৎই বহু বছর আগে তাঁর ঠাকুরদার কাছ থেকে শেখা আতপত্র শব্দটির মানে মনে পড়ে গেল বৃষ্টির ছোঁয়ায়। একটা ছাতা থাকলে

কোনো সমস্যা থাকে না, যদি ঝমঝমিয়ে নামে—ভাবতে ভাবতে আকাশের দিকে একবার নজর ফেললেন রাজশেখর। তেমন করে হানাদারি নেই মেঘের। অথচ দু এক ফোঁটা দু এক ফোঁটা টুপটাপ যেভাবে পড়ছে তাতে ভয় হয় হঠাৎ যদি আসে মুষলধারে। তখন তো মাথা বাঁচানই দায় হয়ে উঠবে।

পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নদীর বুক থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডা বাতাস সামান্য হলেও একটু যেন শিরশিরিয়ে দিয়ে গেল সারা গা।

দূরে আবারও ডেকে উঠল বয়স্ক তক্ষক। জোনাকিরা তেমনই ব্যস্ত অন্ধকারে আলোর বিন্দু এঁকে দিতে। মশা, পোকারা হাতি, মানুষ—কাউকেই ছাড়ে না, রক্ত চুষে নেওয়ার ব্যাপারে।

মাইজা কর্তা, আমরা যে আইয়া পড়লাম এই পাড়ে, তখন যদি বি ডি আর আমাগো ধরে। বৈতাল ঋষিদাসের গলায় সব কিছু ভেঙে পড়ার বাজনা, খুব আলতো করে হলেও ফুটে উঠল।

কি মিউ মিউ করস। স্পষ্ট কইরা ক।

না, কী কইসিলাম—

কি, কইতাসিলি?

আইজ্ঞা বি ডি আর—এপারে বি ডি আর। ও পারে বি এচ এফ, আমরা যামু কই কন তো কর্তা! যাওনের রাস্তা কোনহানে। কোথাও তো কোনো পথ দেখতাসি না।

ক্যান কি হইল!

আপনে তো হাতি গো লগে চইল্যা আসলেন। আপনের লগে লগে আম্যি। কিন্তু এইবার হইবডা কি? হাতিরা তো খাড়াইয়া রইল। তখন আপনে ফিরবেন কি কইর‍্যা? আমিই বা ফিরুম ক্যামনে? ইনডিয়া তো ফিরতেই হইব। এটা তো—এই দ্যাশ অখন বিদ্যাশ। সেখানে আমাগো মতো মাইনষের কোনো জায়গা নাই।

কিন্তু মেঘডম্বরু আর মেঘপাল। আমাগো ধূলিচন্দনের দুই খান হাতি!

তারা তো কবে মরসে বর্ডারে।

মরসে?

হ মরসে। আপনের ঠাউরদা তাগো লইয়া আসে নাই ইনডিয়ায়। তারা বর্ডারে বইয়া বইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া চক্ষু বোঝসে। হেয়াগো খাওনের কোনো ব্যবস্থা নাই, জল নাই। চাইর দিকে পাকিস্তানের পুলিশ ঘেইরা রইসে। এ অবস্থায় যা হওনের তাই হলি।

সইত্য কথা কইতাম, হেয়ার দুয়োটায় মরসে!

হ মরসে।

কি কস বৈতাল। মেঘপাল, মেগডম্বরু মরে নাই। হেয়ারা পাহাড় থিকা জঙ্গল পার হইয়া বাইরাইসে। হ্যারা অখন ঘোরসে, ঘোরবে।

এইডা কি কন মাইজাকর্তা! আপনে হাতি গো পিছনে পিছনে নদী সাতরাইয়া আইয়া পড়লেন, হেইডা দেইখ্যা আমিও আপনেরে ধরতে চাইলাম।

ক্যান, ধরতে চাইলি ক্যান হারামজাদা।

না আইস্যা উপায় কি! এটা তো চইল্যা আসত্তেসে বসরের পর বসর। বৈতালরা ধূলিচন্দনের সান্যালবাবুগো লগে লগে থাকে।

শুধু তুই না। তর ঠাউরদাও আমার ঠাউরদার লগে লগে থাকত।

হ, শুনসি মাইজা কর্তা। সব শুনসি।

তা হইলে আতপত্রের ব্যবস্থা করবে কেডা!

আতপত্র—কথাটা হয়ত বা ঠিক মতো উচ্চরাণ করতে পারল না বৈতাল ঋষিদাস। তার জিভের টানে আতপত্র শব্দটি হয়ত বা আতপত বা এরকম কিছু হয়ে বেজে উঠল। সেই উচ্চারণের পর ভুল হয়েছে মনে করে বড় করেই জিভ কাটল বৈতাল। তার এই মুখভঙ্গি দেখে হয়ত বা হেসে ফেলল আকাশের চাঁদও।

আতপত—হেইডা আবার কি! নতুন করে একটা উচ্চারণ করে বৈতাল আগের ভুল বলা হয়ত বা সামলাতে চাইল জোড়াতালি দিয়ে।

আতপত না আতপত্র।

ঐ হইল।

ঐ হইল! হারামজাদা।

ঐ সব হাজর বাজর বাইক্য বাদ দ্যান মাইজা কর্তা। হেইয়া বইল্যা কইয়া কিসু হইব না। হাতি গো লগে আসছেন। নদী পার হইসেন। অখন দাড়াইয়া আসেন অইন্য দ্যাশে। বি ডি আর ধরতে পারলে আমাগো জ্যালে ঢুকাইয়া তবে ছাড়ব। বি এচ এফ ধরলেও তাই। তবে ইনডিয়ার লোক বইল্যা শাস্তি হয়ত কিসু কম হইব। আমারও পোড়া কপাল, ক্যান আপনেরে আইটকাইলাম না নদীতে নামনের সময়। হাতি গো লগে লগে আপনে আসতে চাইলেন। সাতার দিলেন, বন পাহাড় পার হইয়া যে হাতিরা চইল্যা আসছে শহরের দিকে তাগো ভাবলেন ধূলিচন্দনের সান্যালদের মেঘপাল আর মেঘডম্বরু। মনে মনে এতসব কথা বললেও মুখ ফুটে কিছুই বলা হল না বৈতাল ঋষিদাসের। কারণ সে জানে জল পার হওয়া ভিজা গায়ের মাইজা কর্তার ম্যাজাজ অখন খুবই খাররা। চড়, থাবড়ও লাগাইয়া দিতে পারে যখন তখন।

দূর থেকে আবারও ভেসে এল তক্ষকের ডাক।

বন পালান দুই হাতি খানিকটা তফাতে কালচে সবুজ পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের সমস্ত গায়ে মিটমিটে জোনাকির আলোছাপ! অল্প অল্প কান নাড়ছে হাতি।

বৈতাল, চল হাতিগো পিঠে উইঠ্যা বসি। তারপর হেয়াগো লইয়া একেবারে ধূলিচন্দনের দিকে—

পাগল হইলেন আপনে!

ক্যান হেয়ার মধ্যে আবার পাগলের কি হইল! এটুকু বলেই ভিজে কাপড়ে সামনের দিকে নতুন করে হাঁটতে লাগলেন রাজশেখর সান্যাল।

আউগাইয়েন না মাইজাকর্তা। অরা বন থিকা বাইরাইসে। আপনাগো সেই দুই হাতি—মেঘপাল আর মেঘডম্বরু নয়, হ্যারা, হ্যারা অইন্য।

রাজশেখর সান্যাল কি আদৌ শুনতে পেলেন বৈতাল ঋষিদাসের কথা, নাকি শুনেও তিনি সেই সব সাবধান বাণী ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন বাতাসে!

আর আউগাইয়েন না মাইজা কর্তা। সমস্ত নিঝুম চরাচর কাঁপিয়ে, হাওয়া ছিঁড়ে দিতে দিতে জেগে উঠল বৈতাল ঋষিদাসের কণ্ঠস্বর।

রাজশেখর কি শুনতে পেলেন আদৌ?

শুনেও কি গ্রাহ্যের ভেতর আনলেন কোনোরকম?

নাকি তিনি অবলীলায় উড়িয়ে দিতে পারলেন ঋষিদাসের যাবতীয় কথা!

মাইজা কর্তা, বি ডি আর আইয়া পড়ব—বৈতালের এই চেতাবনি শুনেও দাঁড়ালেন না রাজশেখর।

মাইজা কর্তা, এই হাতিরা বন থিকা বাইরাইসে। তারা পোষ মানে নাই। বৈতালের গলা মস্ত এক হাহাকারের বুদবুদ হয়ে ফেটে গেল হাওয়ার ভেতর।

তবুও দাঁড়ালেন না রাজশেখর। জ্যোৎস্নার চাদর গায়ে তিনি হাঁটতেই থাকলেন সামনের দিকে।

বুড়ো তক্ষক ঠিক তখনই তার প্রাচীন অন্ধকার কোটর থেকে আবারও ডেকে উঠল। পর পর তিন বার।

চার বারও হতে পারে।

সাত

আমাদের জঙ্গমবাড়ির সেই মৈত্র হাভেলি নিশ্চয়ই পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের 'হরধাম'-এর মতো অত বিশাল নয়, কিন্তু আড়ে বহরে সেও তো নেহাত ছোটটি নয়। সে বাড়িতে খুব ঘটা করে শিবচর্তুদশী হত। বাড়িতে এক হাজার শিবলিঙ্গ, উঠোনে, পাথরে তৈরি খাড়াই সিঁড়ির পাশে, এছাড়া ঠাকুরঘরে তো আছেই। মৈত্রদের পূর্বপুরুষ হরিবিষ্ণু মৈত্র তাঁর ছোট ছেলে বেম্মোজ্ঞানীদের কাছ থেকে আবার নিজের ধর্মে ফিরে এলে এক হাজার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এই বাড়িতে, অনেক যাগযজ্ঞ ধুমধাম করে। শিবক্ষেত্রে সবাই পুজো পান রোজ নিয়ম করে। এছাড়া বাড়িতে নৃসিংহনারায়ণ শিলা আছে। রয়েছে আনন্দময়ী কালী।

যারা কিনল ঐ বাড়ি তারা কি কিনে নিল সব দেবদেবী, শিবলিঙ্গ সমেত? রাজরাজেশ্বরী দেব্যার বলা কথার সুতো ধরে জানতে চাইলেন রাজশেখর সান্যাল। এটুকু বলার ফাঁকে রাজশেখর আড়চোখে তাকালেন রাজরাজেশ্বরীর দিকে। প্রায় আশি রাজরাজেশ্বরী এখনও বয়সের তুলনায় বেশ টরটরি। সতেজ। লম্বা, পাতলা-পাতলা চেহারা। ফরসা, লম্বাটে গড়ন। মাথার পাকা চুল এখনও থাক থাক, সুন্দর। যত্ন করে আঁচড়ানো। সেই চুল থেকে কখনও কখনও উড়ে আসে 'মহাভৃঙ্গরাজ'-এর সুঘ্রাণ। পাতা কেটে বসানো চুলে ছোট কপাল আরও ছোট। পাতলা ঠোঁটে, টানা চোখের হালকা খয়েরি তারায় এখনও রূপের আলো।

বোনের শাশুড়িকে মাওইমা বলাই রীতি। তবু রাজশেখর বেশ আধুনিক হয়ে উঠে মাসিমা বলেই ডাক দেন তাঁকে। ষাট পেরনর পর মাঝে মাঝে পুরনো আত্মীয়দের বাড়ি একটু ঘুরে ফিরে নিজেকে খানিকটা ঝালিয়ে নেওয়া, স্মৃতির অতলে তলানো নানা ঘটনা হঠাৎ হঠাৎ তুলে আনা সামনে, এরকমই ইচ্ছে তাঁর। এটাও কি এক ধরনের পাগলামি, এ বাজারে? ছুটির দিনে বা এমনি দিনেও কোনো রকম না জানিয়ে হুটহাট চলে যাওয়া আত্মীয় বাড়ি, এমনকী দূরসম্পর্কের কুটুমদের কাছেও—সে কি নেহাত খবর দেওয়া নেওয়া! নাকি সময় কাটান? বউ মারা গেলে বিপত্নীক পুরুষ কি এই বয়েসে পৌঁছে এমনই করে? যেমন রাজশেখর!

ভাদ্র ফুরিয়ে আশ্বিন এল প্রায়। বাতাসে কেমন একটা ভ্যাপসা গুমোট। শাদা থানের আঁচলে গলা, মুখ, ঘাড়ের ঘাম থুপে নিয়ে রাজরাজেশ্বরী বললেন, কাশীতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের দুর্গা ভাসান দেখার মতো। কী তার জাঁক, আলো। নৌকোয় নৌকোয় ছয়লাপ দাশাশ্বমেধ ঘাট। এই সময়টা বেনারসে থাকলে গোধূলিয়ার মনমোহন পাঁড়ের ধর্মশালায় একদম সামনের দিকে প্রতিমা গড়ার তুমুল আয়োজন। খড়ের কাঠামোর ওপর একমেটে হয়ে গেছে। বর্ষায় উত্তরবাহিনী গঙ্গা টইটুম্বুর। ঘাট দিয়ে ঘাট দিয়ে হেঁটে গোটা কাশী যেভাবে পরিক্রমা করা যায় শীতে, গ্রীষ্মেও—তেমনটি এই বৃষ্টি বাদলের দিনে হওয়ার উপায় নেই।

রাজরাজেশ্বরী দেখতে পেলেন গঙ্গার বুকে বেশ কয়েকটা বজরা, নৌকো। গঙ্গার দিক মুখ করে দশাশ্বমেধে দাঁড়ালে বাঁদিকে মণিকর্ণিকা, অনেক দূরে অসসি ঘাট। তার ওপরে দোতলা মদনমোহন মালব্য ব্রিজ। ডানদিকে শীতলা ঘাট, কেদার ঘাট। কোনো কোনো বার খুব বর্ষায় জল অনেক অনেক বেড়ে গেলে সেই ঘাট ডুবিয়ে বইতে থাকে নদী।

কেদার ঘাট ডুবে গেলে কাশী শহরে জল ঢুকে পড়ার বিপদ মাথা নাড়তে থাকে। এই সময়টায়—বর্ষা যায় শরৎ আসে, এমন একটা আবহাওয়ার মধ্যে ভরা পুজো পুজো গন্ধে রাজরাজেশ্বরী কখন যেন ডুবে যান একটু একটু করে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘ তো সিগরায়? জানতে চান রাজশেখর।

হ্যাঁ। কথা না বলে মাথা নেড়ে বলেন রাজরাজেশ্বরী।

আর রামকৃষ্ণ মিশন?

সে তো সিগরা থেকে গোধূলিয়া আসতে ডানদিকে শিখদের গুরুদ্বারের পর, ওই ডান হাতেই পড়বে। আরও খানিকটা গেলেই তো পাঁড়ের ধর্মশালা। তারপরই হরসুন্দরী। সেটা তো আবার কলকাতার মহেশ ভট্টাচার্য্যিদের, যাদের হোমিয়োপ্যাথি ওষুধের বিখ্যাত দোকান—একটু আস্তে আস্তে বলে রাজরাজেশ্বরী দিকে তাকান রাজশেখর। তারপরই মনে মনে ভাবেন মুর্শিদাবাদ থেকে বিরাটি তো বেশ দূর! তাই আসা হয় আর কই তেমন করে! বয়স, আসলে বয়স এমনই জিনিস। একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে থামিয়ে দিতে চায় সব কিছু। সেই যে বাবা বলতেন না—মনে পড়ে যায় রাজশেখরের—বাজারে যেতে কত ভালো লাগত একসময়। কিনি আর না কিনি, ঘুরে ঘুরে দেখা, দেখতে থাকা—কত রকমারি জিনিস যে আসে। এখন আর বাজারে যেতেও ইচ্ছে হয় না। মনে হয় যেন কত দূর। ভাবি, কী হবে গিয়ে। থাক না, বেশ তো আছি। কাল নয় দেখা যাবে একবার।

আজকাল বেরতে ইচ্ছে করে না সবসময়। তাছাড়া একা ছেড়ে দিতেও চায় না বাড়ি থেকে। সঙ্গে সেই বৈতাল ঋষিদাস। যাকে কিনা অঙ্গলঙ্গের বোঝা বলে সবাই আমার। বৈতাল এসেই খুব গপপো জমিয়েছে বোন সোহাগের সঙ্গে। রান্নাঘরের দরজায় বসে বসে কী যে অত অত কথা বলে হারামজাদা! সে কি রাজশাহির ধূলিচন্দনের নানা খোয়াব দেখছে আর দেখাচ্ছে সোহাগকে! সেই যে রাজশাহির ধূলিচন্দন গ্রাম, সান্যালদের এস্টেট, মেঘডম্বরু আর মেঘপাল নামে দুই মহা ...। তাদের গলার ঘণ্টাধ্বনি, পিঠের বাহারি সাজ, ওদের মাথায় কখনও কখনও অঙ্কুশ মারতে মারতে মাহুতের হাতি ছোটান। সেও তো এক দেখার মতোই দৃশ্য। ডাঙশের ঘায়ে হাতি দৌড়চ্ছে প্রাণপণে।

কর্তামশাই বলেছেন বিদ্রোহী প্রজাদের হাতি লেলিয়ে দিতে। তাই এই আদেশ পালন।

পুজোর আগে বুইনের লগে দ্যাখা করতে গেলে হাতে কইর‍্যা সামান্য কিছু টুটকি টাটাকি লইয়া যাইতে হয়ত, মনে মনে কে যেন বলে যায় রাজশেখরকে।

কী নিয়া যামু।

ক্যান, যা পাও।

নিজের সঙ্গেই নিজে যেন কথা বলছেন রাজশেখর।

পয়সা নাই আমার। কিসু নিয়া যাইতে হইলে পোলাগো কাসে হাত পাততে হয়।

ক্যান, ব্যাংকের সুদ নাই তোমার?

কোথায়, সেই সুঁদ তো ক্রমাগত কমতাসে। সরকার যে কী পলিসি নিসে বুইঝ্যা পাই না। এইভাবে ব্যাংকের, পোস্টাপিসের সুদ কমাইলে আমরা খামু কি।

তুমি বুড়া কিপটা আস।

কী কইলা, আমারে কিপটা কইলা! আমি কিপটা!

হ, কিপটাই তো।

আমি ধূলিচন্দনের সান্যালগো এস্টেটের মাইজা কর্তা। আমার লগে লগে এখনও ঋষিদাস বৈতাল নামের চাকর ঘুইরা বেড়ায়। আমারে তুমি কিপটা কও! কইতে পারলা! মনে মনে এটুকু বলেই রাজশেখর ভাবেন, অবশ্য বৈতাল ঠিক চাকর নয় একেবারেই। বরং তাকে খানিকটা সবসময়ের সঙ্গী বলা যায়। কিন্তু এসব কিছুই না বলে রাজশেখর বললেন, আমারে কিপটা কইলা!

ক্যান কমু না! বুইনের বাড়ি যাইতাস, খালি হাতে কেউ যায়। কুটুমবাড়ি খালি হাতে গেলে নিন্দা হয় না!

পাঠাইলাম তো কয়দিন আগেই।

কী পাঠাইল্যা?

দশেরি আম তিন কিলো। একশো কুড়ি টাকা খইস্যা গেল গিয়া। মুর্শিদাবাদের বাজার থিকা বৈতাল হারামজাদা কিইন্যা আনসে।

পয়সা কেডায় দিসিল?

ক্যান, আমি।

কোইথিকা পাইলা পয়সা?

পাইলাম।

অ, পাইলা! আর এইদিকে খালি কও, পয়সা নাই, পয়সা নাই। কোনহানে পয়সা পামু? সেই এক ভ্যাদরা প্যাচাল।

সত্য সত্যই তো পয়সা নাই অমার। তেমুন পয়সা আয় করি কোথায় কও তো! সবই লিমিটেড। এক্কেরে যারে কওন যায় গোনা টাকা। বৈতাল হঠাৎই মুর্শিদাবাদের সান্যাল পাড়ার বাজার থিকা চাইর কিলো দশেরি আম লইয়া হাজির। বাকিতে দিসে হারামজাদারে। নির্বইংশার পোলা আমঅলা। জানে দিয়া তো দেই। গছাইতে পারলে বাবুই তো দাম দিয়া যাবে। হেইডা ও জানে। ও কি আর বৈতালের ভরসায় দিসে! যার চাল নাই চুলা নাই। আপনে না পায় ঠায়, শংকারের ডাকে—বৈতালের তো হইসে সেই দশা। সবখানে তার মোড়লি মারন চাই।

নিজের ভেতরে ভেতরে এসব কথার ঢেউ তুলতে তুলতেই রাজশেখর সান্যাল বাইরে আকাশের দিকে তাকালেন। এই যে বর্ষা যাই যাই আর শরৎ আসি আসি সময়, পুরনো ক্যালেনডারের হিসেবে, কিন্তু আকাশ, পথঘাট প্রায়ই তেমন সুরে কথা বলে না। এবার তো বৃষ্টি সেভাবে হয়ই নি। সবাই বলছে, বর্ষা দেরি করে আসবে এ বছর। আর ভাসাবে সবকিছু। রাস্তাঘাটের এমনিতেই যা শোচনীয় অবস্থা। কিন্তু বৈতাল হারামজাদা যে বলছিল বারবার, পূজার আগে যাইবেন কর্তা, কিস্যু লইয়া যাইবেন না বুইনের জইন্যে। মায়ের প্যাটের বুইন।

ওর মুখেও যেন নিজের ভেতর থেকে বলা কথার ছায়া ভাসল।

কী লইয়া যাই কও তো। শাড়ি, কাপড় ভীষণ দাম। চাইর-পাচশো টাকার কমে হইব না। বেশিও হইতে পারে। তার উপর জামাই, মানে হইল গিয়া বুইনের স্বামী। তিন ভাইগ্না। তাগো বউ। হেয়াগো পোলা মাইয়া। বুইনের শাশুড়ি-মা—মাওইমা। দিলে হগগলরে দিতে হয়। না দিলে কেউরে না। একজনেরে দিয়া অন্যজনের নিরাশ করুম হেইড়া ধূলিচন্দনের সান্যালগো কুষ্ঠিতে ল্যাখে নাই। আমি পারুম না বৈতাল, এই রাবণের গুষ্ঠিরে পোষতে।

ছিঃ, মাইজা কর্তা! আপনে কন কী! কী কইর‍্যা কন এই কথা। আমি বৈতাল ঋষিদাস, সাত পুরুষ ধইর‍্যা আপনেগো পায়ের জোতা, আমি কইলে নয় হইত। কিন্তু আপনে! সেদিন চাইর সের দশেরি লইয়া গ্যালাম, দেইখ্যা সোহাগ দিদির মুখখান এক্কেরে চান্দের লাখান। তাড়াতাড়ি আম গুছাইয়া রাখল। আমারেও কাইট্যা দিসে একখান।

আস্তা!

হ।

তুই আস্তা আম খাইলি হারামজাদা! নির্বংইশার পোলা।

হ খাইলাম। না খাওনের কী আসে!

পুরাটা?

হ। দিলে কী করুম!

তর লজ্জা করল না!

ক্যান, লজ্জা করব ক্যান!

চল্লিশ টাকা কিলো দশেরি। তিনটায় এককিলো হয়। সাইজে ছোট হইলে বড় জোর চাইরডা। সেহানে তুই আস্তা আম একখান। হায় হায়—বলতে বলতে বৈতালকে আবার ধমকাতে থাকেন রাজশেখর। যেন গোটা আম—আঁটি পিঠ সমেত খাওয়ার সমস্ত অপরাধ তারই।

প্রসঙ্গ পালটাতে বৈতাল তাড়াতাড়ি বলে, সোহাগ দিদির পোলারা হগগলেই তো দূরে দূরে। মাইয়ার বিয়া হইয়া গেসে। নাতি-নাতিন কেউই থাকে না ঐ বাড়ি। তা হইলে বাকি হইল জামাই, সোহাগ দিদি আর রাজরাজেশ্বরী ঠাইরেন। তা ঠাইরেন, জামাইরে বাদ দিয়া শুধু দিদিরে দিলেই ঠিক আসে।

নিন্দা অইব। সান্যাল গুষ্ঠির নিন্দা—বোঝো না। বারেন্দ্ররা হগগলে হগগলের জ্ঞাতিকুটুম্ব নয়ত আত্মীয়। একখান কথা একবার পড়লে হয়।

শেষ পর্যন্ত বোনের জন্য শাড়ি, বোনের শাশুড়ির জন্য থান বা জামাইয়ের জন্য ধুতি না নিয়েই এসেছেন রাজশেখর। বৈতাল জোর করল মিষ্টি নিতে, তাই নিয়েছেন। নইলে সেটাও ইচ্ছে ছিল না। এই তো সেদিন কড়কড়ে নগদ একশো কুড়ি টাকা দিয়ে তিন কিলো দশেরি আম পাঠালেন। কী চমৎকার আম।

মিষ্টি নিয়া গ্যালে খাইব কেডায়! জামাইয়ের সুগার। হাতে কইর‍্যা নিয়া গেলেই অদিখ্যাতা কইর‍্যা খাইতে কমু। সেও খাইব। ভয়ানক লোভী। কোনো রেস্ট্রিকশন মানতে চায় না। ঠাইরেন তো খাইবেন একখান, দুইখান—সে বুড়ির প্রেশার-সুগার কিসুই নাই। বাকি রইল সোহাগ। সে আর কয়ডা খাইব!

যা খায় খাইব। তবু আপনে নিয়া যান। খালি হাতে নাইয়োরি বাড়ি যাইতে নাই। আপনের বাবা, ঠাকুরদায় কখনই যায় নাই।

আরে তারা আসিল জমিদার। তাগো ধূলিচন্দন এস্টেট, কাছারিঘর, থামঅলা প্রাসাদ আসিল। হ্যারা কি আমার মতো ফুটা পাবলিক?

আরে আপনি হইলেন রাজশাহির ধূলিচন্দন এস্টেটের মাইজা কর্তা। বর্তমানে মুর্শিদাবাদের সান্যালপাড়ার একজন মাইন্যগইন্য মাইনষ।

হঃ থো তো। লোমের মাইন্যগইন্য।

এইডা কী কন মাইজা কর্তা! আপনেরে হগগলে চেনে। সম্মান করে।

তরে কইলাম তো, লোমের মাইন্যগইন্য। লোকে আমারে চেনে পাগল বইল্যা। বিনা কামে রাস্তায় রাস্তায় ঘুইর‍্যা বেড়াই। খাইস্যা দাড়াইয়া, এর ওর লগে প্যাচাল পাড়ি। হেয়ার লাইগ্যা দুই-চাইরজন চিনতে পারে। ভ্যাদরা প্যাচাল পাড়নের মাইনষ আর কোনহানে?

বৈতালের সঙ্গে এসব কথা চলতেই থাকে। চলতে চলতে সময় গড়ায়। তর্ক বাড়ে। শেষ পর্যন্ত গোটা তিরিশ টাকা খসে রাজশেখরের লৌকিকতা বাবদ মিষ্টি কিনে।

এর মধ্যেই কখন যেন চা নিয়ে ঢোকে সোহাগ।

চা খাবি তো!

হ, খামু। মাথা নেড়ে খুব আস্তে বলেন রাজশেখর।

চা খেতে খেতে রাজশেখর দেখলেন রাজরাজেশ্বরী কোথা থেকে যেন একপাক ঘুরে এলেন। এক মুহূর্তও সুস্থির হয়ে বসেন না এই ঠাইরেন। পায়ে সইরষা যারে কয়। সব সময় ঘোরতাসে। এদিকে ওদিক সেদিক।

এই নড়াচড়ার ওপর অছে বলেই বুড়ি এখনও এত টরটারি। শক্তপোক্ত, বয়স বোঝা যায় না চট করে। তার তুলনায় সোহাগ বরং খানিকটা শিথিল। মোটাও হয়ে গেছে। ভারি হলে চলতে ফিরতে সামান্য হলেও জড়তা তো আসেই।

তা মাসিমা হরধাম তো বিক্রি হইয়া গেসে না?

রাজশেখরের এই জিজ্ঞাসায় এতটুকুন চমকালেন না রাজরাজেশ্বরী। তিনি জানেন এক বিষয় থেকে খুব দ্রুত অন্য বিষয়ে ঝাঁপ দিতে পারেন রাজশেখর। তাই তাঁর কথার পিঠেই প্রায় কথা ফেললেন সোহাগের শাশুড়ি—হ্যাঁ, বহু বছর।

কারা কিনল?

কিনসে কালোয়ারে, নয়ত মেড়ো। কিনতে পারে মুসলমানেও।

না, অরা বোধহয় কেনে নাই। হয়তো কোনো মাউড়াই—

তা হবে।

আমাগো—মানে আপনেগো—বাপের বাড়ির মৈত্র হাভেলি কারা কিনল?

কারা আবার? যারা কেনে। সেই ছাতুরাই।

দাম পাইসিলেন?

কে জানে! সেতো বাপ কাকা, দাদা ভাইদের ব্যাপার।

হরিবিষ্ণু মৈত্রমশাইয়ের প্রতিষ্ঠা করা অতগুলা শিবলিঙ্গ আসে?

আমার বেশ মনে পড়ে—রাজশেখর সান্যাল বলতে থাকেন। আর তাঁর বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন দেখতে পান মৈত্র হাভেলির হাতার ভেতর নানারকম ফুলগাছ। বড়, বড় ছায়াল বৃক্ষের ফাঁকে রোদ আর মেঘের চমৎকার ফুলকারি। উঠোনে, পাথরের সিঁড়ির ধাপের একপাশে আলাদা করে রাখা কালো কালো শিবলিঙ্গের গায়ে ভেজান শাদা শাদা আতপ চাল, সবুজ সবুজ বেলপাতা, গঙ্গা জলের ছিটে। বেলপাতায় চক্র আছে কিনা, তা দেখে নিতে হয় পুজোর সাজে দেওয়ার আগে। চক্রআলা বিল্বপত্র লাগে না দেবতার আরাধনায়। দেখে দেখে বাদ দেওয়া। কালো কালো শিবঠাকুরের গায়ে উঠে অক্লেশেই শাদা শাদা ভেজা আতপ চাল ঠোকরায় চড়াই, কখনও কখনও শালিকরা। লাল, কালো পিঁপড়েরাও আসে মুখে করে চাল নিয়ে যেতে।

আনন্দময়ী কালী মূর্তির গায়ে লাল বেনারসি। পাথরের সেই দেবী একেবারেই দিকবসনা নন। দুর্গা পুজোর চারদিন ঘটে আর যন্ত্রে দেবী আরাধনা হত ঐ আনন্দময়ীর সামনেই। তাঁর মন্দিরটি তেমন বড় ছিল না। কিন্তু চোখে পড়ত। আসলে পাথরের বিগ্রহও তো একেবারেই তেমন বড় নয়। রুপোর শিব আর শিবা সমেত বরাভয়দাত্রী হাস্যমুখী দেবী। তাঁর সোনার জিভ, সোনার খড়্গা রয়েছে হাতে। দেখে ভয় নয়, বরং সাহস আসে মনে। শিবরাত্রিতে এ বাড়ির সহস্র মহাদেবদের ঘিরে সে এক বিশাল কাণ্ডমাণ্ড।

কাশীতে দুর্গাপুজোর সময়েই নওরাত্রি বা নবরাত্রিরও তো খুব জোরদার আয়োজন। দশমি, দশেরার দিন রাবণ পোড়ান, রামলীলা—এসবই তো আজ থেকে চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট বছর আগের ঘটনা।

পুজোর সময়টা সত্যিই খুব মনোরম বেনারসে। শীতও পড়ে না। গরমও নেই। বৃষ্টি, মেঘলা, কাদা কেটে গিয়ে সুন্দর রোদ ঝলমলে দিন। তারা বোনা চমৎকার রাত। ভাবনার ঘোর থেকে বেরিয়ে সোহাগের শাশুড়ি মা জানতে চাইলেন—তোমাদেরও বাড়ি ছিল না কাশীতে?

হ। মাথা নাড়লেন রাজশেখর। সেও তো নেহাত কম বড় নয়।

চুপ করে আছেন রাজশেখর। রাজরাজেশ্বরীর কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখতে পাচ্ছেন রামাপুরায় তাঁদের বড়সড় বাড়ি। সারা বছরই সরকার, আমলা, কর্মচারীরা

ঘোরে সেই 'শিবালয়' নামের বড় বাড়িটিতে। পূর্ববাংলার, সঠিকভাবে বললে উত্তরবাংলার রাজশাহি থেকে লটবহর, লোকজন নিয়ে কর্তাদের কাশী আসা প্রায় যেন মঙ্গলগ্রহ অভিযান। এসব কাহিনি রাজশেখর শুনেছেন। পার্টিশনের পরপর অভাবের তাড়নায় কাশীর দুখানা বাড়ির একখানা বিক্রি হয়ে গেল জলের দরে। শিবালয় খানিকটা জবরদখল হয়ে গেল। তারপর সব কেমন হচপচ। কিসের থেকে যে কী হল। তবে বেনারসের বাড়ি আর রইল না। খুব ছোটবেলায় 'শিবালয়'-এ থাকার স্মৃতি তাঁর আবছা আবছা মনে আছে। খানিকটা ছেঁড়া ছেঁড়া, আগোছাল। ওপার থেকে এসে ঠাকুরদা ছিলেনও তো বেশ কিছুদিন কাশীতে।

তোমাদেরই বা বাড়ি বিক্রির টাকা কী হল! বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন রাজরাজেশ্বরী। নাহ, এতটা বলা বোধহয় ঠিক হবে না। শত হলেও কুটুম তো।

'হরধাম'টা বেনারস ক্যানটনমেনটে নামলে কাছে হত, তাই না? নিজেকে নিজে জিগ্যেস করলেন রাজশেখর। তারপর কথাটা জানতে চাইলেন রাজরাজেশ্বরীর কাছে।

কাশী স্টেশনের কাছে হরধাম না! খুব আস্তে আস্তে বললেন রাজরাজেশ্বরী।

এরমধ্যেই সোহাগ কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে। সেদিকে না তাকিয়েই মাথা নাড়লেন রাজশেখর। —বোধহয় না। এটুকু অবশ্য বলা হল না মুখে। বিড়বিড় করে বললেন, কাশী হবে কি, না কি ক্যানটনমেনটে !

আসলে একই শহরে তো তিনটে স্টেশন। বারাণসী, বেনারস, ক্যানটনমেনট আর কাশী। তবে সবই অবশ্য এক এক দিকে। কাশীতে যাওয়া লোকজন সাধারণত বারাণসীতেই নামে।

সোহাগ চুপ করে তার দাদাকে দেখছে। কী রকম অদ্ভুত মানুষ। হঠাৎই বলা নেই, কওয়া নেই, চলে এল। আরে, একটা ফোন করেও তো আসতে পারতিস! যদি না থাকতাম বাড়িতে। ওকে বললে অবশ্য যুক্তি দেখাবে—কেউ না কেউ তো থাকবেই। না থাকলে ফিরে যাব। আগে কি লোকে ফোন করে লোকের বাড়ি আসত! অদ্ভুত যুক্তি।

কী আর এমন বেশি খরচ হত বোনের জন্য একটা শাড়ি কিনে আনলে! পয়সার অভাব তো আমার চিরকালের। কবে আর স্বচ্ছল ছিলাম! আর এ বয়সে যখন স্বচ্ছলতা এল না আর কবে আসবে? আনলেই হত একটা কাপড়। সামনে পুজোর দিন। কে জানে সামনের বার পুজোয় দেখা হবে কিনা সকলের সঙ্গে। তাছাড়া কে থাকি, কে না থাকি! সবারই তো বয়স হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে লম্বা শ্বাস চাপলেন রাজশেখর।

সোহাগ ততক্ষণে তাড়া দিতে শুরু করেছে। স্নান করে নাও। ভাত খাবে কখন! কত বেলা হয়ে গেল।

আট

পুট, পুট, পুট—যা যা—ছয়। যাঃ, হল না। এবারও হল না। বলেই লাড্ডু চাঁদ ডোবা রাতে গড়িয়ে যাওয়া লুডোর ছক্কার দিকে তাকিয়ে রইল। রাত বেড়ে গেলে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ঢেলে দেওয়া ছক্কার পাশাপাশি তার চৌকো ছায়াও ছুটতে থাকে। সেই ছুটন্ত ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকলে আষাঢ় মাসের মেঘহীন ঘাটশিলার আকাশ, অনেকটা দূরে সুবর্ণরেখা নদী, হিন্দুস্থান কপারের আলো—সব কেমন ছায়া ছায়া, ভৌতিক। আর দাহিগোড়ায়, অপুর পথের পাশে এই যে বড়সড় ময়দান, যেখানে 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর তাঁবু পড়েছে, তার গায়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে চাঁদের আলো। এই যে পড়ে ছরকুটে, ছড়িয়ে একদম যাকে বলে ছত্রখান হয়ে যাওয়া জ্যোৎস্না, তার মধ্যে এসে দাঁড়ালে বড় স্পষ্ট আর কালো হয়ে নজরে পড়ে নিজের ছায়াটি। সেই গভীর, কালো, স্পষ্ট ছায়াছাপের দিকে হঠাৎ তাকালে বুকের মধ্যে এক টাকা দামের 'পেপসি' আইসক্রিম কেউ যেন গড়িয়ে দেয়। আর সেই গড়াতে গড়াতে নামা ঠাণ্ডা মনে করিয়ে দিতে পারে এই যে আশ্চর্য ছায়া, তার দুধারে দুটি ডানা যে কোনো সময়ে উঠবে জেগে।

এই ভূত ভূত জ্যোৎস্নার ভেতর লুডো পেতে খেলে চারজন। তাদের বেঁটে বেঁটে ছায়ারা তাদের পাশেই ঘুমিয়ে থাকে। একদম চুপচাপ স্থির।

ছয়, ছয়, ছয়—পোয়া। পড় পড়, পুট পড়। এবার পুট পড়বে—বলতে বলতে নিজের বাঁ হাতে ঢাকনা ছাড়া নস্যি ডিবে চেহারার ছক্কা নাড়ার কৌটো নাড়তে নাড়তে টুপির মনে হল এবার পুট না পড়লে ঘুঁটি বেরবে না।

খুবই ছোটখাট্ট চেহারা। হাত-পা আরও বেঁটে বেঁটে। দু হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল অসম্ভব ক্ষুদে ক্ষুদে। তার মধ্যে বুড়ো আঙুল দুটি বেশ ক্ষুদি, তার মাথাটা থ্যাবড়া।

টুপি প্রাণপণে বাঁ হাত দিয়ে লুডোর ছক্কা ফেলার কৌটো নাড়ায়।—দেখিস, বোডের বাইরে যেন না পড়ে, এটুকু মুখে বলে সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে গুণ্ডি দিতে থাকে লাড্ডু। গুণ্ডি দিলে নির্ঘাৎ পুট পড়বে না। এ এক আশ্চর্য তুক। মনে মনে আউড়ে যায় লাড্ডু—

গুণ্ডির মা গুণ্ডি
তাল তলায় পিণ্ডি

এই ভাবে একবার নয়, পর পর তিনবার। নিজের মনে মনে বলে যাওয়া। অবশ্য নিয়ম মতো ভালো করে গুণ্ডি দিতে গেলে ডান হাতের আঙুল নেড়ে নেড়ে, গোল করে ঘোরাতে হয় যাকে গুণ্ডি দেওয়া হচ্ছে। তা আর এখানে হল কই!

গুণ্ডির মা গুণ্ডি/তাল তলায় পিণ্ডি... মনে মনে আবারও বলল লাড্ডু।

কে জানে কেন, এবারও পুট পড়ল না টুপির। তারপরের দান কাতু-র। খুব জোরে হাতের ডিবে নাড়িয়ে নাড়িয়ে ফেলল কাতু। এবারও হল না। পাঁচ, পাঁচ পড়েছে। যাঃ! নিজের ভেতরে এটুকু বলে কাতু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—থুক্কি-থুড়ি। আব্‌বুলিশ।

কেন থুক্কি কেন! একটু যেন তেরিয়া গলাতেই বলল টুপি।

থুক্কি নয়ত কি! বোডের বাইরে গড়িয়ে বেরিয়ে গেছে ছক্কা। তাই দান লস। আবার চান্স দিতে হবে।

না, না—তা হবে না। আবার দান! মামদোবাজি নাকি!

কেন হবে না! ছক্কা বাইরে বেরিয়ে গেলে আবার চানস পাওয়া যাবে।

ও-ও-ও—মামাবাড়ির আবদার! চলবে না। নতুন করে দান হবে না। লাড্ডু তুই চাল। তারপর কুতু।

একটু পুরনো হয়ে যাওয়া লুডোর ছক মাটিতে চিৎপাত শুয়ে। রাত এখন কত কে জানে! শুধু আকাশে দিব্যি থানা গেড়ে বসে থাকা চাঁদ ফিক ফিক করে মাঝে মাঝেই হেসে উঠছে ওদের কথা শুনে! তার আলো কখনও পড়ছে হাঁ করা সব ভীষণ ভীষণ সাপের মুখে। তাদের হিলহিলে ল্যাজে। আবার সেই একই চন্দ্রবাহার মইয়ের আগা-মাথা, গোড়ায়, গায়ে একই ভাবে লেপটে যাচ্ছে।

চার বামনের সে সব দিকে তেমন কোনো খেয়াল নেই। তারা নিজেদের ভেতর সাপলুডো খেলায় কার পুট পড়ল কি পড়ল না—তা নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ত।

তাহলে আমি কি করব! হালছাড়া গলায় জানতে চাইত কাতু।

কি আবার করবি! তোর দান শেষ। এবার লাড্ডুকে দে।

এটা কিন্তু চোট্টামি হলো। তোরা খুব চোট্টামি করিস। বেশ আস্তে আস্তে বলল কাতু। তার কথার খানিকটা খানিকটা ভাঙা গুঁড়ো পৌঁছে গেল টুপির কানে। লাড্ডুরও। কুতু অবশ্য শুনতে পেয়েও কিছু বলল না। যমজ ভাইকে কি আর বলা যায়!

কি বললি, হারামি! চোট্টা আমি। চোট্টা আমরা! চোট্টা তোর বাবা। চোট্টা তোর মা, তোর দাদু।

কি বাপ তুললি আমার! মা তুললি! তোর দাদু চোট্টা। সাত গুষ্টি চোট্টা।

না, বাপ তুলবে না! উনি চোট্টামি করবেন, আর ওনাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করবে! বেশ করেছি বাপ তুলেছি। তুই চোট্টা, তোর বাপ চোট্টা, মা চোট্টা, তোর সাত গুষ্টি, চোদ্দ গুষ্টি চোট্টা। তেঁতুলে গুষ্টি চোট্টা।

টুপি, এটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না।

কি ভালো হচ্ছে না? কি করবি তুই।

এভাবে বাপ তুলে গালাগালি দেওয়া ঠিক নয়।

এর মধ্যে আবার ঠিক বেঠিকের কি হল? তুই কি ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করছিলি? তুই গাল দিস নি!

তখন হাসতে হাসতে টুপি হঠাৎ বলে উঠল—

বাপ তুললি বেশ করলি
আমার নাম জগা
সাত কলসি মুতে দেব
খাবে তোর বাবা!

এটা তুই কাকে বললি টুপি?

ধরে নে যাকে হোক।

ধরে নে যাকে হোক মানে, তোকে বলতে হবে তুই কাকে বললি এটা।

হ্যাঁ বলতেই হবে তোকে। কাকে বললি একথা? লাড্ডুর সঙ্গে গলা মেলাল কাতু।

ও শালা, খুব যে দরদ দেখছি এখন। শুনে শুনে কথা কয়/গুয়ের পোকা বেছে খায়।

তুই সবাইকে যা-তা বলছিস টুপি। এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না একেবারে। বড্ড তেল হয়েছে তোর। তেল ভাঙব তোর এবার। বেশি চর্বি হয়েছে—

তখনই খুব জোরে বাতকম্ম করল টুপি। একবার, দুবার। পরপর। প্রথমটি বেশ জোরে। তারপর একটু আস্তে।

নাকে হাত চাপা দিল সঙ্গে সঙ্গে তিন বামন। লাড্ডু, কাতু, কুতু।

ডান হাতের দু আঙুলে জোরে নাক টিপে ধরে খোনা গলায় বলে উঠল লাড্ডু—ও মারে, কি গ্যাস রে বাবা। শালা, পচা গরু খেয়েছে। পচা গরু।

ধুর, পচা মোষ। পচা মোষ খেয়ে ঢোস ঢোস করে ঝাড়ছে। উফ, কি গন্ধ রে বাবা।

দাঁত বার করে সামান্য শব্দ ছড়িয়ে হাসল টুপি, তারপর বলল, আয় না ঐটা করি—উবু দশের মতো

আদলি পাদলি টাঁই টুঁই
নিলে কট কট পদলি তুই
যে আগে কথা বলে
সে আগে পেদে থাকে....

ভ্যাট—এইসব আদলি-পাদলি টাঁই টুঁই—ছোটবেলার মতো—

কুঁই পেদেছিস, তুই পেদেছিস, কুঁই পেদেছিস গো—বলে আনন্দে হাততালি দিতে দিতে দাঁড়িয়ে ওঠে টুপি। তারপর হালকা হালকা নাচের ভঙ্গিতে বলে—কেমন ধরে ফেললাম। আর দুলুনি, ধীরে ধীরে পা নাচিয়ে নাচের সঙ্গে সঙ্গে তার গভীর কালো ছায়াটিও নড়ে চড়ে থাকতে থাকে।

নাক থেকে আঙুল নামিয়ে এবার লাড্ডু বলে, তুই এই ছড়াটা জানিস টুপি?

কোন ছড়া?

পাদে ন ভর্গ রাজা
তস্য মন্ত্রী টুনটুনি
ঠুস পাদে মলয় গন্ধ
ব্যোমপাদ তথৈবচ
মধ্যাহ্ন পাদে গন্ধ নাদে
নিঃশব্দ প্রাণঘাতিকা।

বাঃ! দারুণ তো। বেশ বলেছিস। কিন্তু খুব শক্ত শক্ত কথা, বানান। ও সব মনে রাখা যায় না। বড্ড খটোমটো রে লাড্ডু। তার চেয়ে বরং অনেক ছোট বেলায় মায়ের কাছে একটা কথা শুনেছিলাম, সেটা কিন্তু মন্দ নয়।

কি, কি কথা?

সেটা হলো—পাদ নেই যার/পোড়া কপাল তার।

টুপির এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবাই কেমন হেসে ওঠে হা হা হো হো হি হি করে। তাদের হাসির শব্দে আকাশে হঠাৎ হঠাৎ জমে ওঠা মেঘের গায়েও বুঝি ফাটল ধরে যায়। আর সেই ফাঁক ফোকর দিয়ে চাঁদের আলো অনেক অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর গায়ে। মুখে।

নে, নে, অনেক হল চাল এবার। এটুকু বলে সাপলুডো খেলার মধ্যে ফিরে আসতে চাইল টুপি। যতক্ষণ খেলায় ঢুকে ডুবে থাকা যায়, ততক্ষণই মজা। নইলে সেই তো রোজ একই জিনিস। স্টেজে উঠে শো-এর সময় পাবলিক হাসান। যে ভাবে হোক হাসাতে হবে টিকিট কেটে তামাশা দেখতে আসা লোকজনকে। লাড্ডু, টুপি, কাতু, কুতু—'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর চার জন জোকার এই আষাঢ় মাসের মেঘ ভাঙা চাঁদের আলোয় নিজেদের ভেতর সাপলুডো খেলতে খেলতে এইসব খুচরো ঝগড়া, তর্কাতর্কি, মান অভিমানে জড়িয়ে যায় প্রায়ই।

তাহলে এবার কে চালবে? জানতে চাইল কাতু।

কেন, কুতুকে দিবি। এবার কুতুর চাল।

বলেই একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেল টুপি। আর কাতু তাড়াতাড়ি ছক্কা চালার কালো প্লাস্টিকের ডিবেটা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে নিজের মনে বিড় বিড় করতে লাগল— পো-পো—পুট—পুট—এই পুট পড়ছে এবার। বলে চাল দিতে চাইল কাতু। মনে মনে আবারও গুণ্ডি দিল লাড্ডু। গুণ্ডির মা গুণ্ডি....। তার দান ছিল এবার কিন্তু ইচ্ছে করে নিল না লাড্ডু। ব্যাপারটা যখন জড়িয়ে গেছে যাক। যখন কারও পুট পড়ছে না।

সাবধানে লুডোর কোটে ছক্কা নামাল কুতু। যাতে না গড়িয়ে চলে যেতে পারে বোর্ডের বাইরে।

ছোট্ট করে হাই উঠল লাড্ডুর। খুব চেষ্টা করল সেই হাই চেপে রাখতে। কিন্তু হল কই। পারা গেল না কিছুতেই। রাত বাড়লে ঘুম আসে। তার আগে ঢুলুনি। সেই ঢুল ঢুলুনি চলে যায় লুডোর উত্তেজনায়। এমনি যে চার রঙের ঘুঁটি সাজিয়ে দুজন-তিনজনে বা চারজনের লুডো খেলা, তাতে সময় বেশি লাগে। আর তেমন ঢিব ঢিবানিও নেই। চার চারটে ঘুঁটি বেরবে। কাটবে। আবার ছয় ছক্কা পড়লে বেরবে, সে বেশ এলাহি ব্যাপার। এই তো সেদিন খেলতে গিয়ে নিজের লাল জোড়া ঘুঁটি দিয়ে সবুজ ঘুঁটির টুপিকে আটকাতে গিয়ে বেশ বিপদেই তো পড়া গেল। জোড়া জোড়া করে এগোতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত টুপির হাতেই কচুকাটা। প্রায় পাকা ঘুঁটি। শেষ পর্যন্ত ঐ ঘুঁটিই ঘর পচা।

এক এক দিন হাত খুলে যায়। তখন যা চাই, তাই পড়ে। যখন যেমন বলছি, সেটাই গড়িয়ে নামছে ডিবে থেকে। ছক্কা তো ছক্কা, দুই তো দুই, তিন তো তিন, পুট তো পুট। এক এক সময় এরকমই হয়। আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে চুমু খেয়ে গড়িয়ে দিয়ে ছয় ছক্কা। ব্যস—

সেদিন লাড্ডুও খচড়ামি কিছু কম করেনি। নিজের পাকা ঘুঁটি দু-দুবার কাঁচিয়ে এনে কেটে কুটে একদম ফিনিশ করে দিল আমায়। বলার কিছু নেই। ওর পাকা ঘুঁটি ও কাঁচিয়ে এসে কাটতেই পারে। কিন্তু আমি যে হেরে গেলাম। ভাবলেই কেমন যেন কান্না কান্না পায় টুপির। লুডোর ছক চার চারটে ঘর আর তাদের রঙ নিয়ে সামনে দিয়ে একবার যায় আর একবার আসে। আবার যায়, ফিরে আসে। যেন কোনো নরম উড়ন্ত গামছা। লুডোর ছককে আর আদৌ ছক মনে হয় না তখন। সেটা তো উড়তেই থাকে। সাপলুডোর সাপেরা দিব্যি কিলবিলে হয়ে গিয়ে শুরু করে দেয় নড়াচড়া। একটা দুটো তিনটে মই এক সঙ্গে চলাফেরা করতে থাকে। তারা কখন কোন দেওয়াল মাচা অথবা ঘরের ছাদ পাবে, তা দিয়ে শুরু করে দেয় নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ। গায়ে অনেকগুলো কালচে ফুটকি নিয়ে শাদা চৌকো ছক্কা গড়াগড়ি খেতে থাকে। হাসে। গড়িয়ে গড়িয়ে বার বার বলে, আমি গড়া, তুই গড়ি। দুইয়ে মিলে গড়াগড়ি। গড়াগড়ি।

নিজের পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে এসে তাকে দু-দুবার কাটার পর কথা বন্ধ করে দিয়েছিল লাড্ডুর সঙ্গে টুপি। খালি ঐ শো-এর সময় যতটুকু না বললে নয়, ততটুকুই। তারপর আবার যে কে সেই। লাড্ডুই বরং সেধে সেধে কথা কয়েছে। একদম পাক্কা সেদো।

এরকম সেদোপনা করলে কতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়! কোনো না কোনো সময় তো দিতেই হয় জবাব। ব্যস, আড়ি ভেঙে গেল। তাই দেখে লাড্ডুটার কি হাসি।

'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর মালিক এস. আয়েঙ্গার এই কথা বন্ধ করার কেসটা তেমন করে টের পায়নি। হলে মজা বুঝিয়ে দিত। মারধোর, পানিশমেন্ট। খাওয়া বন্ধ। কি না হতে পারত! কিন্তু তাকে আর জানায় কে।

পুট পুট, পুট পড়েছে। হই হই করে চেঁচিয়ে উঠল কুঁতু। আষাঢ় মাসের অনেকটা রাত পার করা আকাশের তলায় পাতা লুডোর বোর্ডের ওপর জ্যোৎস্নার ঝিরিঝিরি। চাঁদ চাঁদ আলোয় কুতুর চালা ছক্কা দিব্যি যেন মাদারি কা খেল দেখান ম্যাজিকওলার হাতের পুরনো খুলি। লুডোর কোট একটা ভাঙা বাড়ির উঠোন হয়ে পড়ে আছে। তার মধ্যেই ফাটা ফাটা গলায় চেঁচিয়ে উঠছে কাতু, পড়েছে। ছয় পড়েছে।

কই, কই, দেখি—বলে সবাই ঝুঁকে পড়ল মাটির দিকে। আর তখনই খাঁচার ভেতর কি কারণে, হয়ত অকারণেই যেন ডেকে উঠল বাঘ—হা-উ-উ-ম, হা-উ-উ-ম। বেশ গম্ভীর, রক্ত জল করা আওয়াজ। পাশে লেপার্ডের খঁচায় সঙ্গে সঙ্গে তড়বড় করে পায়চারি শুরু করে দিল জোড়া লেপার্ড।

হা-আ-আ-উ-উ-ম—অনেকটা দীর্ঘ হল বাঘের ডাক। সেই জমাট, ভরাট কণ্ঠ ফাঁকা মাঠের ওপর থেকে ভাসতে ভাসতে উঠে এসে হাওয়ায় ভর করে ছড়িয়ে গেল যেন আরও দূরে কোথাও।

নিজের ছেলেকে কোলে নিয়ে জ্যোৎস্নায় গভীর কালো ছায়াছাপ আঁকতে আঁকতে বাঘের খাঁচার সামনে এসে দাঁড়াল আরতি। আট-ন বছরের ছেলে। কিন্তু ভালো করে হাঁটতে পারে না। পায়ে জোর নেই। সব সময় নাল ভাঙে মুখ থেকে।

ছেলে প্রায় রাতেই ঘুম ভেঙে গেলে বাঘ দেখার বায়না করে। আয়েঙ্গার তখন ঘুমে অচেতন। কিংবা যদি ঘুমিয়ে নাও থাকে আরতিকেই ধাড়ি ছেলেকে ঘাড়ে নিয়ে আসতে হয় বাঘ আর লেপার্ডের খাঁচার সামনে। বুড়ো মতো একটা সিংহও আছে এস. আয়েঙ্গারের 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর সঙ্গে। সেটা বসে বসে ঝিমোয় খালি। বয়েস হয়ে গেলে যা হয় আর কি! কেবল মাঝে মাঝে আয়েঙ্গারের ব্যাটারির চাবুক তাকে সজাগ আর সতর্ক করে দেয় খেলা দেখানর জন্য। সিকান্দার তখন বাধ্য হয় খেলা দেখাতে উঁচু টেবিলে উঠে বসতে। হাঁ করে রিং মাস্টার বলা মাত্র মুখের মধ্যে জেগে ওঠে হলুদ হলুদ দাঁত। হালকা সবুজ জিভ। মুখের কাছে যাওয়া যায় না—এতই ইঁদুর পচা দুর্গন্ধ সেখানে। ভারতমাতা সাজা আরতিকে মাঝে মাঝেই ভয়, কি এক আচমকা অজানা আতঙ্ক ক্রমাগত ঠেলা মারতে থাকে। বলা তো যায় না। কিসের থেকে কি হয়। যদি হঠাৎই মেজাজ চড়ে যায় সিকান্দারের। বহু দিনই খাঁচায় একা একা থাকে এক গলা কেশরঅলা পশুরাজ। সিংহিটা মরেছে পাঁচ-সাত বছর আগে। নতুন করে আর সিংহিনী কেনা হয়নি। একে তো টাকা নেই, কে দেবে টাকা? তার ওপর বুনো জানোয়ার কেনা-বেচার আইনি মারপ্যাঁচ ক্রমশ বাড়ছে। আয়েঙ্গার তো বলে, এবার একটু একটু করে বন্ধ করে দেব সার্কাস। জীব-জন্তু পাখি-ই যদি না রাখা যায়, তাহলে শুধু জোকার, ট্রপিজ আর মরণঝাঁপ দিয়ে কি এতবড় সার্কাস পার্টি টেকান যাবে? সিকান্দারকে বাদ দিয়ে জমবে কি আদৌ বিশ্বশান্তির জন্য ভারতমাতা সাজা আরতির খেলা? কে দেখবে? সিকান্দারের পিঠে পা দিয়েই তো প্রতি শোয়ে দাঁড়ায় আরতি।

ও-বা ওবা আ বা-আ-বা। মুখ দিয়ে কি এক অদ্ভুত শব্দ করছে ছেলে। আরতি জানে এই যে আওয়াজ, তা খুশি হওয়ার জন্য।

চাঁদের আলোয় বাঘের খাঁচার ছায়াটি বড় নির্জন। পাশে জোড়া লেপার্ডের কেজ। তার ভেতর হাঁটা হাঁটি করা লেপার্ডরা। অন্ধকারে তাদের চোখ কাচের সবুজ সবুজ গুলি হয়ে জ্বলে ঝক ঝক করে।

হা-আ-আ-উ-উ-ম—ডেকে ওঠে বাঘ।

আরতির কোলে রাখা ডাব্বু আ-বা, ও বা-আ-বা-আ-বা বলে জ্যোৎস্না ছোঁয়া বাঘ দেখে মহা আনন্দ পায়। ডাব্বু—ছেলেটা যে এমন হবে কে জানত? হওয়ার পর অনেকে বলেছে, বেশি বয়সের পুরুষমানুষকে বিয়ে করলে এমনটিই হবে।

ন্যালব্যাল করতে করতে ডাব্বু উঠতে চাইল নিজের পায়ে ভর দিয়ে। তারপর যেমন লতা জড়িয়ে ধরতে চায় শক্ত গাছকে আকর্ষ বাড়িয়ে, সেভাবেই নিজের অপুষ্ট হাত বাড়িয়ে ধরে নিল আরতির গলা।

আ-আ-বা-আ-বা—

হ্যাঁ বাবা। বাঘ। বেশ তো, দেখা হল। চল, এবার শুয়ে পড়ি। রাত অনেক হয়েছে। কাল খেলা আছে বাবা।

ডাব্বু রাতে বিছানা ভেজালে ঘুম ভাঙে আরতির। প্রথমে গরম গরম। মন্দ লাগে না। তারপর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। বিচ্ছিরি। কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে মতো। এখনও তোশকের নিচে নিয়মিত বড় প্লাস্টিক পাতে আরতি। যাতে না পেচ্ছাপে ভিজে যায় তোশক। রোদে বালিশ, তোশক দেওয়া বড্ড ঝামেলার।

বুড়ো ছেলের মুতের গন্ধ আর সহ্য হয় না। মনে মনে গজ গজ করে আরতি। পেচ্ছাপের শুকনো মতো দুর্গন্ধে রীতিমতো গা গুলিয়ে ওঠে। পুরনো বাতিল খবরের কাগজ চেপে চেপে রাতের মতো বিছানার ভিজে ভিজে ভাবটা কাটাতে হয়।

লেপার্ড আর বাঘের খাঁচার সামনে চিড়িয়াখানার গন্ধ। সেই বোটকা মতো দুর্গন্ধ নাকে গেলে এখন আর গা গুলোয় না আরতির। অভ্যাস হয়ে গেছে রীতিমতো। আর না হয়েই বা উপায় কী! খেলা দেখাতে হয় না ওদের নিয়ে, ওদের মধ্যেই থাকতে হয়। না থেকেই বা উপায় কি?

ডাব্বু সামনে আ-আ-বা-আ-বা বলে কি যেন একটা চেষ্টা করতে থাকে বলার। আরতি বুঝতে পারে তার খোকাটি খুশি হয়েছে বাঘ আর লেপার্ড দেখে। দূরে একলা থাকা সিকান্দার ঘাপটি মেরে আছে। আরতি জানে তার খাঁচার কাছাকাছি যেতে না যেতেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে বনের রাজা। যেমন ভাবা, সেভাবেই এক দু পা জ্যোৎস্না ভেঙে এগোতে না এগোতেই খাড়া হয়ে উঠে পড়ল অনেক দিন আগের গির অরণ্যের বাসিন্দা।

চার বামন—টুপি, লাড্ডু, কাতু আর কুতু তারা এতক্ষণ ছক্কা, পুট, পাঞ্জা, দুই কিংবা তিগগি—এসব একেবারেই না বলে নিজেদের খেলা থামিয়ে চুপচাপ দেখে

যাচ্ছে তাদের মালকিনকে। 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর প্রোপাইটার কাম মেইন রিং মাস্টার এস. আয়েঙ্গারের খেলা দেখান সেকসি রউ হাবা ছেলে কোলে নিয়ে বাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে আর কিছু করা যায় না কি! লাড্ডুর হাইফাই ওঠা কোথায় পালিয়েছে। সারা শরীর টান টান। যেন এখনই শুরু হবে শো!

ভিততর হয়ে গেল মাইরি আমাদের লুডো খেলা। ফিস ফিস করে বলল কুতু।

হ্যাঁ, মায়ের ভোগে। তার থেকেও চাপা গলায় বলল কাতু।

শালা, ছয়টা পড়ল সবে আর তখনই—এটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ভেতরে যেন হায় হায় করে উঠল কুতু।

বলত মা ছেলেতে কেন এখানে এখন?

ওতে কি হল! সাপলুডোয় পুট না পড়লে, ছাড় ওসব। এখন বল তো মা ছেলেতে কেন এখানে!

এত রাতে বাঘ দেখার শখ। তাও বুঝলি না। ওসব ওদের হয়। লাড্ডুর কথার জবাব এভাবেই দিল টুপি। এমন ভাবে বলল, যাতে আর কেউ কিছু চট করে শুনতে না পায়।

আকাশে চাঁদ একটু একটু করে পেকে উঠছে। তার আলো সার্কাসের চারপাশে, মাথায় টাঙানো শামিয়ানার ছাঁকনির ভেতর দিয়ে টুপটুপিয়ে পৌঁছে যাবে ন্যাড়ামুড়ো মাটির উঠোনে। মাঠের ঘাস মুড়িয়ে কেটে পরিষ্কার করে দুরমুশ দিয়ে সামান্য পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরি হয়েছে এই উঠোন। খানিকটা দূরে পায়ে মোটা মোটা লোহার শেকল বাঁধা সুন্দরী, কামিনী। আরও খানিক দূরে পার্বতী আর বাদশা।

ল্যাজ নেড়ে নেড়ে, কখনও কখনও গা, পায়ের চামড়া নাচিয়ে নাচিয়ে ডাঁশ, মশা পোকা তাড়ায় হাতিরা। কিন্তু ডাঁশ, মশারা শুনলে তো! মহা আনন্দে রক্ত খায় তারা। হুল ফোঁটায়। বেশি নাড়ানাড়ি হলে তখন তারা উড়ে বা নিজেরা নড়ে একটু দূরে গিয়ে বসে।

আর হবে না লুডো। শুয়ে পড়তে হবে। নইলে তাড়া দেবে আরতি। মালকিনের কথা ফেলা যায় না। তার ওপর এই যে সার্কাসের মালিক, এত অসম্ভব রাগী যে কিছু বলার নয়। গাঁক গাঁক করে চেঁচাবে তো বটেই। খুব পিটবে তারপর। এতেও সাজা শেষ হয় না। এর পরে একটা খালি খাঁচার ভেতর ঢুকিয়ে তালা এঁটে দেবে। তখন নো ফুড, নো ওয়াটার। চ্যাঁচামেচি করলে আরও বিপদ। দ্বিগুণ ঝাড় পড়বে তখন। তাই মানে মানে কেটে পড়া ভালো, কিছু বলার আগে, এটুকু মনে ভেবে নিয়ে টুপি বলল, চল শুতে যাই আমরা।

এখনই শুবি! আর এক হাত হলে হত না! মিন মিন করে বলল কুতু।

এক হাত হবে মানে! হাত আবার শেষ হয়েছে নাকি! লুডো খেলা হল কোথায়? দানই বা পুরো করতে পারলাম কই! সবে তো পুট পড়েছে, পুট পড়েছে বলে চিৎকার করে উঠল কুতু।

এমনি এমনি চ্যাঁচালাম শুধু শুধু! সত্যি সত্যি তো পোয়া পড়ল গড়িয়ে গড়িয়ে।

সেসব আর হবে টবে না। যা হওয়ার হয়ে গেছে। আবার নতুন করে কোট পাততে গেলে ঘুঁটি সাজাতে হবে নতুন করে।

তা কেন হবে? টুপির কথায় মিনমিনে থেকে আর একটু গলা তুলে বলল কুতু।

আগের খেলা মায়ের ভোগে। ভণ্ডুল হয়ে গেছে সব। স্নাপলুডো খেলতে হলে নতুন করে খেলা চালু করতে হবে।

আ-আ-আ-বা-আ—ডাব্বু নিজের মনে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠছে। তার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে খাঁচায় পোরা 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর বাঘ—সাহেব—হা-উ-উ-ম। হা-উ-উ-ম।

একবার, দুবার, তিনবার। বাঘ ডাকছে।

খাঁচার মধ্যে মাঝ রাতের হাঁটাহাঁটি সেরে নিচ্ছে জোড়া লেপার্ড। তাদের টলগুলি টলগুলি সবুজ সবুজ চোখ ঝকঝক করছে অন্ধকারে। সিকান্দার লোহার গরাদের ঘেরাটোপে দাঁড়িয়ে চুপচাপ। তার চোখেও সবুজ আগুন।

আকাশের চাঁদ আপন খেয়ালে আলোর ঝরনা পাঠিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর গায়ে মুখে। সেই আলোয় মাখা-মাখি হয়ে আছে সুবর্ণরেখা নদী। তার গায়ে, বুকে জমে থাকা শাদা বালি আর কালচে পাথরে। নদীর জল চাঁদ বহে যাওয়া স্রোতে সেই কালচেটুকু কখনও কখনও মুছে গিয়েই জেগে ওঠে।

ও-বা-আ-বা-আ-বা—এরকম শব্দ বলতে বলতে মুখের কষের দুপাশ দিয়ে সরু হয়ে নাল গড়ায়। একটু যেন ভারি মতো। ঘন। কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না ছেলেটাকে নিয়ে। ডাক্তার, বদ্যি, হেকিম, ঠাকুর-দেবতার মালা, ফুল—কিছুই বাদ রাখা হয়নি। ফুঁকফাঁক, দৈব তাবিজ-কবচ, জলপড়া, তেলপড়া, মাটি-মাখান কোনোটাই বাদ নেই। কত পির, ফকির, সাধু সন্ন্যাসী ধরা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল কি! সবাই তো কেমন বাঁধাগত বলে যায় নিজের নিজের লাইনে—জন্মের দোষ। জিনের গোলমাল আছে। পাপ, পাপ মা পাপ। প্রারব্ধ। তোমাদেরও, ওরও। গত জন্মের পাপে এমনটি হয়েছে। শুক্রবার কালো গরুকে রুটি, গুড়, ছোলা—এই সব খাওয়াতে হবে।

আরও অনেক রকম বুদ্ধি-পরামর্শ রয়েছে।

মস্তান বাবার মাজারে একশোটা মোমবাতি আর পঞ্চাশটা আগরবাত্তি জ্বালতে হবে প্রতি বিষ্যুদবার নিয়ম করে।

কালী মন্দিরে প্রত্যেক শনি আর মঙ্গলবার পাঁচটা লাল জবা ফুল দিয়ে পুজো দিয়ে আসতে হবে। সঙ্গে জ্বালাতে হবে পাঁচটা করে প্রদীপ।

কাককে প্রতিদিন সকালে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াতে হবে।

পায়রাদের দানা খাওয়ান দরকার।

কালো কুকুরকে প্রতি শনিবার কিছু না কিছু খেতে দিতে হবে।

কিন্তু এসব কত কত দিন ধরে করবে আরতি! করতে করতে সে তো রীতিমতো যাকে বলে থকে গেছে। মন খারাপ থাকে প্রায় সব সময়। কান্না পায়। নিজের একমাত্র সন্তান এরকম হয়ে গেলে কেমন করে সুস্থ থাকা যায়? বা কি আদৌ থাকা সম্ভব?

আয়েঙ্গার ডাব্বুকে তার কোলে বসিয়ে একটা নতুন খেলা ছকেছিল। পাবলিক নিয়েছিলও বেশ সেই শো। আরতি গণেশ জননী। কোলে ডাব্বু, গণেশ। দুপাশে সার্কাস কোম্পানির দুই হাতি—কামিনী আর সুন্দরীকে হাঁটু মুড়ে বসিয়ে দিত আয়েঙ্গার। দারুণ কমপোজিশান। খুব হাততালি দিত পাবলিক। কিন্তু ডাব্বু যত বড় হয়ে উঠতে লাগল, ততই তার মাথায় চাপতে লাগল নানা বাই। মুখ দিয়ে নাল ভাঙার পরিমাণ গেল বেড়ে। তখন তো বলতে গেলে সবসময়ই নাল পড়ে। আর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে অবোধ্য, অস্ফুট শব্দ।

ছোটবেলায় তবু ওকে ম্যানেজ করা যেত। এখন আর প্রায় পারা যায় না। অসম্ভব রাগ আর জেদ, তার ওপর যাকে বলে রীতিমতো মতলবি। যখন যেটা ব্যাগ ধরবে, সেটা তখনই চাই। বায়নাক্কা পূরণ করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। নইলে বাবু সবই লণ্ডভণ্ড করে ছাড়বেন। তখন যত দায় আরতির।

আয়েঙ্গার কেমন যেন নির্বিকার এসব ব্যাপারে। আগে অতটা নির্লিপ্ত ছিল না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন বেড়ে গেছে এই ভাবটা। সার্কাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে—যদি বাঘ, সিংহ, হাতি, ভাল্লুক, লেপার্ডের খেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়, এমন একটা দুশ্চিন্তা ভর করেছে আয়েঙ্গারকে। কেমন যেন গুম মেরে বসে থাকে মানুষটা। তার এই গুমসুম ভাব দেখে ভয়ও লাগে। চিন্তাও হয়। সত্যিই তো কি হবে জানোয়ারদের খেলা, পাখির কেরদানি দেখান বন্ধ করে দিলে? শুধু ট্রাপিজ, অসম্ভব জোরে মোটর সাইকেল, গ্লোবের ভেতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে আটকান যাবে দর্শক? আর এই এতদিন খাঁচায় থাকা, পালপোষ হওয়া বাঘ, সিংহ, হাতিরা যাবে কোথায়? কোন জঙ্গল তাদের মেনে নেবে? এরা তো না খেয়ে মরবে। শিকার ধরতে পারবে না। জঙ্গলে ফাঁকা জায়গায় থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে, গরম লাগবে। অসুখ হবে। বে-মওত মারা যাবে সবাই। কাদের মাথায় যে এসব বুদ্ধি ঢোকে? এরা একটা দিক ভাবে। অন্য দিকটা কোনো ভাবেই ভাবে না। ভাবতে চায়ও না। কি হবে ওদের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এলে! স্রেফ না খেয়ে মারা যাবে। আরও খারাপ অবস্থা হবে বুড়ো আধবুড়ো জানোয়ারদের। এসব কথা মাঝে মাঝেই মনের ভেতর জংধরা ছুঁচ হয়ে বিঁধতে থাকে আরতির।

আগে আয়েঙ্গার তবু বেশ কথা বলত। এখন—কয়েক বছর হল কেমন যেন চুপচাপ মেরে গেছে। আর কথায় কথায় রাগ। একটুতেই রেগে ওঠে চট করে। তারপর সেই রাগ আর যেন কমতে চায় না কিছুতেই। সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিলে বুঝি কমবে সেই মাথা গরম ভাব। যত রাগ বাড়ছে তার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

বাড়ছে মদ। আগে তবু মাপজোক থাকত। এখন কোনো মাপজোকের বালাই পর্যন্ত নেই। শো শেষে বোতল গেলাস জল সাজিয়ে বসে। যতক্ষণ না খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে যায়, ততক্ষণ চলতেই থাকে। চলতেই থাকে। এসব দেখে টেখে মাঝে মাঝেই বড় ভয় হয়। যদি পঙ্গু হয়ে থাকে! তখন! ভাবলেই ভেতরে ভেতরে ভয়ের বরফ-পাথর গড়াতে থাকে আরতির। ছেলেটা এরকম হাবাগোবা, ন্যালবেলে। সেতো বলতে গেলে সারা জীবনের বোঝাই রয়ে গেল। তার ওপর যদি আয়েঙ্গারও জড়ভরত হতে থাকে একটু একটু করে, তখন কি হবে?

জ্যোৎস্না লাগা খাঁচার ভেতর থেকে বন্দি বাঘ আবারও চিৎকার করে উঠল হা-আ-উ-উ-ম। হা-আ-উ-উ-ম। তার সঙ্গে গলা মিলিয়েই যেন বা খুশির শব্দ করে উঠল ডাব্বু। —ও-বা, ও-বা আ-বা—আ-বা। তাদের সেই আওয়াজে আকাশের চাঁদও বুঝি কেঁপে উঠল থর থর থর থর করে। চার বামন সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। আর সাজাবে কি না নতুন করে ঘুঁটি, সেটা ভাবতে ভাবতেই তারা দেখল আকাশের চাঁদ আরও কেমন যেন ফ্যাকাশে মেরে যাচ্ছে।

এখনই কি মালকিন বলবে, এখনও রাত জেগে লুডো খেলছ তোমরা! খালি বাজে গজালি আর আড্ডা। রাত কটা হল, খেয়াল আছে সেদিকে! রাত তেরোটা পর্যন্ত লুডো ঘিষবে, না হলে তাস। নয় তো নিজেদের মধ্যে বাজে গপপো আর তার সঙ্গে ক্রমাগত হা-হা-হি-হি। স্যার একবার যদি জানতে পারে না—

এই 'স্যার' শব্দটা কেমন যেন মন্ত্রের মতো কাজ করে টুপি, লাড্ডু, কাতু আর কুতুদের মধ্যে। স্যার মানে আয়েঙ্গার। রেগে গেলে ভয়ঙ্কর। ইদানীং সেই রাগ ঝাল যেন আরও বেড়েছে। কথায় কথায় জিনিস ছোড়াছুড়ি, ভাঙা ভাঙি। হাতও চালিয়ে দেয় যখন তখন। কেন যে এরকম হচ্ছে?

আরতি অবশ্য ডাব্বুকে কোলে নিয়ে প্রায় ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে চলে যায় নিজের তাঁবুর দিকে। সেখানে বাকি রাতটুকু কাটাতে হবে একা একাই—এটুকু ভেবে নিলেই কষ্টে বুক ভেঙে আসে আরতির। দুঃসহ চাপা বেদনা ঘাই মারে বুকের ভেতর।

তাঁবুর মধ্যেও শামিয়ানার ছাঁকনি পার হয়ে, এদিক ওদিকের ফুটো ফাটা, জোড়াতাপ্পির ভেতর দিয়ে কোত্থেকে কোত্থেকে যেন পড়েছে চোরাই জ্যোৎস্না। সেই কাঁচা পাকা আলোয় আয়েঙ্গারের চশমা খুলে রাখা বোজা দু চোখ, ভাঙা গাল, গালের ওপর হালকা হালকা পাকা দাড়ির রোঁয়া, চোখের নিচে জমাট ক্লান্তি—সব যেন আরও অনেক বেশি মন খারাপ করে দেয় আরতির। বুকের সব লোম কবেই পেকে গেছে। চাঁদের আবছা মতো আলোয় সেই রোমরাজিতে কাশ ফুলের মায়া।

এই মানুষকেই আমি ভালোবেসেছি। দিনের পর দিন উত্তপ্ত হয়েছি তার স্পর্শে। উত্তেজিত করে তুলতে পেরেছি তাকেও। আনন্দে ভেসে গেছি দুজনে।

বয়সের ফারাক অনেকটাই। তবু তো ভালো লেগেছে আয়েঙ্গারকে। তার চাউনি, মাপা রসিকতা, অসম্ভব পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে। কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারে একটা লোক, না দেখলে বিশ্বাস হবে না কিছুতেই।

চিৎ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা আয়েঙ্গারের পাকা চুল মোড়া বুকে জ্যোৎস্নার হাঁটি হাঁটি পা পা। এই চওড়া বুকে কত দিন, কত কত সময় শুয়ে থেকেছি চুপচাপ। মাথা ঠেকিয়ে, গাল লাগিয়ে নিভৃতে একা একা। কত না সব মুহূর্ত যে পেরিয়ে এসেছি, তার হিসেব রাখি নি। গায়ে খুব জোর তখন সেই মানুষটার। অসম্ভব সাহস মনে মনে। আমাকে পুরোপুরি পাওয়ার পর যেন নতুন করে বাঁচতে শিখল লোকটা। বাঁচার মতো বাঁচা যাকে বলে। কাজে—যে কোনো কাজ বলা হোক না কেন, তখন তার কি বিপুল উৎসাহ। এখনকার ঠিক উলটো ছবি, যাকে বলে। এই যে সব ব্যাপারে বিরক্তি, চুপ চাপ একা একা বসে থাকা। হঠাৎ হঠাৎ বিড় বিড় করে কথা বলা নিজের সঙ্গে—সবটাই কেমন পর পর ধরে নিল ওকে এই ক বছরে। তারপর আরও বেশি বেশি করে জাপটাল। এখন শো-এর সময় ছাড়া প্রায়ই একা একা বসে থাকে। কথা বলে হাওয়ার সঙ্গে। সেই কথায় কোনো শব্দ নেই। কালচে, পুরু ঠোঁট দুটো নড়ে শুধু। রোজ দাড়ি কামাতে হয় বলে কামায়, সেই শো-এর আগে। তাতেও বিরক্তি। এক রাশ ব্যাজার ভাব। কি যে হয়েছে মানুষটার কিছুই বুঝি না। এসব ভাবনার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বড় করে শ্বাস চাপল আরতি।

বাঘ দেখে আসার পর মাথার খেয়াল নেমে যেতে ভাব্বু ঘুমিয়ে পড়েছে। এক কাত হয়ে শুয়েছে ছেলেটা। আস্তে আস্তে নাল ভাঙছে ঠোঁটের কষে। বুকে লালাপোষ দেওয়া আছে একটা। এখন বিব না কি একটা যেন বলে। তাইতে হয়ত বা সামলে দেওয়া যায় খানিকটা।

আয়েঙ্গারের ক্লান্ত, বিষাদ ছাপ মুখের কাছে নিজের মুখ আনতে গিয়ে ঝাঁঝাল দিশি মদের গন্ধ পেল আরতি। ইস, বিশ্রী দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল। কিসের জন্য, কোন আনন্দে না দুঃখে খায় কে জানে! কেন খায়? আগে আগে মাঝে মাঝেই অনুরোধ করত আরতিকে। —এসো না, এক সঙ্গে বসি। খাই। আনন্দ করি।

প্রথম প্রথম কেমন অস্বস্তি হত আরতির। তখনও বিয়ে-থা কিছুই হয়নি। কিন্তু অত বড় একটা লোক। তারওপর 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর মালিক কাম রিংমাস্টার, তার অনুরোধ তো কোনোভাবেই এড়ান যায় না। আরতি নন্দী যেখানে একজন সামান্য শো করা ট্রাপিজ গার্ল। তার মতামতের কি-ই বা দাম আছে! ভালো লাগা না লাগার দামই বা তেমন করে কে দেবে।

প্রথম প্রথম নাক টিপে খাওয়া। বিচ্ছিরি গন্ধ। গলা বুক জ্বালা করে। খেতে গিয়ে গা বমি বমি হয়। কিন্তু একটু যাওয়ার পর পরই কেমন যেন মজা মজা ভাব। বেশ মস্তি যাকে বলে।

গেলাস হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে সিপ করতে করতে বলে উঠত আয়েঙ্গার, স্লো, স্লো বেবি। গো স্লো প্লিজ। অত জোরে কোঁত কোঁত করে মারলে কিক হবে তাড়াতাড়ি। আউট হয়ে যাবে।

প্রথম প্রথম খেয়ে মুখ ভ্যাচকাতাম। অসম্ভব খারাপ লাগত। ঝাঁঝ ঝাঁঝ, তেতো তেতো, নাকি কষা—ঠিক বুঝতে পারি না। তারপর আস্তে আস্তে সব কেমন ঠিক হয়ে গেল। একটু যেন অভ্যাসও। ব্যাপারটা প্রায় মিশে গেল রোজ দিনকার রুটিনের সঙ্গে। কিন্তু যতই রিকোয়েস্ট করুক আয়েঙ্গার আমি কিন্তু ডেইলি খেতাম না। নিয়ম করে গ্লাস নিয়ে বসতাম ওর সঙ্গে। বুঝি একজন নিঃসঙ্গ, বাঘ সিংহ হাতি চরান মাঝবয়েসি পুরুষ কী ভাবে শো-এর পর সময় কাটাবে! তার তো কিছু না কিছু শখ-আহ্লাদ দরকার। নইলে শুধু টিকিট ঘরে কত বিক্রি হল তার হিসেব, বাঘ সিংহ হাতি তাড়িয়ে পাবলিকের কাছ থেকে পাওয়া হাততালি আর সারা বছর দল নিয়ে সারা দেশ চষে বেড়ান, এই করে—শুধু এটুকু করেই জীবন কাটে নাকি!

বেশ কয়েক বছর ওর সঙ্গে আর সামনাসামনি নিয়মিত বসা হয় না গ্লাস নিয়ে। অবরে সবরে হয়ত এক-আধ দিন তেমন জেদ ধরে যদি আয়েঙ্গার, তখন। ভয় হয় যদি রেগে গিয়ে চরম অশান্তি করে, তখন কি হবে! বড্ড সিন করে না আজকাল। যা বলবে সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। একদম যেন ডাব্বু। আমার হয়েছে মহা জ্বালা। এসব ভেবে নিতে গিয়ে খুব আলতো করে হাতের আঙুল আয়েঙ্গারের বুকে জেগে থাকা পাকা রোমে ছোঁয়াল আরতি। একটু অপেক্ষা করল। নাহ্, কোনো প্রতিক্রিয়াই নেই আয়েঙ্গারের। অথচ আগে তো একেবারেই উলটো ছিল ব্যাপারটা। গায়ে সামান্য ছোঁয়া লাগল কি লাগল না, জেগে উঠত আয়েঙ্গার। তারপর আর কিছু বলার নেই। কোনো বাধাই মানবে না। প্রবল হুটোপুটি। আর এখন—অনেক কষ্ট করেও তাকে জাগান যায় না। বয়েস হলে কি এভাবেই আস্তে আস্তে মরে যায় সব কিছু? সমস্তই ফুরিয়ে যায়? নিভে যেতে থাকে একটু একটু করে!

তাঁবুর এখানে ওখানে চাঁদের আলোর ছিটে। সেই খাপচা খাপচা আলো-আঁধারির ভেতর আয়েঙ্গারের বসে যাওয়া বোজা দুচোখ, কাঁচা পাকা ভুরু, মাথার শাদা কালো চুল—সব মিলিয়ে একটা বুড়ো লোক। তাকে দেখতে দেখতে কেমন যেন একটা অচেনা কান্না গলার কাছে ঠেলে আসতে লাগল আরতি নন্দীর।

এমন তো ছিলে না তুমি—কান্নার চাপা দমক আটকাতে আটকাতে নিজের মনেই বলে উঠল আরতি। তার পর হাত রাখল আয়েঙ্গারের বুকে।

কোনো সাড়া নেই।

তরঙ্গও না।

শরীর তার কোনো ভাষা ফুটিয়ে তুলল না।

হাতের আঙুলে নতুন করে আয়েঙ্গারের পেকে ওঠা বড় বড় বুকের লোমে নাড়াচাড়া করতে লাগল আরতি। এ ধরনের কুড়কুড়ি খুবই পছন্দ করে আয়েঙ্গার। তবে এখনও করে কি? বোঝার কোনো উপায় নেই।

আগে ছোঁয়া মাত্র শরীর কথা বলত।

না ছুঁলেও বলত। আয়েঙ্গার যেন তৈরিই থাকত সব সময়। কত বার একটু বিরক্ত হয়েই বলেছে আরতি, বাব্বা, যখন তখন, এমন করে হয় না কি! হাঁস-মুরগি কি আমরা?

ইদানীং মন খারাপ নিয়ে থাকা আয়েঙ্গার মাঝে মাঝেই একটু যেন হা-হুতোশ করেই বলে, আমার বুকের সব রোঁয়াগুলো পেকে গেল সার্কাস সার্কাস করতে করতে। কোথা দিয়ে যে সমস্ত দিনরাত্রি কেটে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। আবার যদি নতুন করে শুরু করা যেত। একদম গোড়া থেকে। বেশ হত তা হলে। অনেকগুলো ভুল শুধরে নেওয়া যেত জীবনের। সবটা অন্য রকমভাবে করতে করতে যদি বদলে দেওয়া যেত জীবনের ধারা। তা আর হয় না বোধহয়। কোনো ভাবেই হয় না।

ঘুমের মধ্যে ডাব্বু পাশ ফিরল। এতক্ষণ শুয়ে ছিল চাঁদের দিকে মুখ করে। এবার ফিরে শুয়েই পিঠ চলে গেল চাঁদের আলোর পড়ে থাকা গুঁড়োর মধ্যে। ঘুমিয়ে একেবারে ন্যাতা হয়ে গেছে ছেলে। ওকে নিয়েও কথা বলে মাঝে মাঝে। বলে, বুড়ো বয়সের ছেলে। ভেবেছিলাম বয়েস হচ্ছে। এবার পাশে দাঁড়াবে ছেলে। কোথা থেকে কি হল! হাবাগোবা ছেলে নিয়ে এখন সারা জীবন কাটাতে হবে। যত বড় হচ্ছে, তত সমস্যা বাড়ছে। আমরা দুজনে বেঁচে থাকতে থাকতে আমাদের সামনেই যদি চলে যায়, তাহলে ভালো হয় বড়। না হলে কষ্ট পাবে অনর্থক। কে দেখবে? কে খাওয়াবে, পরাবে, ওষুধ দেবে? চান করাবে?

মানুষটার এরকম কথা শুনে জোর করে হাত চাপা দি মুখে। কি বলেরে বাবা! বাঘ-সিংহের সঙ্গে থেকে থেকে মায়া দয়া কি সব চলে গেল নাকি? বাবা বাঘ, বাবা সিংহরা যেমন নিজেদের বাচ্চা দিয়ে জলখাবার সারে, এ যে দেখছি তেমনই কথাবার্তা। এভাবে বললে বুক কেঁপে ওঠে না!

একদিন তো খুব করে নেশা টেশা খেয়ে ডাব্বুকে অনেক আদর টাদর করতে করতে হঠাৎ একেবারে অন্য লোক। চেনাই যায় না। ঝাপসা কাচে মোড়া দু চোখের মণি কেমন যেন ঠাণ্ডা আর স্থির। আচমকা ডাব্বুকে মাটি থেকে তুলে ধরল আদর করতে করতে। তারপর বলল, ফেলে দি! এবার ফেলে দি। এই তো বছর দুই আগে। সত্যি সত্যি অনেকটা ওপর থেকে আছাড় দিতে চাইছিল ইচ্ছে করে। ছেলে তো প্রথমে খুব হাসছে। তারপর বাবার মুখচোখ দেখে কি যেন কি বুঝল কে জানে! হঠাৎ ভ্যাঁ করে মহাকান্না দিল জুড়ে। তারপর কেঁদেকেটে সারা। তখন তাকে চাপড়ে চাপড়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়। হাঁ মুখের ভেতর

জোরে ফুঁ দেওয়া। সে বড় কঠিন কাজ। এই করে করে কান্না থামান। ছেলে তো কেঁদে ককিয়ে নীল একেবারে। কীসে যে ভয় পেয়ে গেল ছেলে! বোধহয় বুঝতে পারল বাপের মতিগতি। ভাগ্যিস কাছে ছিলাম, তাই তো সামলান গেল কোনো রকমে। কাছে না থাকলেই হয়েছিল চিত্তির।

যত বড় হচ্ছে ডাব্বু, তাকে নিয়ে তত চিন্তা বাড়ছে আমাদের। সত্যিই তো আমরা যে দিন থাকব না পৃথিবীতে, সেদিন কি হবে ছেলের। কে দেখবে তাকে?

ছেলেবেলা থেকেই খুব একটু কেমন যেন। সব বাচ্চা যেমন চনমনে, ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়, তেমন নয় একেবারেই। বরং খানিকটা চুপচাপ, কেমন যেন ম্যাদামারা যাকে বলে। আর বায়না চাপলে তো আর কথা নেই। তখন পৃথিবী এক দিকে আর ও এক দিকে। যা চাইবে সঙ্গে সঙ্গে চাই। একটা ব্যাপার অবশ্য আছে এরই মধ্যে, গান শুনলে একদম চুপ। সুর শুনলেই হল। যে কোনো সুর। শুনতে শুনতে ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারবে। এই একটা সুবিধে। তবু খানিকটা আটকে রাখা যায় ইচ্ছে মতো।

চাঁদের আলো আয়েঙ্গারের শাদা লোম বোঝাই বুকে আটকে আছে। বড় মমতায় সেখানে হাতের আঙুল আলতো করে ছুঁইয়ে দিল আরতি। তবু ভাঙল না আয়েঙ্গারের ঘুম। আরতির খুব ইচ্ছে করল আয়েঙ্গারের বুকে তার মাথাটা রেখে দেয়। কিন্তু সেই প্রবল ইচ্ছেকে এক রকম জোর করেই আটকাল আরতি। হয়ত ঘুম ভেঙে যাবে মানুষটার। আহা, ঘুমোক। ঘুমোক। মনে মনে এটুকু বলে পাশ ফিরে ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল আরতি। তারপর ডাব্বুর মাথাটাকে বেশ জোরে নিজের কাছাকাছি টেনে এনে গভীর ভাবে চুমু দিল তার চুলে। ঠিক তখনই নিজেদের তাঁবুতে স্টিলের কালো ভারি ট্রাঙ্কের ভেতর রাখা বড় আয়না নামিয়ে নিজেদের মুখ দেখতে দেখতে কাতু আর কুতুর মনে হল বয়স বয়স বড় তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাকে ধরে রাখা খুবই কঠিন। কিছুতেই আটকে রাখা যায় না বয়স। সে কেবলই এগিয়ে যায় পিছলে পিছলে। তার সঙ্গে ছুটে পারা শক্ত।

বড় আয়নার কাচ ঝকঝক করে ওঠে জ্যোৎস্নায়।

কেউ যেন আগাগোড়া লেপে দিয়ে গেছে চাঁদের আলো। সে দিকে তাকিয়ে নিজেদের জোড়া মুখ দেখতে পায় কাতু আর কুতু। আজ রাতে লুডো খেলা চৌপাট করে দিল মালিকের হাবা ছেলেটা। বাঘ, বাঘ দেখবে শালা। শা-আ-লা, কত শখ। পোঁদে নেই ইন্দি/ভজরে গোবিন্দি। দিয়ে গেল বরবাদ করে আমাদের গোটা খেলাটা, মনে মনে ভাবল কুতু। পড়ল একটা পুট কত কষ্ট করে। ছক্কার পর পুট ফেললাম। সেটা তো গোলমালে হারিয়ে গেল। তখনই তো শুরু হয়ে গেল তর্কাতর্কি, আদৌ এই পুট পড়ায় ঘুঁটি বেরবে কি না ঘর থেকে, তা নিয়ে। হয়ত একটা ডিসিসান কিছু হয়েই যেত। শুরু হত খেলা। তার মধ্যেই ঐ মাগি। শালির

মাঝরাতে শখ উঠল ছেলেকে নিয়ে বাঘ দেখাবে। তাও যদি বুঝতুম ছেলের মতো ছেলে, রাজপুত্তুর। তা কোথায়? এ তো রাজার ব্যাটা কেরোসিন তেলঅলা। ছেলে না পিলে! গোঁ গোঁ গাঁ গাঁ-আ-আ করে কি বলে বোঝে কার বাপের সাধ্যি! গোঙা কোথাকার! তাকে নিয়ে আদিখ্যেতা কত। তো সে যা হোক, বাঘ দেখাবি, সিংহ দেখাবি—যা খুশি দেখা গিয়ে। কিন্তু আমাদের রাতের খেলাটাতো চৌপাট হয়ে গেল একেবারে। যাকে বলে এক্কেবারে সব্বোনাশের ওপর সাড়ে সব্বোনাশ। পুরো চটকে গেল খেলাটা।

আয়নায় ফুটে ওঠা নিজেদের জোড়া মুখ পাশাপাশি দেখতে দেখতে মনে হল কুতুর একই ডাইসে ফেলে তৈরি করা হয়েছে দুজনকে। হবে নাই বা কেন, যমজ হলে যা হয়, যেরকম হয়, তেমনই হয়েছে।

আয়নায় নিজেদের মুখ দেখতে দেখতে তার পাশেই কুতু দেখতে পেল আলকাতরা মাখান ডালডার টিন আর বাঁশ দিয়ে বেড়া দেওয়া পুকুরের ধারে মাটির রাস্তা। একটু জল পড়লেই একদম কাদায় কাদা। সেই পুকুরের ধারে ধারে টিন আর বাঁশের বেড়ার গায়ে কাঁকড়া, গেঁড়ি-গুগলি। কুঁচে মাছ, কাঁকড়ার বাচ্চা, কত কত তেচোখা মাছ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে জলের ভেতর। ল্যাজে কালো ফুটকি দেওয়া পুঁটি মাছ। কি চকচকে রুপোলি তাদের সারা গা। তাদের কোনো কোনোটা আবার সামান্য লালচে।

আমরা দুভাই খুব গেঁড়ি তুলতাম। বাড়িতে অভাব। বাবা ভিক্ষে করত। এক সময় আমাদের যমজ দুভাই এক দিদি, দুবোনকে ফেলে কোথায়, কোন নিরুদ্দেশে চলে গেল। তার আর কোনো খবর নেই। মা বাবুবাড়ি খাটে। ক্ষারে ভেজান কাপড় কাচে। ধান ঝাড়ে, ধান সেদ্দ করে, গোয়াল সাফাই করে। ছাগলদের, গরুদের খেতে দেয়। আমাদের একটা ছোট বোন মায়ের আঁচলের তলায় তলায় ঘোরে। আমাদের বাড়ির ছাগল নিয়ে গিয়ে মাঠে বেঁধে বসে থাকে। আমরাও ছাগল চরাতে যাই বোনের সঙ্গে।

বর্ষায় পুকুর পাড় থেকে কাঁকড়া ধরি, গেঁড়ি তুলি। তখন আমাদের দুজনের নাম বাচ্চু আর বাবু। আমি বাবু। কাতু বাচ্চু।

বাবু দুপুরবেলা পুকুরধারে ঘোরাঘুরি করছিস কেন রে? কেউ একজন জানতে চাইল, গ্রামেরই লোক! ভালো করে দেখি বামুন পাড়ার নরেশ কাকা। নরেশ আচায্যি।

ও কিছু না কাকা!

কিছু না মানে! দুপুরবেলা কেউ ঘোরে পুকুর ধারে! আবার একই সঙ্গে দুই বেঁটেতেই আছ। মানে দুই ভাই। একা রামে রক্ষা নাই/সুগ্রীব দোসর। মাছ চুরির মতলব নাকি?

না, কাকা।

তাহলে দুপুরবেলা ঘোরাঘুরি করছিস কেন?

এমনি।

এমনি এমনি কেউ ঘোরে ফাঁকে—এই পুকুরধারে? বল কি মতলব।

কিছু না কাকা।

বেঁটের গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। বল, বলতেই হবে ফাঁকে কেন ঘুরছিস?

নরেশ আচায্যির ধমক শুনে ভেতরে ভেতরে খুব রাগ হয় কুতুর। বর্ষায় টিন মোড়া বাঁশের পায়ে অনেক অনেক কাঁকড়ার বাচ্চা. গেঁড়ি, গুগলি। কুঁচে মাছ। গুগলি তুলে নিয়ে গেলে খোলা ফাটিয়ে ভেতরের নরম শাঁসটা বার করে এনে পেঁয়াজ রসুন শুকনো লঙ্কা দিয়ে চমৎকার রান্না করে দেয় মা। তা দিয়ে অনেকটা ভাত খাওয়া যায়। কিন্তু সকলের সামনে গেঁড়ি তুলতে লজ্জা করে। দেখলেই সবাই বলবে, ভিখিরির বাচ্চা ভিখিরি গেঁড়ি তুলছে, রান্না করে খাবে বলে। তখন ভারি লজ্জা করে। কান্না পায়। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায় অপমানে। মুখে তবু অন্য রকম ভাব ফুটিয়ে তুলে বলি, মা কালির দিব্যি। আমরা গেঁড়ি খাই না। ও আমাদের হাঁসে খাবে। সত্যি সত্যি গেঁড়ি ভেঙে দিলে হাঁসে খায়। আর গেঁড়ির ঝোল এমনিতেই নাকি খুব উপকারি। চোখের পক্ষে ভালো, সবাই বলে। পেটের রোগেও নাকি গেঁড়ি, গুগলি খেতে বলে কেউ কেউ। এমন কি যাদের চোখ খুব খারাপ, প্রায় কানা হয়ে গেছে, তারাও কখনও কখনও গেঁড়ির পেটের ভেতর যে জল থাকে, সেই জল দিয়ে চোখ ধোয়। তাতে নাকি চোখ খুব ভালো থাকে। তো সেসব যাকগে। কিন্তু নরেশ আচায্যি কেন যে আমার পেছনে পড়ে গেল! কুতু কিছুতেই গোছাতে পারছে না নিজেকে।

কি ব্যাপার, বললি না তো কেন ঘুর ঘুর করছিস এখানে! আমাদের সাত শরিকের এই পুকুর এখন জমা নিয়েছে কানাই জেলে। সেই জমার পুকুরে মাছ ধরা বন্ধ জানিস না?

মাছ ধরছি না কাকা?

তাহলে কি করছিস?

গেঁড়ি তুলব।

কেন?

হাঁসে খাবে।

শালা, আবার মিথ্যে কথা। নাটা আদমি খুদা কা দুশমন। গেঁড়ি তো খাবি তোরা। ভিখিরির ব্যাটা ভিখিরি।

না, কাকা। সত্যি সত্যি হাঁসে খাবে। মা কালির দিব্যি।

আবার মা কালির দিব্যি দিচ্ছিস, মিথ্যে বলে! যা বাড়ি যা।

দূরে দাঁড়িয়ে বাচ্চু। যার এখনকার নাম কাতু। হঠাৎই বেশ রেগে মেগে বলে উঠল, বুড়ো ভামটার সঙ্গে এত কিসের কথা। শালা হারামি, দেব ইট কেলিয়ে। মাথা চেপে পড়ে থাকবে রাস্তায়।

তবে রে! নরেশ আচায্যি হাতের বড় ডাণ্ডা ছাতা উঁচু করে ভয় দেখায়।

মারব শালা ইটের বাড়ি। বলেই হাতে একটা থানকা তুলে নেয় বাচ্চু।

সামনের গোটা আয়না ভেঙে চৌচির। তার ওপর চোখ ধাঁধান চাঁদের আলো। সবটা মিলিয়ে কেমন যেন ছেতরে যাওয়া জ্যোৎস্না।

গ্রামের বাড়ি থেকে কেমন করে যেন হাত বদলে হয়ে গেলাম সার্কাসের। সার্কাসের জোকার। বাবু থেকে কুতু। বাচ্চু থেকে কাতু। কত টাকায় মা বিক্রি করে ছিল আমাদের দু ভাইকে। নাকি ভুলিয়ে ভালিয়ে ধরে নিয়ে এল ছেলেধরা মুখে ক্লোরোফর্ম মাখা রুমাল চাপা দিয়ে। তা-ই বা কি করে হয়? ছেলেধরা ধরে নিয়ে এলে আগাগোড়া ভিক্ষে করাত আমাদের। এমন যে আমুদে, রগড় করা জোকার হয়ে উঠলুম যমজ দুই ভাই মিলে, তা কেমন করে হত!

পয়সা নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছে মা! নাহলে আমাদের দু ভাইকে এক সঙ্গে দিয়ে দিল কেন! নাকি দুটো পেট কমে গেল, তাতে সুবিধে হল খানিকটা। ভাত জোগাতে হবে না অন্তত দুটো মুখে, চারবেলা। সেটাই বা কম কি মায়ের কাছে।

চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসছে আয়না।

সেই কুয়াশা মাখা আয়নার ভেতর থেকেই কাতু বলল, চল কুতু, এবার শুয়ে পড়ি। লাড্ডু, টুপি ওরা কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে। কার সকালে আবার বাজার যাওয়া আছে। তারপর প্র্যাকটিস।

নিজের গালে ব্রণ হয়েছে কয়েকটা। আয়নার কাচে তাদের বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কুতু। ব্রণগুলোর কোনো কোনোটার মাথা, মুখ বেশ পেকে গিয়ে টুস টুস করছে। আঙুলের নখ দিয়ে টিপে ওর ভেতরের মালটা বের করে ফেলতে পারলে শান্তি। এই ভেবে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর নখে নিজের গালের ব্রণ টিপতে লাগল কুতু।

আয়নার কাচে পাশাপাশি দুই ভাই। একই রকম মুখ। এক ধরনের ভাঁজ, রেখা। শুধু কাতুর মুখে ব্রণ নেই, কুতুর মুখে আছে।

চাঁদের আলোয় জল ন্যাকড়ায় মোছা শাদা শ্লেট হয়ে ঝকঝক করছে আয়না। তাতে দুই ভাইয়ের হাসি হাসি, কান্না কান্না নিরুপায় মুখ। নজর করে দেখলে চোখে পড়বে গালে, থুতনিতে পেকে ওঠা দাড়ির শাদা শাদা ফুটকি। সেই সব ফুটকির গোড়ায় গোড়ায় চাঁদের মিহি গুড়ো। বয়স তো অনেকটাই বেড়ে গেল দেখতে দেখতে। সত্যি সত্যি যদি উঠে যায় সার্কাস, মানে তুলে দিতে বা বন্ধ করতে বাধ্য হয় এস. আয়েঙ্গার, তখন আমরা যাব কোথায়? কোন খানে গিয়ে দাঁড়াব! খাব কি। এসবটাই তো ধাঁধা বিশেষ হয়ে সামনে আসে বারে বারে। এই আষাঢ়ে ঘাটশিলায় অপুর পথের পাশে, দাহিগোড়ার ফাঁকা মাঠে সার্কাসের তাঁবুর মধ্যে

বসে বসে কুতুর মনে হল এখান থেকে আমরা চলে যাব ওড়িশায়। কটক, ভুবনেশ্বর, পুরি। তার আগে হয়ত জামশেদপুর যাওয়া হবে। টাটানগরে শুনছি বুকিং হয়ে গেছে। কে যেন বলছিল সেদিন। এবার যদি বুকিং না-ও হয়, বরাবরই কিন্তু এই যে রাস্তা, তাই ধরে এগোতে থাকে সার্কাস। শীতে কলকাতায় পার্ক সার্কাস ময়দান। তারপর গরম আর বর্ষায় বিহারের ঘাটশিলা, গালুডি, টাটানগর হয়ে ওড়িশায়। সেখান থেকে অসম। মাঝে কখনও হয়ত ছোট খেপে মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া। এভাবেই চলা। তারপর আবার নেমে আসা শীতের আগে, কলকাতার দিকে। খুব শীত পড়তে না পড়তেই তাঁবু খাঁটিয়ে কলকাতায়। খবরের কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন, দেওয়ালে, দেওয়ালে রঙিন বড় পোস্টার। সেখানে ট্রাপিজের খেলা দেখান জাঙিয়া আর বডিজ পরা মেয়েদের ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া ছবি।

বাঘের খাঁচা থেকে খুব জোরে হা-আ-আ-উ-উ-ম, হা-আ-আ-উ-উ-ম ডাক ভেসে আসছে। দিনে সাত আট কিলো মাংস লাগে বাঘটার। সিকান্দারের আর একটু কম। বুড়ো হয়েছে তো। হজম করতে পারে না। লেপার্ড দুটোর এক একটা সাবড়ে দেয় তিন সাড়ে তিন কিলো। সব বড়-খাসির মাংস। আগে সস্তা ছিল। এখন চল্লিশ টাকার ওপর কিলো সেই মাংসের। খুব লালচে, টকটকে রঙ। দেওয়ার সময় সময় দেখেছে কাতু। মাংস দেখলেই কেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠে বাদশা, সিকান্দার, জোড়া লেপার্ডরাও।

আজ আর বোধ হয় ঘুম হবে না। টুপি আর লাড্ডু কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। তাদের অল্প ফাঁক করা মুখের মধ্যে হুড় হুড় করে ঢুকে যাচ্ছে চাঁদের আলো। বেশ শব্দ করেই নাক ডাকাচ্ছে ওরা দুজন। ফু-রু-র, ফোঁত-ফোঁত—ফু-রু-র, ফোঁত—ঘোঁত। ঘোঁ-ওঁ-ত। তালে তাল মিলিয়ে নাক ডেকে উঠছে দুজনের। কি শান্তি, কি আনন্দ, কেমন মজা। আর কি আশ্চর্য, কিছুতেই ঘুম এল না আমাদের দুচোখে এখনও। আর সেই লুডো খেলাটাও মাটি হয়ে গেল। তাসেও বসা গেল না এক দু হাত। ভাবতে ভাবতে বড় করে হাই উঠল কাতুর। সঙ্গে সঙ্গে কুতুরও।

হাই বড় হিংসার জিনিস, মা বলত। একজনের উঠলেই দেখাদেখি আর এক জনেরও উঠবে।

আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখ ভ্যাঙাল কাতু।

নিজেকে নিজে ভেঙচে বেশ লাগল। তাই আবারও ভ্যাঙচাল। আরও একবার।

নিজের যমজ ভাইয়ের এই ছেলেমানুষি দেখে বেশ কষ্ট করে হাসি চাপতে গিয়েও হেসে ফেলল কুতু। প্রথমে একবার মুখ মচকে তারপর বেশ জোরে। দিব্যি হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ।

চল, এবার শুতে যাই—বড় করে হাই তুলতে তুলতে বলল কাতু।

রাত তো কাবার হয়ে এল প্রায়।

না, না—এখনও অনেকটাই বাকি আছে।

শুয়ে পড়লেই ঘুমিয়ে পড়ব।

তা কি কখনও হয়! শুলেই ঘুম আসে!

এতটা রাত জেগে কেমন যেন চোঁয়া চোঁয়া ঢেকুর উঠছে। বলেই ঢেউ ঢেউ করে দুবার ঢেকুর তুলল কুতু।

চল, রেডিও শুনবি!

কেন, এত রাতে রেডিও কেন? কাতুর কথায় পিঠে কথা ফেলে জানতে চাইল কুতু।

না, এমনি বলছিলাম। এফ. এম-এ সারারাত খুব ভালো ভালো গান দেয়।

এখানে এফ এম পাবি কোথায়? এটা তো বিহার।

ওমা, তাও তো বটে।

তবে এখন বিহার আছে আছে। কয়েক দিনের মধ্যেই ঝাড়খণ্ড হয়ে যাবে হয়ত।

সেটা আবার কি?

এমন বোকার মতো কথা বলিস না। সেটা হল গিয়ে একটা নতুন রাজ্য।

ওমা, তাই! কথাটা বলে গালে আঙুল ঠেকিয়ে আয়নার দিকে তাকাল কাতু। সঙ্গে সঙ্গে আয়না তাকে মুখ ভেংচে উঠল।

অন্ধকারে চুপচাপ বসে সিকান্দার। খাঁচার ভেতর রাতে খুব একা লাগে। কত দিন হল সুনয়না নেই। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কত কি ইচ্ছে চলে যায়। ক্রমশ একটু একটু করে মারা যেতে থাকে ইচ্ছেরা। তারপর এক সময় সবটাই কেমন পাথর পাথর। অভ্যাসে বেঁচে থাকা।

তোর মনে আছে কুতু, আমাদের বাড়ি খুব সবুজ আর ঝাড়াল একটা কাগজি লেবুর গাছ ছিল। বাবা নাকি লাগিয়েছিল হাতে করে। তো বাবা তো কোথায় না কোথায় চলে গেল। তারপর সেই লেবু চারার দেখভাল করত মা। একটু একটু করে বড় হল সেই গাছ। কলমের নয় তো, তাই লম্বা হতে বেশ দেরি লাগছিল। মনে আছে তোর?

কাতুর কথা শুনে ঘাড় নাড়ল কুতু। হ্যাঁ কি না—তা থেকে বোঝা গেল না চাঁদ ছোঁয়া অন্ধকারে। বড় আয়নায় সেই ঝাপসা মতো ছায়া হঠাৎ দুলে উঠে মিলিয়ে গেল।

লেবু গাছের গোড়ায় মা বাবু বাড়ি থেকে আনা মাছের আঁশ, পোঁটকা এই সব দিত। দিতে দিতে বলত, রক্ত, মাংসের সার পেলে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে। হাড়ের গুঁড়োতেও সার হিসেবে খুব ভালো। সে সব নাকি দেয় গোলাপ বাগানে! এমন কি মাছ ধোয়া জলও যদি গোড়ায় ঢালা যায় তাহলে ফনফনিয়ে ওঠে গাছ। আমাদের বাড়ি আর আঁশজল কোথায়! তবে চাল ধোয়া জল ঢালতে দেখেছি মাকে লেবু গাছের শেকড়ে। তরকারি ধোয়া জলও। তো সেই গাছ তো খুব ফনফনিয়ে বেড়ে উঠল। তার ডালে ডালে সবুজ পাতা, ছোট ছোট কাঁটা। কাঁটার আশেপাশে

লেবু ঝুলছে। নিজেদের গাছে, নিজের জমিতে, নিজের হাতে লাগান গাছে ফল ধরলে কি যে আনন্দ, সে যাদের হয়, তারাই জানে। লেবু পাতার গন্ধ কি সুন্দর। আমরা ভাতে ডলে খেতাম। কাগজি লেবুর খোসা কত পাতলা। আর কি রস তাতে, এক দম টইটুম্বুর।

কামিনী আর সুন্দরী ঘুমোতে ঘুমোতে ল্যাজের ঝাপটায় বড় বড় মশা, ডাঁশ তাড়াতে তাড়াতে কত কি ভাবছে মনে মনে। তাদের লম্বা শুঁড়ের ওপরও মশারা বসে গেছে লাইন দিয়ে নেমন্তন্ন খেতে। পাশে পার্বতী আর বাদশারও একই দশা।

সুন্দরীর মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেই বিশাল মেলার কথা। সেখানে কাছেই বড়সড় এক নদী। হেমন্তের শুরুতে নদী তেমন চওড়া নয়। মানে জল কমে গেছে। শাদা বালিতে বালিতে ছয়লাপ নদীর চর। সেখানে দূর দূর থেকে আসা শীতের পাখি, বালিহাঁস বসেছে। খুব ভোরে আর সন্ধের মুখে মুখে নদীর চরা বালিহাঁসের কলধ্বনিতে একেবারেই অন্যরকম হয়ে যায়।

অনেক অনেক হাতি এসেছে মেলায়, বিক্রির জন্য। সঙ্গে ঘোড়া, উট, মোষ, গরু, বলদ। আরও সব জীবজন্তু, পাখি রয়েছে। সুন্দরীর মনে পড়ে নদীর ধারে ধু ধু করে জেগে থাকা অনন্ত বালি রাশি।

সন্ধের মুখে সূর্যের আলোয় আস্ত সেই নদী, বালির পাড় একদম অন্য রকম হয়ে যাওয়ার আগে বন্দুকের একটা দুটো শব্দে এক সঙ্গে যে উড়তে থাকে কত কত পাখি। তাদের কালচে ছায়া মাখা ডানায়, ঠোঁটে, সরু সরু পায়ে ক্রমশ লালচে হয়ে আসা সূর্য ঢেকে যেতে থাকে একটু একটু করে। কি এক ভয় ছোঁয়া করুণ সুরে ডাকাডাকি করতে থাকে সেই সব পাখিরা। আর তখনই সূর্যাস্ত তার নিজস্ব রঙ মেলার গায়ে মাখিয়ে দিয়ে গেলে কমলা বিবি, জোহরা বিবি, আঙ্গুরি বিবি—এদের বড় বড় মুখের ছবি লাগান তাঁবুর বাইরে নওটোঙ্কির মজা নেওয়ার জন্য লম্বা লাইন পড়ে যায়। হ্যাজাক, কার্বাইড বাতি, হ্যারিকেন, ভট ভট করে চলা জেনারেটরের বিজলি—সব মিলিয়ে আলোয় মেলা আবার অন্যরকম ভাবে জেগে ওঠার জন্য গা ঝাড়া দেয়।

ক দিন আগেই কার্তিকী পূর্ণিমা গেছে. তার আলোর রেশ এখনও ছুঁয়ে আছে আকাশের মুখ। টুপ টুপ করে নেমে আসা হেমন্তের হিমে ভিজে যাচ্ছে সুন্দরীদের পিঠ, শুঁড়, শাদা দাঁত, পা। লোহার মোটা শেকলে আটকে থাকা পা নাড়লে শেকলের শব্দ ওঠে—ঠন ঠন ঠন, ঠনা ঠন। নদীর বুক থেকে উঠে আসা বাতাস সবার গায়ে মাখিয়ে দিতে থাকে শিরশিরানি। আর তখনই নওটোঙ্কির তাঁবুতে তাঁবুতে বেজে ওঠে সারেঙ্গি, তবলার বোল। ঘুঙুরের আওয়াজ মাত করে দিতে চায় সব কিছু। সেই সারেঙ্গি, তবলা আর ঘুঙরুর বোল দেখতে আসা লোকজনের ছুরা ঘুসিয়ে দেয় একদম।

'লেকে পহেলি পহেলি পেয়ার....'

হাওয়ায় গান ভাসে, তাঁবুর ভেতর। নওটোঙ্কি দেখতে আসা মাথায় ভারি পাগড়ি, হট্টাকাট্টা লোকজন দু চোখে ঝুমাতি হুয়ি নেশা নিয়ে লাল লাল বড় বড় আঁখ ফেড়ে ফেড়ে জওয়ানি দেখে।

'ঝুমকা গিরা রে বরেলি কা বাজার মে....'

বুকে সাজান গুলির বেল্ট। কাঁধে দোনলা বন্দুক, নয়ত রাইফেল। পায়ে কাঁচা চামড়ার ওজনদার নাগরা। সেই জুতির নিচে কমলা লেবু কোয়া চেহারার লোহার নাল।

'পান খায় সাঁইয়া হামারো....'

ঘন ঘন চাড়া পড়ছে কেয়ারি করা বাহারি গোঁফে।

বাইরে সুন্দরী, কামিনী—এমন আরও অনেকে দাঁড়িয়ে চেন বাঁধা পা নিয়ে।

বিছানায় শুয়ে বার বার এপাশ ওপাশ করেও দুচোখে ঘুম আসতে চায় না আরতির। একবার যদি পালায় ঘুম, তাহলে আর দেখতে হয় না। কিছুতেই যেন জোড়া দেওয়া যায় না। আগে এমন ছিল না। আজকাল কি রকম যেন বদলা বদলি হয়ে যাচ্ছে সব।

ডাব্বু এখন চিৎ হয়ে শুয়েছে। চাঁদের ভাঙা আলো তার মুখে। গালের একপাশে। সমানে নাল গড়াচ্ছে ছেলের। এতো বোধহয় আর কমবে না কোনো দিন—যত দিন বাঁচবে, এমনটি মনে হতেই লম্বা শ্বাসে বুক ভাঙল আরতির। অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছে আয়েঙ্গারও। একদম চিৎ হয়ে। বুকের ওপর দুহাত জড়ো করা। অল্প অল্প লালা বেরিয়ে আসছে তারও কষ বেয়ে বেয়ে। এসব দেখতে দেখতে ঘোলা ঘোলা চাঁদের আলোর মধ্যে কেমন যেন মায়া লাগল মানুষটার ওপর। মাথার কাছে রাখা ছোট হাত তোয়ালেতেও প্রথমে ডাব্বুর মুখ পরে আয়েঙ্গারের মুখ খুব যত্ন করে আলতো হাতে মুছে দিল আরতি। বেশি গড়ালে বালিশ ভিজোবে।

চাঁদ এখন প্রায় গড়িয়ে গেছে পুব আকাশে। তার আলোয় কি এক আশ্চর্য, বিধুর মায়া। সে দিকে না তাকিয়েও মনটা নতুন করে খারাপ হয়ে গেল আরতির। কি হবে, যদি সব জীবজন্তু ছেড়ে দিতে হয়। খেলা দেখাব কাদের নিয়ে? কে আসবে, কারা টিকিট কাটবে? কেনই বা ভিড় জমবে সার্কাসের তাঁবুর পাশে?

তার ওপর দিনকালও তো সব কেমন বদলে বদলে যাচ্ছে। এই ঘাটশিলাতে এখন রাস্তায় প্রায়ই মিছিল—ধমসা মাদল বাজিয়ে। সঙ্গে অনেক অনেক মানুষ। তাদের হাতে টাঙি, গাঁড়াসা, ভালা, লাঠি। 'হুল ঝাড়খণ্ড'—এই স্লোগান দিচ্ছে তারা। আলাদা রাজ্য চাই এখানকার আদি বাসিন্দাদের জন্য। বিহার থেকে, বাংলা থেকে ওড়িশা থেকে খানিকটা খানিকটা কেটে নতুন রাজ্য, ঝাড়খণ্ড চাই। এমনই দাবি তাদের।

দিনের বেলা এই সব মানুষদের মিছিল প্রায়ই ঘুরে বেড়ায় এ রাস্তা ও রাস্তা। সঙ্গে থাকে ধমসা মাদলের বাজনা। ডি ডি ম ডি ম ... ডি ডি ম ডি ম। ধমসা বাজছে। বাজছে মাদল, রামশিঙা, নাকাড়া।

ঘুমের মধ্যেও আজকাল এই ধমসার বুনো কলরোল শুনতে পায় আরতি। ভয়ঙ্কর চমকে উঠে তার ঘুম ভেঙে যায় কখনও কখনও। ধড়মড় করে উঠে বসে বিছানার ওপর। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে জল খায়। তারপর মুখ মোছে। ঘাড় মোছে। গলায় তোয়ালে বোলায়। সারা শরীর ঘামে ঘাম।

বিছানায় আবার টান টান হয়ে ভাবে আরতি নতুন রাজ্য যদি হয়, তাহলে কি সেখানে পাওয়া যাবে সার্কাস দেখানর অনুমতি। নাকি আরও নতুন নতুন নিষেধ, আইনি ফাঁস চাপবে সার্কাসের কাঁধে! বলা তো যায় না কিছুই। যা দিনকাল পড়েছে। যত মরণ গরিবের। আগেও তাই ছিল, এখনও তাই।

আয়েঙ্গার এসব নিয়ে ভাবে টাবেই না বোধহয়। কেমন যেন হালছাড়া অবস্থা হয়েছে মানুষটার। কোনো কিছুতেই আর বোধহয় তেমন আসক্তি নেই। যা চলছে, যা হচ্ছে—তেমনই চলুক, হতে থাক। এরকম একটা ভাব—সব সময়। তার ওপর আছে যখন তখন কারণে অকারণে রেগে যাওয়া। কি যে হবে! ভাবলে মাথা পাগল পাগল করে।

বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, আবার নতুন একটা হাই তুলল কুতু। পাশে দাঁড়ান কাতুও হাই তুলল। তাদের দুজনের ভিরকুটি মুখের ছায়া পড়ল আয়নায়।

চল, বাইরে যাই। হঠাৎই বলে উঠল কাতু।

কোথায়?

সুবর্ণরেখার পাড়ে।

কেন?

নদীর জলে শেষ রাতের চাঁদ কেমন ভেসে আসে দেখব। একদম চিনির পাতলা রসে রসগোল্লা যেন।

তোর সবেতে খাওয়ার কথা। বড্ড পেটুক তুই।

ও, শুধু আমি! তুই নোস!

এবার চুপ করে রইল কুতু।

যাবি কি?

গেটে পাহারা আছে না! ভুলে গেলি! যাব কেমন করে?

তাহলে চল বাইরে বেরই। ভেতরটা বড্ড গুমোট। গরম লাগছে।

চল।

জ্যোৎস্নায় চারপাশ বুঁদ হয়ে আছে তখন। একটু দূরেই সুন্দরী আর কামিনী। পায়ে মোটামোটা লোহার জিঞ্জির। ওদের কষ্ট হয় না পায়ে শেকল নিয়ে? আপন মনেই বলল কুতু।

অভ্যাস হয়ে গেছে।

চ্যাটালো বড় একটা প্লাস্টিকের গামলায় ভর্তি আছে জল। তেষ্টা পেলে খাবে সুন্দরী আর কামিনী। গামলার ওপর কাঠের ঢাকনা।

কিরে সুন্দরী, কামিনী কেমন আছিস তোরা? জানতে চাইল কাতু?

এই কথার জবাবেই কিনা বোঝা গেল না নিজেদের বড় বড় কান নাড়ল সুন্দরী। তারপর কামিনী। অল্প অল্প দোলাল শুঁড়ও।

কাঠের ঢাকনা ঠেলতে শুরু করল কুতু হঠাৎই। বেশ ভারি।

কি করছিস কী? কেউ দেখলে মার খাবি নির্ঘাৎ।

বেশ মজা হবে। দেখই না কি করি। হাঁ করে দেখছিস কি! হাত লাগা। হাত লাগা। দেখবি বেশ মজা হবে।

কি, করছিস কি কুতু!

হাত লাগা না। দেখতে পাবি।

ঢাকনা সরে গেলে গোল একখানা চাঁদ সেই গামলার জলে। সে দিকে তাকিয়ে ঝক ঝক করে উঠল কাতুর চোখ। তারপর বলল, আমরা বেঁটে বক্কেশ্বর, চাঁদ ছুঁতে চাওয়া নাকি আমাদের বাড়াবাড়ি। কি, তাই না?

এমনই তো বলে সবাই।

কি যেন বলে কথাটা, কি যেন বলে! ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বামন হয়ে চাঁদে হাত। তা দ্যাখ এ বার কেমন হাত দি চাঁদে। বলে কাতু সুন্দরী, কামিনীদের খাবার জন্য গামলায় রাখা জল ঘাঁটতে লাগল।

ভিজে যাব, ভিজে যাব কাতু।

ভিজবি না রে বাচ্চু। মজা হবে।

না রে না। ঠান্ডা লাগবে। জ্বর হবে। শো করতে না পারলে আয়েঙ্গার খিস্তি দেবে। প্যাঁদাবে।

অত সোজা! আজ কি আনন্দ দ্যাখ না, কি আনন্দ।

কেন, আনন্দ কেন?

ওমা, তাও ভেঙে বলতে হবে! কি বোকারে তুই! বামন হয়ে, বেঁটে বক্কেশ্বর হয়ে, নাটা আদমি খুদা কা দুশমন হয়ে দিব্যি চাঁদে হাত দিয়েছি। কেমন, তাই না! আনন্দ তো হবেই।

ও তো জলে ভাসা ছায়া।

ছায়া! তা হোক! চাঁদ তো—বলেই গলার কাছে উঠে আসা কান্না আটকে ফেলল কাতু।

কাতু, আমার শীত করছে রে! যদি জ্বর আসে!

আসবে না রে বাচ্চু। আসবে না। আমরা যে চাঁদ ছুঁলাম। নে, তুইও একবার ছুঁয়ে নে ভালো করে। ছোঁ।

কামিনী আর সুন্দরী অবাক হয়ে, খুদে খুদে চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগল তাদের খুব চেনা দুজন বেঁটে বেঁটে মানুষ চাঁদের পলকা আলোয় অসম্ভব এক আনন্দে মেতে উঠেছে।

নয়

এই আষাঢ়ে, যখন কোথাও কোথাও বৃষ্টি বেশ নেমে গেছে, কোথাও বা নামব, নামব, তখন ঘাটশিলার আবহাওয়া বেশ একটু অন্যরকম। খানিকটা মজাদারও বটে, অন্তত যাঁরা পশ্চিমবাংলায় থাকেন, তাঁদের কাছে। আকাশ একটু আগেই সাফ-সুতরো দিব্যি ল্যাপাপোঁছা ছিল যাকে বলে। অসম্ভব নীল আর ঝকঝকে। এই তো মিনিট পনের কুড়ি কি বড়জোর আধঘণ্টা হবে। রঙিন শামিয়ানার ঘেরাটোপের মধ্যে বসে বসে লাড্ডু, টুপি, কাতু, কুতু এমনটি দেখতে দেখতে হাই তোলে। কাল বেশ রাত পর্যন্ত সাপলুডো খেলা চলেছে। পুট, পুট, পোয়া, পোয়া—এই তো, এই তো আমার পুট পড়ল। না রে, এবারও ফসকে গেল বাবা—এই রকম করতে করতে সময় কেটেছে তাদের। ঘড়ির কাঁটা নিজের নিয়ম মতো ঘুরে যেতে থাকে। থামে না কোথাও। কখখনো থামে না, যদি না খারাপ হয়ে যায় বা দম দেওয়া বন্ধ থাকে। আজকাল অবশ্য দমের ঘড়ি আর নেই-ই প্রায়। সবই ব্যাটারির। নয়তো অটোমেটিক।

ঘাটশিলার দাহিগোড়ায় অপুর পথের ধারে যে বিশাল ফাঁকা মাঠ সেখানে 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর তাঁবু পড়েছে। প্রতি বছরই বর্ষায় এস. আয়েঙ্গার তার 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস' নিয়ে হাজির হয়ে যায়। জীবজন্তু, পাখি, রিং মাস্টার, জোকার, ব্যালান্সের খেলা, মরণ ঝাঁপ—সবরকম খেলকুদ দেখানর লোকজন—সব মিলিয়ে সে এক বিশাল জগঝম্প ব্যাপার।

'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর টুপি, লাড্ডু, কাতু আর কুতু রঙদার শামিয়ানা ঘেরা উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোদমাখা আকাশ দেখতে দেখতেই অভ্র আর কাঁকর মেশান লালচে মাটির ওপর নিজেদের কালো কালো বেঁটে বেঁটে চারটে ছায়া দেখে আবারও আকাশের দিকে তাকায়। তারপর নিজেদের মনে মনেই কেউ কেউ বিড় বিড় করে বলতে থাকে, আমরা চার বেঁটে বক্কেশ্বর। চার চার বামন আমরা এই যে 'গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস', এখানে চাকরি করি জোকারের। এমনি দিনে—সোম থেকে শুক্র দুটো করে শো। শনি রবি—অন্য দুটির দিনে তিনটে শো। বারোটা তিনটে, সাড়ে তিনটে, সাড়ে ছটা, তার পর সব শেষে নাইট শো—সাতটা দশটা।

প্রতি শুক্কুরবার শুক্কুরবার সকালে বেরতে হয় পোচায়ে। দলের একটা শাদা রঙের মোটর গাড়ি আছে, অ্যামবাসাডার, মার্ক থ্রি। বেশ পুরনো মডেলের। পেট্রোল গাড়ি। খরচ বেশি। কিন্তু পোচার না করলেও তো হয় না। তাই বেরতোই হয়।

ড্রাইভার সন্ন্যাসী মাখাল ছাড়া 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর চার জোকার অ্যামবাসাডার-এ সিট জাঁকিয়ে বসে। তখনও তাদের মুখে অল্প অল্প রঙমাখা, মাথায় রঙচঙে তেকোনা টুপি, সেই ঢিলেঢালা জামা, যার হাতে, গলায় বাহারি কুচি, ঢিল ঢিল পাজামাও তাই, সেও বেশ নানা রঙের, চকরা বকরা। তার পায়ের কাছে কুচি।

হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা, ওড়িয়া—চার রকম ভাষাতেই ছাপান হ্যানডবিল। কলকাতা থেকেই ছাপিয়ে গাঁটরি বেঁধে নিয়ে আসে, আয়েঙ্গার। তার একটা হিসেব আছে। পুরি বা ভুবনেশ্বর গিয়ে কমটম পড়ে গেলে তখন আবার কিছু ছাপিয়ে নিতে হয়। যে রঙিন পোস্টার সার্কাসের খবর জানানর জন্য মারা হয় দেওয়ালে দেওয়ালে, তাও ছেপে আনা হয়েছে কলকাতা থেকেই। ফুল সাইজ পোস্টারে উড়ন্ত সেই মেয়ে, যার ধ্যাবড়া করে ছাপা রঙিন শরীরে টাইট জাঙিয়া আর কাঁচুলি। স্পষ্ট দেখা যায় মেয়েটির বাহু, উরু, পায়ের গোছ। শরীর কামড়ান ব্রা ছাড়িয়ে ফুটে উঠে বেরিয়ে আসতে চায় তার যৌবন। আর পোস্টারের একদম মাথায়, বাঁ দিকে একটি হাস্যমুখ জোকারের ছবি। সেই ক্লাউনের মাথায় অদ্ভুত এক টুপি। নাকে গোল মতো রঙিন পুলটিস। তার নিচে একদম প্রায় ডানকোণ ঘেঁষে পোস্টারে ছাপা সেই বাঘের হাঁ করা মুখ। অসম্ভব হিংস্র আর জ্বলজ্বলে চোখ, সবটা অবশ্য ঠিক বোঝা যায় না ছাপার গুণে অথবা দোষে। কিন্তু এমন মুখের ভাব নিয়েই হয়ত বা শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। কিংবা আক্রমণ করার আগে গর্জন করে ওঠে। এই পোস্টার ছড়িয়ে দিতে হয় সমস্ত শহরে। কলকাতায় দেওয়ালে দেওয়ালে কিয়স্কে সেঁটে দেওয়ার লোক আছে আলাদা। হাজার বা দশ হাজার পোস্টার মারার কত খরচ—এই হিসেব মতো তারা টাকাও গুনে নেয়। পরে এই মার্ক থ্রি 'অ্যামবাসাডার'-এ চেপে আয়েঙ্গার তার পোস্টারদের ভেসে ওঠা দেখতে বেরয়। সমস্ত শহর ঘুরে, নিজের চোখে দেখে স্যাটিসফায়েড হলে তবেই পেমেন্ট। আর যদি কোনো খিঁচ থাকে, সামান্য সন্দেহের কণা থাকলেও পেমেন্ট নট। তখন যারা পোস্টার মারার দায়িত্বে ছিল, ডেকে পাঠানো হয় তাদের। জিগ্যেস করা হয়, ওখানে পড়ে নি কেন? এখানে থাকল না কেন?

কলকাতার বাইরে এসে গেলে কিন্তু একেবারে উলটোটা। তখন সার্কাসের লোকজনের ওপরই পোস্টার সাঁটার দায়িত্ব দেওয়ালে দেওয়ালে বা সুবিধা মতো অন্য কোথাও। সে কাজ করে সার্কাসের লোকেরাই। মই, আঠার বালতি, পোস্টারের বান্ডিল গাড়িতে চাপিয়ে এখানে ওখানে সর্বত্র। বাজার, হাট, সিনেমা

হল, মদের দোকানের আশপাশে লাগিয়ে দেওয়া হবে এই সব পোস্টার। এমন কি রঙ্কিনী মন্দিরের কাছাকাছি, ঘাটশিলা স্টেশনের গায়ে, বিখ্যাত নিমকি, লাড্ডু, প্যাঁড়ার দোকানের পাশে, দু একটা বাস বা লরির গায়েতেও চট করে আটকে দেওয়া 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর প্রচারপত্র।

তেঁতুল বিচি সেদ্ধ করে, কালো খোসা ফেলে দিয়ে সেই বীজের কাথ দিয়ে তৈরি লেইয়ের সঙ্গে তুঁতে মিশিয়ে পোস্টার লাগান দেখেছে আয়েঙ্গার। এমন কি কাঁচা আটার সামান্য আঠাল ভাব দিয়েও পোস্টার মেরে আসা হত দেওয়ালে দেওয়ালে। কাঁচা আটাতে যে আঠা তাতে চটপট পোকা ধরে। কেটেও দেয় পোকাতে। তুঁতে মেশান তেঁতুল বিচির কাই দিয়ে পোস্টার চেটালে পোকা, পিঁপড়ে কিছুই ধারে ঘেঁষে না। নীলচে নীলচে তুঁতের ক্রিস্টাল পাওয়া যেত বেনের দোকানে—দশকর্মা ভাণ্ডারে। পরে তুঁতের বদলে ন্যাপথলিন গুঁড়ো করে মিশিয়ে নেওয়া হতে লাগল আঠার সঙ্গে। কারণ তুঁতে খেয়ে সুইসাইড কেস বেড়ে যাচ্ছে, এই ঝামেলার ভয়ে অনেকেই আর তুঁতে রাখছে না দোকানে। তো সে যাই হোক। বাইরে গেলে—মানে কলকাতার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সার্কাস পার্টি নিয়ে চলে এলে, তখন এই পোস্টার চেটানর দায়িত্ব ঐ চার বামন—টুপি, লাড্ডু, কাতু আর কুতুর ওপর। গাড়িতে পোস্টারের বান্ডিল, মই, আঠার বালতি। এখন তো আবার হাতে করেও লাগাতে হয় না আঠা। জানলা-দরজা রঙ করার মোটা বুরুশ দিয়ে পোস্টারে উলটো দিকে আঠা লেপতে পারা যায়। যারা এই সব সার্কাসের পোস্টার লাগায়, তারা বেশির ভাগই ব্যবহার করে চওড়া মতো বুরুশ।

সকালে বাজারে গিয়ে ইলিশ মাছ খুঁজেছে টুপি। ঘাটশিলা স্টেশনের কাছেই বাজার। তেমন বড় না হলেও পাওয়া যায় অনেক কিছু। সবজির পাশাপাশি মুরগি, আছে খাসি, মাছও। ব্রয়লার মুরগির সঙ্গে দেশি মোরগ-মুরগি। তাদের গলার জোর কি! বাপরে বাপ, বিশেষ করে দেশি মোরগদের।

কোলাঘাটের ইলিশ আসে এখানে। রূপনারায়ণের ইলিশ। বেশ টাটকা আর কি তার সুন্দর গন্ধ। কাটার সময় ইলিশের গায়ের ভেতরে জড়িয়ে থাকা তেল লেপটে যায় বঁটির ফলায়। তো টুপি তো বরাবরই একটু পেটুক আছে। খাওয়ার কথা, নানা ধরনের খাদ্যের ব্যাপারে ভাবতে ভাবতে তার নোলা আলগা আলগা জলে ভরে আসে ধীরে।

এখনও আসে নি ইলিশ। মাছ বিক্রি করা মানুষটি তার নিজের ভাষায় বলে। পাওয়া যাচ্ছে না জালে।

কোলাঘাট থেকে আসে না এইসব ইলিশ? টুপি জানতে চায়।

তাই তো আসে।

খুব টাটকা?

হুঁ।

আসলে এই মাছঅলারা চেনে টুপিকে। নানা রকম মজা করে তারা সার্কাসের এই জোকারকে নিয়ে। আর এই মজাকরা ব্যাপারে পর কীভাবে যেন একটু একটু করে কমতে থাকে জিনিসের দাম। যেটা কলকাতায় তেমন ভাবে হয় না। ঘাটশিলা বা কলকাতার বাইরে অন্য কোথাও কোথাও শুধু এই চারজন কেন, সার্কাস পার্টির অন্য যে কোনো খেলুড়েই কেমন বেশ একটা ভি ভি আই পি, ভি ভি আই পি ভাব। তাদের আলাদা খাতির আছে।

ঘাটশিলা বাজারে ঢুকে এটা ওটা সেটা দরাদরির পর মুরগি বেচা লোকজনের কাছে এসে টুপি, লাড্ডু হঠাৎই অবিকল দেশি মোরগের গলা নকল করে ঢাকতে থাকে।—কঁকর কঁ কোঁ। কঁকর কঁ কোঁ।

তাদের সেই আচমকা চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বড় ঝোড়ার ভেতর শক্ত সুতোর জালে আটকান রঙ বাহারি দেশি মোরগেরা ঝুটি ফুলিয়ে, পাখনা, ল্যাজ দুলিয়ে ডেকে ওঠে প্রাণপণে। মোরগরা যতবার ডাকে, লাড্ডু, টুপিও ডেকে ওঠে ঠিক ততবার। সে এক দেখার মতো দৃশ্য। শোনার মতো ব্যাপার। সমস্ত ঘাটশিলা বাজার জুড়ে তখন নানা ধরনের হাসি মশকরা।

এমন কি কখনও কখনও বেগুন হাতে তুলে নিয়ে নিজের সঙ্গে মাপামাপি করে লাড্ডু, টুপি, কাতু আর কুতুরা। তার সঙ্গে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, মুখের ভাব, শব্দ। সে না দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না। আর তাদের এইসব রকম সকম দেখে সকলেরই কুলকুলোন হাসি। কবে যেন আঙুলহারা হয়েছিল টুপির। ফুলে যাওয়া সেই আঙুলে কুলি বেগুন ফুটো করে বসিয়ে দিয়েছিল মা। যাতে না রোদ লাগে। কি যন্ত্রণা আঙুলে। তবু তো কমে গেল। মনে পড়ে গেল হঠাৎই বাজারে বেগুন দেখতে দেখতে। একটু বয়স বাড়লে বোধহয় এমনই হয়।

গাড়িটা নিয়ে প্রচারের জন্য হিন্দুস্থান কপারের দিকে গেলে খানিকটা লোকজন পাওয়া যাবে। বিশেষ করে হাটবারে। তখন সেখানে অনেক লোক। এছাড়া মৌভাণ্ডার, জাদুগোড়া, সে সব জায়গাতেও যেতে হবে তেল পুড়িয়ে। এদিকে গালুডি।

তেলের দাম যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে ধাক ধাক করে বাড়ছে, তাতে আয়েঙ্গারকে যথেষ্ট হিসেবি হতে হয় সমস্ত খরচ-খরচার ব্যাপারে। এত বড় দল, তার এত এত লোকজন, জীবজন্তু—তাদের খাওয়া-দাওয়া, মাইনে, মেডিকেল বিল। মাঝে মাঝে বেশ দমবন্ধকর অবস্থা হচ্ছে যেন—এরকম মনে হয় আয়েঙ্গারের।

গাড়ি নিয়ে মৌভাণ্ডারের দিকে যেতে যেতে সার্কাসের চার বামন দেখতে পায় কত কত সবুজ। শাল গাছ, তার নবীন পাতায় পাতায় বৃষ্টির দাগ। কচি শালপাতার আশ্চর্য শ্যামল ছায়ায় মৌভাণ্ডারের অভ্র মাখা চিকচিক করা লালচে মাটি থম মেরে কেমন যেন চুপচাপ শুরু থাকে। তারপর ফুলডুংরি গেলে সেখানে ছোট ছোট

পাহাড়। তেমন উঁচু নয়। পাথর মাটি গাছ পালা মিলে সে যেন এক বাহারি মঞ্চ। যার ওপর উঠে দাঁড়ালে নিজেদের সঙ্গে, হয়ত বা ভগবানের সঙ্গেও অনেক কথা বলা যায়।

সুবর্ণরেখার দিকে চট করে রোদ হেলে যায়। সেখানে চানে গেলে নদীর স্রোত টপকে কালো কালো পাথরে বসে গায়ে জল দেওয়া যেতে পারে হাত দিয়ে দিয়ে। জল সেখানে বেশ ঝকঝকে আর স্বচ্ছ। কালচে পাথরের গায়ে গায়ে সবুজ, শক্ত ডাঁটাঅলা এক রকমের গাছ। কি গাছ? সে অত চেনাচেনির ঝামেলায় যেতে চায় না লাড্ডু, টুপি, কাতু বা কুতুরা। এপার থেকে জল পেরিয়ে সুবর্ণরেখার বুকের ওপর বুনো বাইসনের পিঠ হয়ে জেগে থাকা কালো কালো পাথরে পৌছনর আগে পারের দিকে বালির গায়ে সবুজ সবুজ শ্যাওলা। জলের তলায় ভাসতে থাকা সেই সব থকথকে দামের ফাঁকে ফাঁকে আড়ালে ছোট ছোট কত রকমের মাছ। তাদের বাহার দেখার মতো। টুপি এই সব মাছেদের চেনে। গামছা দিয়ে কয়েকটা গাপপি, অস্ট্রেলিয়ান গাপপি, জেব্রা ফিশ আর রঙবাহারি চাঁদা মাছ নিয়ে গিয়ে রেখেছে একটা শাদা—ঠিক শাদা নয়, জলেরই রঙ যেন এমন কাচের পাঁইটের মধ্যে। খালি পাঁইটের ভেতর জলে ল্যাজে কালো ফুটকি, তার সঙ্গে লম্বাটে বাহারি ল্যাজঅলা গাপপি। তাদের বডি থেকে ল্যাজই যেন বড় মনে হয়। সাঁতার যখন কাটে তখন ল্যাজ দুলতে থাকে জলের ভেতর।

মাছেদের এই সব খেলা মন দিয়ে দেখে টুপি। জলের মধ্যে তাদের নানা কেরদানি দেখতে ভালো লাগে। অনেকটা খাড়াই জমি, লালচে মাটি, শাদা বালি, তারপর বেশ নিচে বয়ে যাওয়া সুবর্ণরেখা। যে রকম হয় আর কি। সুবর্ণরেখায় আসতে গেলে চাষের জমি পড়ে পর পর অনেকখানি। একটা দুটো আলিশান বট নয়ত অশ্বত্থ। অনেক অনেক বছরের পুরনো সেই মহাবৃক্ষের ছায়া ছড়িয়ে থাকে বহু দূর পর্যন্ত। খাড়া পাড় বেয়ে, বালি পেরিয়ে নদীতে নেমে আসতে গেলে ডান দিকে চোখে পড়বে হিন্দুস্থান কপারের চিমনি। কারখানার কত বাতিল জঞ্জাল বহে যায় নদীর বুক বেয়ে। বইতে বইতে নদী আর পারে না যেন। ক্লান্ত হয়ে বলে ওঠে, উফ্! অনেক হল। আর তো টানতে পারছি না বাবা। এবার আমায় ক্ষ্যামা দাও।

নদীর সেই চাপা হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস শুনে দূরে দূরে বট, অশ্বত্থ, আকাশ কেমন যেন আতান্তরে পড়ে। তারপর অনেক, অনেক কষ্টে গোপন করে নিজেদের ভারি শ্বাসের শব্দ। এ ভাবেই সময় গড়ায়। পাড় দিয়ে নেমে এসে বইতে থাকা সুবর্ণরেখার বালির ওপর দাঁড়ালে সামনা সামনি যে ওপার, সেখানেও অনেকটা উঁচু জমি পেরিয়ে মানুষের আসা যাওয়া। সে দিকেই ধীরে সূর্যাস্ত হয়। টুপ করে ডুবে যায় সূর্য। সারা দিনের খেলা- ধুলো শেষ করে, লক্ষ করে দেখেছে টুপি, লাড্ডুরা।

আকাশ তখন কি এক গাঢ়, বিষণ্ণ গোধূলি রঙ মেখে অপেক্ষা করতে থাকে কখন চাঁদ উঠবে। কখন তারারা ফুটবে। লালচে হয়ে থাকা আকাশের গায়ে তখন

কালো পাখিদের অসংখ্য ফুটকি। সেই সব পাখ-পাখালি, রক্তিম সূর্যাস্ত, একটি দুটি ফুটি ফুটি তারা দেখতে দেখতে কত কি মনে হয়। অবশ্য এসব বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ খুব একটা থাকে না টুপিদের। কারণ তখন শো থাকে। আর শো মানেই গাদা-গুচ্ছের ঝঞ্ঝাট, টেনশন, আয়েঙ্গারের বকুনি, সব সময় দুশ্চিন্তার ভারি একটা পাথর যেন চেপে থাকে বুকের ভেতর। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শ্বাস বন্ধ করে সব কিছু করে যেতে হয়। আগের রাতে লুডো খেলার তেমন হিড়িক না থাকলে ভোর ভোর সুবর্ণরেখার পাড়ে এসে দেখেছে টুপি, লাড্ডু, কাতু, কুতুরা ওপার থেকে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে জল ভাঙছে সাধারণ মানুষ। কেউ কেউ ঘাড়ের ওপর সাইকেল তুলে রেখে পেরতে চাইছে নদী। পাশেই হয়ত দু তিনটে মোষ, গরু। গরুদের সাইজ তেমন বড় নয় এখানে। কিন্তু ওপার থেকে তারাও চলে আসে! তাদের সঙ্গে রাখালরাও। পুরুষ মানুষের মতোই হাঁটুর ওপর শাড়ি তুলে সুবর্ণরেখা পার করে মেয়েরা। তাদের চকচকে মাজা উরু, ভেজা ভেজা পায়ের গোছ চোখে ভেসে উঠলে বেশ লাগে। অনেক মেয়েই আসে ওপার থেকে জঙ্গল ভাঙা, কাঠের বোঝা নিয়ে, সেটা বেলা ফুরিয়ে বিকেল পার হয়ে সন্ধে নামার আগে—প্রায় দিনই ভেসে ওঠে এমন ছবি। তবে তা তো রোজ রোজ দেখা সম্ভব নয়। তখন তো শো থাকে। দাহিগোড়ার বড় মাঠে সার্কাসের তাঁবু খাটাতে খাটাতে যেটুকু সময় যায়, তার মধ্যেই এইসব সুবর্ণরেখা দেখাদেখি, এপার ওপার করা লোকজন, গরু, সাইকেল। জলের গায়ে জেগে থাকা কালো পাথরেরা—সবই আসতে থাকে পর পর। আর এই যে কোম্পানির শাদা অ্যামবাসাডার নিয়ে দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাসের হ্যানডবিল বিলোতে বিলোতে এদিক ওদিক যাওয়া—কোথায় ফুলডুংরি, কোথায় মৌভাণ্ডার, জাদুগোড়া, কোথায় রাতমোহানা, ধারাগিরি, কোথায় গালুডি, তার জন্যে গাড়ি বেশ আস্তে আস্তে চালাতে হয়।

এই যে ভাইয়েরা, বোনেরা, মায়েরা, আসুন, দেখুন, ঘাটশিলার অপুর পথের পাশে দাহিগোড়ার মাঠে দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস। আপনার আমার সবার সার্কাস। আসুন দেখুন পরীক্ষা করুন। প্রত্যহ দুটি শো—বেলা তিনটে ও সাড়ে ছটায়। রবিবার ও অন্য ছুটির দিনে তিনটি শো। বেলা বারোটা, সাড়ে তিনটে, সাড়ে ছটা। মেয়েদের বসিবার পৃথক বন্দোবস্ত আছে। সাইকেল, মটোর সাইকেল, গাড়ি রাখার সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। আসুন, দেখুন, ট্রাই করুন।

অ্যামবাসাডার-এর মাথায় উঠে চিৎকার করে করে গলার শির ফোলায় টুপি। কখনও লাড্ডু। তাদের কথা শুনে একটু একটু করে ভিড় জমতে থাকে। ফুলডুংরি আসার আগে কোর্ট চত্বর পেরিয়ে আসতে হয়। সেখানে উকিলবাবুরা মন দিয়ে কথা শোনে, টুপি আর লাড্ডুর। কাচের বেঁটে গ্লাসে চা খেতে খেতে তারা জামিন, রিমান্ড, পি সি, সেশানস, টি আইপ্যারেড, সাক্ষী, আই উইটনেস, চার্জশিট, ফাইনাল রিপোর্ট, হস্টাইল সাক্ষী, পি পি, আই ও, কড়া জজ সাহেব, বেল বনড

বলে যেতে থাকে। এসব নানার কথার ফাঁকে 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর প্রচার গাড়ি দাঁড় করিয়ে লাড্ডু, টুপির মজামারা কাণ্ড, ডিগবাজি, মুখ মচকান, চোখ মারা, প্যারডি গান গাওয়া, বগল বাজিয়ে নানা রকম অপশব্দ—সবই খুব মন লাগিয়ে এনজয় করেন। বিনা পয়সায় সার্কাসের একটা ছোটখাট শো যেন এখানেই হতে থাকে ক্রমশ।

সিগারেট খাবি?

কোনো একজন কালো কোট পরা বাবুর মুখ থেকে এমন কথা শুনতে পেয়ে ঘাড় নাড়ে টুপি। সঙ্গে সঙ্গে লাড্ডু।

হলদে টুপিঅলা ফিলটার সিগারেট আসে। দেশলাই। উকিলবাবুদের কেউ একজন বা অন্য আর কেউ হবে হয়ত, বেশ অনেকটা নিচু হয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিতে গিয়ে ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিতে চায় টুপি, নয়ত লাড্ডুর ঠোঁটে। গালেও হয়ত। কাতু বা কুতুরও একই রকম ব্যবহার জোটে কখনও কখনও। সিগারেটের ধোঁয়া টানা আরামের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যেটুকু মুখবিকৃতি, চমকে ওঠা, তারপর একটা কেমন যেন ভয় ভয় ভাব, আতঙ্ক, সেটা খুব মন লাগিয়ে এনজয় করে ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দিতে চাওয়া লোকজন। চার পাশ থেকে তখন একটা হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা হাসির শব্দ ভেসে আসতে থাকে। বাতাসে তখন গরম লুচি বা কচুরি, পাশাপাশি শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে তৈরি করা আলুর তরকারির খিদে চারান সুবাস।

সেই গন্ধ খুব মন দিয়ে নিজের ভেতরে একদম ভরপুর নিয়ে নিতে চায় টুপি। ভেতরটা অদ্ভুত একটা আনন্দ আর রসে ভরে ওঠে।

ছোট ছোট সেরেস্তা ঘর, তার ভেতর উকিলবাবু, মুহুরিরা। ঘর না বলে খুপরি বলাই বোধহয় ভালো। সেখানে অনবরত খট খট খটা খট শব্দ টাইপরাইটারের, গোদরেজ অথবা রেমিংটন। ডেমি পেপার, কোর্ট পেপার, স্ট্যাম্প পেপার, কত পারসেনট রাখা হবে জামিনের জন্য, বেল বনড, বেল পিটিশান, জামিন হয়ে যাওয়া, বেল না পাওয়া—এসব কথাই ঘুরে ফিরে আসে এই সব খুপরি ঘরে। যেখানে লুচি, কচুরি, রাধাবল্লভি ভাজা হচ্ছে। বড় লোহার কড়াইয়ে ফুটছে তরকারি, তার পাশেই কাচের শো কেসে বড় বড় রসগোল্লা। অ্যালুমিনিয়ামের পরাতে রস ভর্তি। তার মধ্যেই ভেসে ভেসে আছে পানতুয়া, রসগোল্লা। সব দু টাকা, তিন টাকা পিস। পাশে মাখা সন্দেশের ট্রে। এসব দেখে টুপির জিভে আরও বেশি বেশি জল কাটে। বিকেল হতে না হতেই এখানে সিঙারা ভাজা শুরু হয়। পাশে সারাদিনের চা-ফোটা তো চলছেই।

বাঁকুড়ায় 'চিত্তরঞ্জন' নামে একটা খুবই কম মিষ্টি দেওয়া নরম পাকের ছানার সন্দেশ খেয়েছিল টুপি, দলের সঙ্গে গিয়ে। সেও হয়ে গেল কত বছর আগে। মাঝে মাঝে 'চিত্তরঞ্জন'-এর স্বাদ মনে পড়ে। ঘাটশিলা কোর্টের পাশ দিয়ে 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর হ্যানডবিল বেলান গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় থেমে, দাঁড়িয়ে

পড়ে উকিলবাবু, মুহুরিবাবু, পুলিশবাবু—সকলের সঙ্গে খানিকটা দাঁত বার করা মজা দেখাতে দেখাতে হঠাৎ ময়লাটে কাচের শো কেসের ভেতর মাছি লাগা রসগোল্লা, মাখা সন্দেশ, দেখতে দেখতে চিত্তরঞ্জনের কথা মনে পড়তে লাগল টুপির।

উকিল, মুহুরি, পুলিশ—সকলেই মজা নেয় ফোকটে। হাতের ব্যালেনসে লাল মাটির ওপর ডিগবাজি খায় তিন বামন। একজন হাতে হাতে দিতে থাকে হ্যানডবিল। সঙ্গে মুখে বলে যেতে থাকে—আসুন, দেখুন, ট্রাই করুন। জীবজন্তু নিে ভয়ঙ্কর খতরনাক খেলা। না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

সার্কাসের কাগজ নেওয়ার জন্য খানিকটা যেন হুটোপাটাই পড়ে য়ায় কোর্ট চত্বরে।

সবাই কুড়িয়ে নিতে চায় নীল, হলুদ আর হালকা সবুজ কাগজ। প্যাতপ্যাতে খেলো পেপার। তার ওপর ছাপা বেশ কয়েকটা লাইন। পাশে ধ্যাবড়া ছবিতে লোকজন হাসাতে চাওয়া জোকার, একটা বাঘ, একটা সিংহ।

ভাইয়ো অওর সজ্জনো, আইয়ে আইয়ে, দেখিয়ে। টেরাই কিজিয়ে।

মাতাজি, অওর বহেনো, আপলোগ ভি আইয়ে। আপলোগো কো ব্যায়ঠনে কে লিয়ে অলগ বন্দবস্ত হ্যায়। খতরনাক শের, ভাল্লু, হাথি—সবকে সব খেল্ দিখা রহে হ্যায়। আইয়ে আওর দেখিয়ে খুখাংর জানবারোঁ কা সিলসিলা জারি হ্যায়। আপকে ফটফটিয়া, সাইকিল ইয়া গাড়ি কো ভি বাহার রাখনে কা ইসপেশাল ইন্তেজাম হ্যায়। আইয়ে, পধারিয়ে, টিকট খরিদিয়ে অওর দেখিয়ে।

সাথিয়োঁ অওর সজ্জনো, ইয়ে জো শের হ্যায় হামলোগ কা ইয়ে সার্কাস মে, উসকা চমৎকারি কুছ অলগ কিসিমকেই হ্যায়। ইসলিয়ে যো ইয়ে সার্কাস না দেখেগা ও পস্তায়গা জরুর। আখির সোচিয়ে মত। কেয়া সোচনা হ্যায়! পয়সা তো হাতকা ময়েল হ্যায়। আয়গা অওর চলা যায়গা। ইসিলিয়ে সোচিয়ে মত।

সোচিয়ে মত! চলে আইয়ে। চলে আইয়ে।

দাহিগোড়ায় তাঁবু ফেলার দুচার দিন বাদেই সার্কাসের মালিক এসে দলের লোকজনদের নিয়ে বসেছিল তাঁবুর ভেতর।

বিনা ভূমিকায় গলা সামান্য খাকারি দিয়ে শুরু করল আয়েঙ্গার। সবাই রয়েছে তাঁবুর মধ্যেই। তখন বেলা প্রায় দশটা। মাথার ওপর আষাঢ়ের আকাশ, সেখানে কখনও মেঘ, কখনও রোদ্দুর। সেই রোদ দিব্যি রঙিন শামিয়ানা, ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসে দোল খাচ্ছে এর ওর কোলে। হাতে, পায়ে, মাথাতেও।

আয়েঙ্গার বলছে, কী করে টিকিট বিক্রি বাড়ান যায়, সবাই মিলে একটু ভাব। যেভাবে জিনিসের দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে, যে বলার কিচ্ছু নেই।

খেল, আইটেম—দু একটা বাড়ান। কে একজন বলে ভিড়ের মধ্যে থেকে।

কে, কে বললে একথা? জানতে চাইল আয়েঙ্গার। তারপর কোনোরকম উত্তর

না পেয়ে, অর্থাৎ যত জন আছে এই মিটিংয়ে, তাদের ভেতর থেকে কেউ বলল না কে আসলে বলেছে এই কথাটা। ফলে আয়েঙ্গারকেই বলতে হল আবার।

কওন বতায়া ইয়ে বাত আভি বতাও। আয়েঙ্গার একটু যেন তাড়া দিল।

কোনো উত্তর নেই।

ব্যস, হো গ্যায়া বাচ্চু! কই কুছ নাহি কহে রহে হা! আরে সাজেশান দেবে ঠিক আছে। কিন্তু বলতে হবে তো কে বলল।

কি, কে বললে! যাঃ বাবা! কোনো উত্তর নেই দেখছি। সবাই চুপচাপ বসে আছ। আমি কি বাঘ না ভাল্লুক যে টপ করে গিলে নেব, কিংবা কামড়ে দেব। কি হল, কে বললে। যাঃ বাবা! ঠিক আছে বলতে হবে না। তোমাদের কথা আমি শুনে নিলাম। কিন্তু আইটেম বাড়ান যাবে না। বাড়াতে গেলে অসুবিধে আছে অনেক রকম। খেলোয়াড়দের ওপর চাপ পড়বে। নতুন নতুন কম্বিনেশন তৈরি করতে হবে। যাকগে, ছেড়ে দাও ওসব। এখন এসো, সবাই মিলে ভাবি কী করে সেল বাড়ান যায়। বিক্রি না বাড়ালে—

লটারি করলে হয় না।

কে, কে বলল একথা?

কি আশ্চর্য, পরামর্শ দিচ্ছ। কিন্তু কে বলছ, জানাচ্ছ না কিছুতেই। কেন বল তো! এই বলে খানিকটা চুপ করেই রইল আয়েঙ্গার। তারপর বলল, লটারির আইডিয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু তার হ্যাপা আছে অনেক। সেই ম্যাও ধরবে কে? লটারি মানে বিক্রি করা টিকিটের ওপর লটারি করাতে চাও তো! তারপর তার নম্বর ধরে লটারি, সেই তো!

নিজে প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দিচ্ছে আয়েঙ্গার।

লটারি মানেই অনেক ঝামেলা। সেই ঠ্যালা সামলাবে কে! প্রথম প্রথম খুব টিকিট কিনবে লোকজন লটারির প্রাইজের লোভে। দল বেঁধে হুড়মুড়িয়ে আসবে সার্কাসে। সে নয় হল। এল সবাই। রম রম করে বিক্রিও হল টিকিট। কিন্তু তারপর? এই সব টিকিট রাতারাতি যে নকল হবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? এখন ছাপার ব্যাপারটা যে রকম ডেভেলপ করেছে, সেখানে নকল হওয়াই স্বাভাবিক। পুরস্কার পাওয়া টিকিট নিয়ে আসবে অনেকেই। যাদের কাছে নম্বর মেলান টিকিট, মানে আমি বলতে চাইছি একই নম্বরের টিকিট একের বেশি লোকজনের হাতে। সে নিয়ে তর্কাতর্কি, ধাক্কাধাক্কি, মারামারি, তারপর ভাঙচুর শুরু হবে সব শেষে। তখন তো সার্কাসের ক্ষতি। এই সব ঝুঁকি কে আটকাবে? ফলে পরামর্শটা ভালো থাকলেও লটারি করা যাবে না। তাতে অনেক রকম ঝামেলা।

'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর মালিক এস. আয়েঙ্গার একথা বলে দেওয়ার পর বিক্রি করা টিকিটের ওপর লটারি নিয়ে নতুন করে আর কিছু বলার থাকে না। সবাই কান-মাথা চুলকোতে থাকে। কীভাবে রোজগার বাড়ান যায় কোম্পানির

এরকম একটা ভাবনায় যেন ডুবিয়ে দিতে চায় নিজেদের। আয়-পত্তর না বাড়াতে পারলে যদি এক সময় সার্কাস উঠেই যায়, তাহলে তাদেরও তো চাকরি নট। হ্যানড টু মাউথ—দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়াটি সেখানে হবে কী ভাবে! নাকি হওয়া সম্ভব আদৌ। সোনার ডিম দেওয়া হাঁসকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে যেভাবে হোক।

আয়েঙ্গার একা একাই বকবক বক বক করে যেতে থাকেন। এমনিতেই বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে মানুষ অতিরিক্ত কথা বলে। তার ওপর দল নিয়ে টেনশন। দল থাকবে না—যে ভাবে জীবজন্তু নিয়ে কড়া কড়া আইন আসার কথা হচ্ছে—সার্কাসে খেলা দেখান যাবে না পাখি আর জীবজন্তু দিয়ে, এরকম একটা আইনও আসতে চলেছে নাকি—শোনা যাচ্ছে। এই আইন যদি সত্যি সত্যি আসে, তা হলে তো পেটে হাত পড়ে যাবে সার্কাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সকলের। শুধু পেটে হাত বললে বোধহয় কম বলা হবে। যাকে বলে, পেটে লাথি, এতো তাই হবে। সার্কাসের এত জন লোক খাবে কি? রিং মাস্টার, ট্রেনার, ট্রাপিজ গার্ল, জোকার, অন্য খেলা দেখান লোকজন—তারা সব যাবে কোথায়, কোন চুলোয়? পোষা পাখি, বাঘ-সিংহ, চিতা, ভাল্লুক, হাতি, ঘোড়া—এরাই বা খেলা দেখান বন্ধ করে দিলে খাবে কি? সার্কাসের বাঘ-সিংহ, চিতা, ভাল্লুক, হাতি থাকবে কোথায়? বনে গিয়ে এরা কি পারবে খাবার যোগাড় করে খেতে। সম্ভব? বছরের পর বছর ছোট্ট খাঁচায় থেকে, নয়ত শেকল বাঁধা অবস্থায় থাকতে থাকতে, ব্যাটারির চাবুকে আর রিং মাস্টারের চোখ রাঙানি, হাঁকডাকের ভয়ে এরা তো খেলাই দেখিয়ে গেছে শুধু, ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক। এটুকুই তো জানে তারা। এর বাইরে আর তো জানা নেই কিছুই। তাহলে!

এসব কথা নানান টুকরো টুকরো হিসেব ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে মিটিংয়ে।

হাই তোলে কেউ কেউ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে।

প্রায় এক তরফাই কথা বলে যেতে থাকে আয়েঙ্গার।

অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজে।

কোর্টের এদিকে কোম্পানির গাড়িতে প্রচারে আসতে আসতে এসব অনেক কিছু মনে পড়ছে টুপির।

ঘাটশিলার আকাশ বেশ নীল। বর্ষা-মেঘের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। অভ্রমাখা চিকচিকে লাল মাটি এদিক ওদিকে দিব্যি শুষে নিচ্ছে মাথার ওর থেকে নেমে আসা রোদ্দুর।

গাড়ির সঙ্গে ফিট করা মাইকে বাজার চলতি একটা হিট হিন্দি গান পরিত্রাহি চালিয়ে দিয়েছে ড্রাইভার। সেই গানের গুঁড়ো ছড়িয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বাতাসে।

ঘাটশিলা কোর্টে আসার আগে একটা বড় মিছিল টুপি লাড্ডুদের গাড়ি পার করে এগিয়ে গেল।

অলগ ঝাড়খণ্ড দেনে হোগা।

একজন স্লোগান তুলছে। সমস্বরে তাকে সমর্থন করছে সকলে।

হামারা মাঙ পুরা কর। পুরা কর।

হুল ঝাড়খণ্ড।

জয় ঝাড়খণ্ড।

হামারা ঝাড়খণ্ড দেনে হোগা। দেনে হোগা, দেনে হোগা।

অনেক অনেক কালো কালো মানুষ। তাঁদের হাতে তীর-ধনুক, টাঙি, লাঠি। তীর-ধনুককে কাঁড়-বাঁশ বলে পুরুলিয়ায়। সার্কাস দেখাতে গিয়ে ওখান থেকেই জেনেছে টুপি।

নীল আকাশ ভেদ করা তীব্র রোদ এসে পড়েছে এই সব মানুষের মুখে। গলায়, হাতের পেশীতে। রামশিঙা, নাকাড়া, ধমসা, মাদল—খুব জোরে জোরে বাজছে। সঙ্গে রয়েছে ঢাক-ঢোল। সে এক বিশাল শোভাযাত্রা।

হামারা মাঙ ঝাড়খণ্ড। ঝাড়খণ্ড, ঝাড়খণ্ড।

অলগ ঝাড়খণ্ড দেনে হোগা। দেনে হোগা দেনে হোগা।

যো হামসে টকরায় গা/ চুর চুর হো যায়েগা.....।

মিছিলটা এঁকেবেঁকে অনেকক্ষণ ধরে চলেছে। গাড়ি, রিকশা, মানুষ, সাইকেল—সব দাঁড়িয়ে গেছে পর পর। আগে মিছিল যাবে। তারপর সেই জুলুসের পেছন পেছন সবাই। সবুজ রঙের পতাকা উড়ছে। তার ওপর শাদায় ধমসার ছবি আঁকা।

সবুজ পতাকা পত পত পত পত করে উড়ছে সকালের বাতাসে। শুধু পায়ে হেঁটে চলা লোক জনই নয়। মোটর বাইকে চড়া অনেকেই চলেছে এই মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে। তাদের সমস্ত মোটর সাইকেলেই সবুজ পতাকা ফিট করা। মুখে হুল ঝাড়খণ্ডের নারা।

হামারা মাঙ পুরা কর। পুরা কর।

অলগ ঝাড়খণ্ড দেনে হোগা। দেনে হোগা।

যো হামসে টকরায় গা/ চুর চুর হো যায়েগা.....।

জোর জুলুম কা টক্করমে/সংঘর্ষ হামরা নারা হ্যায়...।

মিছিলটা সুবর্ণরেখা হয়েই যেন এঁকেবেঁকে চলেছে পিচ রাস্তার ওপর দিয়ে। তবে একেবারেই জোরে নয়। বেশ আস্তে আস্তে। গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বার করে টুপি দেখল মিছিলে হাঁটা এই সব মানুষের মুখ থেকে একটু একটু করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। সেই সব ঘর্ম বিন্দুর গায়ে রোদ্দুরের ঝিলিমিলি।

এ গাড়ির ড্রাইভার সন্ন্যাসী মাখালের হাত খুবই ভালো। যে কোনো জায়গা দিয়ে, মানে এতটুকুন ফাঁকা পেলে বিষধর সাপের চাইতে বহুগুণ জোরে এঁকেবেঁকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে তার জুড়ি নেই। আবার হাইওয়েতেও মস্ত সন্ন্যাসী। তার হাতের ছোঁয়ায় স্টিয়ারিং তখন ফুসমন্তরে বদলে যাওয়া একেবারেই

অন্য জিনিস। মনে হবে সুপারসোনিক কোনো জেট চালাচ্ছে সন্ন্যাসী। এমনই তার হাতের গুণ। আয়েঙ্গার তো মাঝে মাঝেই মজা করে বলে, ব্যাঙ্ক ডাকাতরা ভাগ্যিস খবর পায়নি সন্ন্যাসীর। পেলে আর দেখতে হত না। এস. মাখাল তখন প্রায় সব ডাকাত দলের কাছেই হিরো। এসব কথা বলবার সময় এস. মাখাল—এই নামটাও বেশ কায়দা করে উচ্চারণ করে আয়েঙ্গার। আসলে সন্ন্যাসী নিজের নাম সই করার সময় অনেক জায়গাতেই খুব বাহার করে লেখে এস. মাখাল। তার সেই ইনিসিয়ালটুকু বেশ চোখে পড়ার মতোই।

সামনে ঝাড়খণ্ডিদের বড় জুলুস। ধামসা, মাদল, কাড়া-নাকাড়া, ঢোল, রামশিঙা বাজিয়ে একটা প্রাচীন ময়ালের গতিতে মিছিল চলেছে। আস্তে আস্তে আস্তে। আষাঢ়ের আকাশ চিরে দেওয়া রোদ্দুরের দাপটে মাথার ওপর তুলে ধরা টাঙি আর বল্লমের ফলা মাঝে মাঝেই অনেকটা যেন বিদ্যুৎ-ঝংকার হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারপাশে। কাঁড়-বাঁশ—তীর-ধনুক আর তেল জলে পাকান বাঁশের লাঠির অহঙ্কারও ফুটে উঠছে মিছিলকারীদের হাতে হাতে।

সন্ন্যাসী দাঁতে দাঁত চেপে একটা মুখখিস্তি করল। খুব চাপা গলায় বলা সেই কথা শুধুই যেন লেগে থাকল তার কানে। এরপর এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে হাত স্টিয়ারিং থেকে সরিয়ে এনে খুব সন্তর্পণে ঠোঁটে বিড়ি বসাল নিজের। তারপর দশ টাকা দামের গ্যাস লাইটারে জ্বালিয়ে নিল বিড়ির মুখ।

আস্তে আস্তে টান দিতে দিতে আগুনটাকে বিড়ির মাথায় সইয়ে নিয়ে তারপর এক রামটান যাকে বলে। সেই টান টানার সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া আর ধোঁয়া, ভেতর থেকে বাইরে।

মিছিলটা শেষ হচ্ছে না কিছুতেই। অনেক অনেক মানুষ। পায়ে হাঁটা, নারা লাগান এমনি পাবলিক যেমন আছে, তেমনই রয়েছে কালো কালো মোটর সাইকেলে সবুজ ঝাণ্ডা লাগান লোকজন। মোটর বাইকে চাপা লোকজনও কম নয়, এই বিশাল মিছিলে।

ঘাটশিলা কোর্টের সামনে উকিলবাবু, মুহুরি, পুলিশদের সামনে সার্কাসের হ্যানডবিল বিলি করার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম ছোটখাট খেলা, চুটকি দেখাতে দেখাতে টুপি, লাড্ডু, কাতু, কুতুরা মিছিলে হঠাৎ আটকে যাওয়া ব্যস্ত মানুষ কেমন করে নাকাল হয় আর সেই বিপদ-ভাসা লোকজনের মুখের রেখা তখন কেমন হয়, সবটাই করে করে দেখাচ্ছে।

চার বামনের এই ধরনের খেলার বাইরে খেলা দেখতে দেখতে জমে যাওয়া ভিড় করা লোকজন তো হেসে লুটোপুটি যাকে বলে। একদম গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে।

এ তো সার্কাসে দেখায় না গো। কে যেন বলল ভিড়ের মধ্য থেকে।

এখানেই বানাল বোধহয়।

মনে তো হচ্ছে তাই।

তা-ই হবে হয়ত।

পাঁচ পাবলিকের এই সব কথা টুপি, লাড্ডু, কাতু আর কুতুদের তেমন বাড়তি কোনো উৎসাহ জোগায় কিনা কে জানে! তবু তারা খেলা দেখাতেই থাকে। নতুন নতুন আইটেম বানায়। ডিগবাজি খায়। নাচে। ভুল সুরে, ভুল ভাল কথায় নিজেদের তৈরি করা প্যারডি গান গেয়ে ওঠে। মুখ দিয়ে নানা রকম অপশব্দ করে। হালকা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, হাত দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ বগল বাজান, কোনো একজনকে নকল করা, যাকে বলা যায় ক্যারিকেচার, সে সবই চলতে থাকে পর পর।

ভিড় করে ঘিরে ধরা লোকজন তো হেসে কুটিপাটি প্রায়।

এ ওর গায়ে দিব্যি হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ে সবাই।

মজা জমতে থাকে। একটু একটু করে গাঁজিয়ে ওঠে মজার রস। গোছা গোছা হ্যানডবিল উড়ে যায় মুহূর্তে। হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি, ওড়িয়া—চার ভাষার লিফলেট। তর তর তর তর করে বোঝা কমে।

নিজেকে নিজেরই ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখাতে দেখাতে টুপি বলে, আমি বাপের বিধবা ছেলে।

জমে থাকা পাবলিক হাসে। টুপির কথা শুনে নয় মুখভঙ্গিতে, কিংবা নিছকই হাসার অভ্যাসে কে জানে।

লাড্ডু দেখায় কেমন করে ইংরেজি আর হিন্দি সিনেমায় বাংলা ডায়ালগ অসম্ভব তাড়াতাড়ি বলে হিরো হিরোয়িনরা ভাব দেখায় যেন তারা কত না হিন্দি আর ইংরেজি বলছে।

এইসব সস্তার আইটেম আর কি। তাই পাবলিক গপ গপ করে খায়। চটাপট চটাপট তালি পড়ে। কেউ কেউ আর এক বার রিপিট করতে বলে একই খেলা। দর্শকদের অনুরোধে বাধ্য হয়েই অনেক সময় ফিরে দেখাতে হয় আগেকার খেলা।

এরই ফাঁকে ফাঁকে বলে যেতে তাকে কাতু—জঙ্গল কা শের ভালু/সার্কাসমে সিঙাড়া কা আলু....। তার কথা শুনে চটাপট চটাপট তালি বেজে ওঠে।

খেলা দেখাতে গিয়ে পরিশ্রম হয়। ঘাম ঝরে। অনেকটা মাদারিরা যেমন করে, তেমনই খোলা জায়গায় তাদের নানান আইটেম।

গাড়িতে ফিট করা মাইকে ডেসিবেলের তোয়াক্কা না করে হুল্লা হু গান বাজায় সন্ন্যাসী মাখাল। বেশির ভাগই হিন্দি সিনেমার গান। বহুদিনের ব্যবহার করা, বার বার ঘষে যাওয়া ক্যাসেটে তেমন করে ফুটে ওঠে না গানের কথা, সুর। তবু বাজিয়ে যেতে হয় সন্ন্যাসীকে।

তারপর একসময় কোত্থেকে কোত্থেকে যেন হাওয়া দিতে থাকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। আকাশের কোণে কালচে মেঘ থানা গাড়ে। এরপর হঠাৎই হু-হু করে ছুটে আসে

হাওয়া। তছনছ হয়ে যেতে থাকে আকাশ। চারপাশ। খানিক দূরে ফুলডুংরির মাথায় বৃষ্টি নামে। তারপর সেই সব জলের কণারা উড়তে উড়তে উড়তে ছড়িয়ে যেতে থাকে ঘাটশিলার কোর্টের মাথায়। ভিজে যায় রাস্তাঘাট। গাছের মাথা, গা। বড় বট গাছের নিচে সেরেস্তা ঘর ভিজতে থাকে। টাইপ রাইটারের খট খটা খট থেমে যায় মুহূর্তে। বৃষ্টির ছাট ঝাঁপিয়ে পড়ে রসগোল্লা সাজান কাজের শো কেসের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় করা পাবলিক মাথা গোঁজার ছায়া খোঁজে গাছের নিচে।

ভেঙে যায় টুপি লাড্ডুদের খেল।

অনেক রাতে সেকেনড শো ভাঙার পর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে টুপি।

ঘুমে জড়ান লাড্ডু খুব আস্তে আস্তে, বিড় বিড় করে—ফুলডুংরি, রাখা মাইনস, মৌভাণ্ডার, জাদুগোড়া, রাতমোহানা।

টুপির স্বপ্নে লাড্ডু থাকে।

আসলে যেখানে দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাসের তাঁবু পড়েছে, সেই অপুর পথের পাশে দাহিগোড়ার বিশাল ময়দানের আরও খানিকটা। ওদিকে বেশ কয়েকটা বড়-সড় আলিশান বাড়ি। বাড়ি না বলে তাদের কাউকে কাউকে ছোট খাট প্রাসাদ বলাই বোধহয় ভালো। সেই সব বাড়ির সিঁড়ি, থাম, চাকর-বাকরদের ঘর—সবই কেমন রাজকীয়। বাড়ির সামনের হাতায় বড় বাগান। বাগানে বিশাল বিশাল গাছ, ফুলের সিজনে ফুল চাষও হয় কোনো কোনো বাড়িতে, যদি মাইনে করা মালী থাকে। আর থেকে যায় বাবুদের শখ। এসব বাড়ির কেয়ারটেকার, মালীরাই সব। তারাই বলতে গেলে প্রায় মালিক হয়ে ভাড়া দিয়ে দেয় হঠাৎ আসা ট্যুরিস্টদের। আট-দশ দিন বা তারও কম। কি আর একটু বেশি সময়ের কড়ার। যখন যেমন সুবিধে।

এরকম অনেক আলিশান হাভেলির সামনেই উঠোনে গভীর ইঁদারা। তার মাথায় কাঠের ঢাকনা, কপিকল, ছোট বালতি বাঁধা থাকে শনের শক্তপোক্ত মোটা দড়িতে। ভূত-জ্যোৎস্নায় সেই কপিকল অনেকটা যেন অনেক অনেক পুরনো হয়ে যাওয়া ফাঁসিকাঠ। এমনকি কপিকলের লোহার ছোট বালতি বাঁধা ভেজা বা আধভেজা দড়িটি চাঁদের আলোয় কেমন যেন অলৌকিক। তার দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না বেশিক্ষণ। গা শির শির করে। জল তুলে আনার ক্ষুদে বালতিটি গায়ে চাঁদ পেয়ে গিয়ে বেশ চকচকে।

পাইনবাবুদের এই বিশাল বাড়ির হাতায় চাঁদের গুঁড়ো পড়ে আছে! মোরাম বেছান পথটি কবেই মোরাম সরে গিয়ে ন্যাড়ামুড়ো। পাশের সবুজ সবুজ ঘাস, জংলা লতা, গাছের থেকে খসে পড়া শুকনো পাতা—সব লটঘট পাকিয়ে গিয়ে জড়ামরি করে কবেই যেন মোরাম চিহ্ন মুছে দিয়েছে। ঘাসের ওপর দিয়ে পায়ে পায়ে চলা পথের সরু দাগ জ্যোৎস্নায় আরও বেশি শাদা, ফ্যাটফ্যাটে।

সেকেনড শোয়ের পর কোনো কোনো দিন লাড্ডুর সঙ্গে টুপি গিয়ে ঢুকে পড়েছে পাইনবাবুদের 'শীতনিবাস'-এ। লোহার ভারি গেট ঠেলে ঢুকতে জং-এর খানিকটা খচর খচর, ক্যাঁচকোঁচ ধাক্কা মারে বাতাসে। তারপর সেই চাঁদনি ছোঁয়া লোহার ফুল, লতা-পাতা। সিংহদরজার পেটের ওপর একটা সিংহমুখও আছে, গম্ভীর—আধঘুমন্ত। তার কেশরে মাথায়, গালে চাঁদের হরির লুট।

গেট রাতে বন্ধ থাকে। কোনো কোনো দিন আধ-ভেজান, মানে ট্যুরিস্টবাবু থাকলে বন্ধ। না হলে কেয়ারটেকার মনসুখ কতটা শুকনো বা ভিজে নেশা করেছে, তার ওপর নির্ভর করে এই সিংহদুয়ারের খোলা বন্ধ থাকা। জলপথে, স্থলপথে—দু রাস্তাতেই মনসুখ সমান এক্সপার্ট। যেদিন যেমন জোটে। মানে জলপুলিশ হলে জলপুলিশ, নইলে ডাঙায় যেমন পাহারাদারি করা যায়, তেমনই।

টুপি, লাড্ডুরা এমনি দিনে সেকেনড শো শেষ করে মাঝে মাঝেই চলে আসে পাইনবাবুদের 'শীতনিবাস'-এ। কেন, 'শীতনিবাস' নাম কেন? না, বাবুরা তো শীতেই আসতেন ঘাটশিলায়, নিজেদের সকল সুরত ফেরাতে। শুধু তো ঘাটশিলা নয়, বাঙালি বড়লোকদের বাড়ি তখন দেওঘর, মধুপুর, জসিডি, গিরিডি, রাজগির, জামতাড়া, গালুডিতেও। পুরি, বেনারস, আর অন্য কোথাও কোথাও বাঙালিদের বাড়ি। মাইনে করা বারোমেসে কেয়ার টেকার, মালী রাখা থাকে। সেইসব বাড়ি, প্রাসাদে বাগান থাকে, বড় বড় গাছ, ইঁদারা। কখনও কখনও ছোটখাট পুকুর। সেও বাড়ির হাতার মধ্যেই।

পাইনবাবুদের শীতনিবাস-এর ইঁদারার জলে পড়ে থাকে ভরা চাঁদ। এখানে একটু বলা ভালো, 'শীতনিবাস' আর বেশি দিন থাকবে না হাওড়ার পাইনবাবুদের। এখনই প্রায় হাতছাড়া গোছের অবস্থা। বারো শরিকের সম্পত্তি মানে তো ভাগের মায়ের গঙ্গা না পাওয়ার অবস্থা। তার ওপর বারো ভূতের জায়গায় চোদ্দ ভূতের মেলা।

মাঝে ব্যাঙ্কের হলিডে হোম হিসেবে ভাড়া খাটছিল 'শীতনিবাস'। সেটা খুব জমেনি। জমেনি বলা এই জন্যে যে সেই হলিডে হোম তো উঠেই গেল। কেয়ার টেকার হিসেবে অবশ্য তখনও ছিল মনসুখ। ব্যাঙ্ক চেয়েছিল এবাড়ি লিজ নিতে। রাজি হন নি হাওড়ার পাইনদের কর্তারা। তাই মাস ভাড়ায় রফা হল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু চালাতে পারল না ব্যাঙ্ক। ছেড়ে দিল। এখন প্রোমোটার খুব ইনটারেস্ট নিয়েছে। টাটার লোক। ঘাটশিলাতেও ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা আছে। শুকদেব সিং আর রোহিত সিং।

ঝাড়খণ্ড রাজ্য আলাদা হয়ে গেলে অবশ্য কে কোথায় থাকবে, হোটেল ব্যবসা কোন খানে গিয়ে দাঁড়াবে, তা নিয়ে ভাবনা আছে শুকদেব আর রোহিতের। দুজনেই বয়েস সবে তিরিশ পেরিয়েছে। আপন চাচাতো ভাই। বাপ-কাকাদেরও ব্যবসা। কয়লার বড় কারবার আছে ওদের। তার সঙ্গে কাঠ, পাথর খাদানের কাজ। অনেক অনেক টাকার রোলিং। কোটি কোটি কোটি।

শুকদেব রোহিতরা শীতনিবাসকে হোটেল বানাবে। একদম মডার্ন হোটেল। কিন্তু বাইরেটা, বাগান, ইঁদারা, গাছ সব থাকবে প্রায় একই রকম। শুধু ভেতরটা বদলে যাবে। এ সি। জেনারেটর। আধুনিক বার অ্যানড রেস্টুরেন্ট। অ্যাকোয়ারিয়াম থেকে টাটকা মাছ বার করে এনে ক্লায়েন্টের অর্ডার মতো কেটে, ভেজে দেওয়া হবে।

এসব কথা মনসুখের কাছ থেকেই শুনতে পায় টুপি, লাড্ডু। পাইনবাবুদের বাগানে গাঁজার নেশা করতে এসে আলাপ মনসুখের সঙ্গে। মাঝে মাঝে টুকচা বোতল। কাতু, কুতুও আসে। 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর চার বামন বসে থাকে মনসুখকে ঘিরে। মাঝে মাঝে মনসুখ গান ধরে—

সারা রাতি জ্বালিয়ে বাতি
বসে ছিলুম না
আর আসবি বলে বলেছিলি
কেন এলি না।

ওর গানে উৎসাহ পেয়ে টুপি নিজের খ্যারখ্যারে গলায় গেয়ে ওঠে—

বাবুদের মেয়েরা বিবি সেজে যায়
আলেয়ার চশমা দিয়ে মিটি মিটি চায়
আহা, মিটি মিটি চায়—

আহা, মিটি মিটি চায় বলে টুপির সঙ্গে গানের ধুয়ো ধরে লাড্ডু। বার বার আসে ঘুরে ফিরে একই কলি—আহা মিটি মিটি চায় ....। আহা মিটি মিটি চায়.....।

একটু পরেই হয়ত ধুয়ো পালটে দিয়ে ওরা গায়—

বাবুদের বিবিরা ভ্যানিটি দুলায়
আলেয়ার চশমা দিয়ে মিটি মিটি চায়
আহা, মিটি মিটি চায় ....।

গানের কলি ঘোরে ফেরে। একটু একটু করে মেশে বাতাসে। এই গান কখনও কখনও হাত ধরে চাঁদের। কখনও কখনও বা ধরে নেয় ঘাড়!

লাড্ডুও কখনও কখনও যেন টুপির গান শুনে বিড় বিড় করে বলতে থাকে—

বড় বড় বাবুদের বড় বড় পেট
লঙ্কায় গিয়ে তারা মাথা করে হেঁট ...

কিসের সঙ্গে কি! পান্তা ভাতে ঘি—। লাড্ডুর কথা শুনে বেশ জোরেই বলে ওঠে টুপি। মাথার ওপর হেসে হেসে ভেসে থাকা চাঁদ টুপির এই খারুয়া মার্কা গলা শুনে কেমন যেন চমকে ওঠে। পাইনবাবুদের শীত নিবাসে গাছের সবুজ সবুজ পাতায় জ্যোৎস্নার শান্তিজল। সেই সব শান্তিবারি মাখা পাতারা মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে হাওয়ায়। তখন তাদের ছায়াও নড়াচড়া করতে থাকে।

কাঠের ঢাকা অল্প সরিয়ে ইঁদারার জলে বালতি ফেলে মনসুখ। পায়খানায় যাবে। রাতে খানিকটা নেশা করার পর টাট্টি যাওয়া তার রোজকার অভ্যেস।

কুয়োয় বালতি পড়লে শব্দ ওঠে—ঝপাৎ।

ঢাকা সরান ইঁদারার কালো জলে চাঁদ খিল খিল করে ওঠে। ঠিক যেন বড়, কালো লোহার কড়াইয়ে টইটম্বুর ফুটন্ত তেলে ভেসে ওঠা শাদা ময়দার ফুলকো লুচি।

মনসুখ বালতি ফেলতেই জলে চাঁদ একদম ছেতরে ভেঙে গেল। সেই সব আলগা আলগা টুকরো একটু একটু করে মিশল যেন কুয়োর জলে।

গামছা পরা মনসুখ আরও একটা ছোট বালতি হাতে এক দিকে সামান্য টাল খেয়ে তার টাট্টিখানার দিকে যেতে থাকলে টুপির মনে হয় দিনের বেলা তো শালা যাও সুবর্ণরেখার পাড়ে, নয়ত ময়দানে, ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে। এখন তোমার যাওয়া টাট্টিখানায়। মাঠে কি সাপের ভয় বেশি? নাকি ইটের গাঁথনির পুরনো পায়খানায় থেকে যায় সাপ? কিছুতেই গোটা ব্যাপারটা ঠিক করে উঠতে পারে না টুপি। তবে মনসুখ আড়ালে চলে গেলে তারা দুজন, লাড্ডু আর টুপি পাইনবাবুদের উঁচু, চ্যাটাল, বারান্দা, মোটা মোটা থাম, বেশ কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়ে আসার পর খানিকটা হেঁটে উঁচু ইঁদারার পাড়ে এসে কিছু একটা করার চেষ্টা করে।

ঘাড় নিচু করে, হাঁটু মুড়ে কুয়োর পাড়ে বসে লাড্ডু। তার আগে অবশ্য অনেকবার বসতে বলে লাড্ডুকে টুপি। তারপর তার পিঠে ভর দিয়ে ঘাড়ে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত খানিকটা কসরত করার পর লাড্ডুর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে উঠে পড়ে টুপি। তারপর সামান্য ঝুঁকে দেখতে থাকে কুয়োর জলের দিকে। তাকে তো উঁকি মারাই বলা যেতে পারে।

টুপির ছায়া পড়েছে কুয়োর জলে। শুধু পড়েই নি, যাকে বলে লুটোপুটি খাচ্ছে। সেই চাঁদের গায়ে নিজের ছায়া দেখতে পেল টুপি।

দেখতে পেল সত্যি সত্যি! নাকি আদৌ দেখা গেল না কিছু? সবটাই কষ্ট-কল্পনা টুপির? কোনোটাই সেভাবে বলা যাচ্ছে না।

টুপির খুব ইচ্ছে হল কুয়োর জলে ভেসে থাকা চাঁদ ঘেঁটে দেয় দু হাতে, কাছে গিয়ে। প্রাচীন ইঁদারার অনেক পুরনো জল তখন তাকে আয় আয়, আয় আয় বলে ডাকছে। টুপির মনে হল ঝপাং করে যদি ঝাঁপ দিয়ে পড়া যায়। ভাবনাটা মাথার ভেতর টোকা দিতেই গভীর কুয়োর পাড়ের আরও কাছে এগিয়ে গেল টুপি। তারপর থেকেই তো তার স্বপ্নের শুরু।

ইঁদারার অন্ধকার মাখা কালো জলে চাঁদ শুয়ে আছে। সেই আঁধার ছাড়িয়ে আলোর অন্য অন্য রেশ খুঁজে পাওয়া বড্ড কঠিন।

নিজের ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়াচ্ছে লাড্ডু। বলছে বার বার, নাম রে। নাম রে। বড্ড লাগছে। অ্যাই শালা, নাম রে ঘাড় থেকে—ব্যাটা সিন্দবাদের ভুত।

টুপি স্বপ্নেও দেখতে পেল পাইনবাবুদের উঠোনে কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে লাড্ডুর ঘাড়ে। লাড্ডুর পা, হাঁটু—সব রীতিমত কাঁপছে।

গোটা শরীরেই থরথরানি নিয়ে লাড্ডু বলছে, এবার নাম। নাম রে শালা। নেমে দাঁড়া।

টুপি বলল, দাঁড়া না। আর একটু চাঁদ দেখেনি। আর একটু।

টুপিকে ঘাড়ে নিয়ে দু হাঁটুর ভরে দাঁড়িয়ে থাকা লাড্ডু বলে উঠল, তাহলে আমি কি দেখব! কাঁচকলা!

আকাশের গায়ে অনেক, অনেক তারা, চাঁদ। কুয়োর কালো জলে চাঁদ আর টুপির ভাঙাচোরা মুখ। সেই মুখের আদল কখনও ডুবছে। কখনও বা উঠছে ভেসে।

স্বপ্নের মধ্যেই অনেক অনেক বছর পার করা পাইনবাবুদের 'শীত নিবাস'-এর ইঁদারাটিকে দেখতে দেখতে কখনও কখনও সিনেমার ক্যামেরায় হয় যেমন, তেমনই অনেকটা যেন বন্ধ, জং ধরা লোহার ভারি গেট, সামনের পথ সরে যেতে যেতে মুছে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া মোরাম পেরতে পেরতে, বুনোলতা, ঘাস, ঝরাপাতা পার করে আবারও ইঁদারার জলেই যেন ভেসে ওঠে সব কিছু। চাঁদের পাশে টুপির মুখ। আবছা, ভাঙাচোরা, এমনকি চাঁদও তো টুকরো টুকরো তখন। সেই সব খণ্ড জোড়া যায় না ফেভিকলে।

চোখের জলে ভাঙা চাঁদের এটা সেটা ওটা জুড়তে জুড়তে স্বপ্নের মধ্যেই কি যেন কি হাতড়ায় টুপি। কতদূর থেকে ভেসে আসে কাগজি লেবুর গন্ধ। চাঁদ হামাগুড়ি দিতে থাকে টুপির মুখে।

দশ

চাঁদের ঘোলা আলোয় চারপাশ ভিজে জবজবে হয়ে আছে। মাঝরাত পেরনর পর চাঁদ এমনিতেই হেলে যায়। তখন তার জ্যোৎস্না লম্বা লম্বা বড় গাছ ছুঁয়ে আরও লম্বাটে ছায়া হয়ে শুয়ে পড়ে মাটিতে। এখানকার মাটির রঙ লাল। কাছাকাছি যে পাহাড় আছে, তা পেরতে তেমন মেহনত করতে হয় না। প্রথম প্রথম অবশ্য কষ্ট হত, পরে অভ্যাস হয়ে গেছে ধীরে ধীরে।

শীতে জঙ্গলে পাতা ঝরে। সেই ঝরা পাতা ভাঙা ডাল, কাঠকুটো কুড়োতে ঢোকে মেয়েরা, বাচ্চারা। এখন জঙ্গলে আদিবাসীর কাঠ কাটা বারণ। কিন্তু কাঠ মাফিয়া বনের মধ্যে সরকারি আলো হুক করে এনে আলো জ্বালিয়ে করাত কল বসিয়ে গাছ কেটে কেটে সাইজ করে লগ বানায়। তারপর গুঁড়ি, কাণ্ড, ডালপালা—সব আলাদা আলাদা করে কাটিয়ে ট্রাক লরি বোঝাই করে। তারপর

বাজারে চলে যায় সেই কাঠ। এটা—মানে কাঠ এভাবে কাটার ব্যাপারটা খুব হয় পাহাড়ের ওপারে, যেখানে আগে বিহার ছিল এখন ঝাড়খণ্ড।

এই ঝাড়খণ্ড নামের আলাদা রাজ্য একেবারেই রুলিং ক্লাসের ক্লিন ঢপ। সমস্তটাই এক আছে। সিস্টেম, সিস্টেমই তো বদলায় নি। এক আছে লোকগুলো—থানা, পুলিশ, দারোগা, কোর্ট, আমলা, মন্ত্রী। এতটুকুন রদবদল হয়নি সেখানে। আমরা হাতে হাতে বন্দুক তুলে নেওয়ার পর—

রাইফেলের নলে, ম্যাগাজিনে, বাঁটে চাঁদের আলো পড়ে তৈরি করেছে আলাদা আলাদা রঙের মায়া। রাতে আউট পোস্টে লোক থাকে। আর্মড গার্ড। আর্মড মানে সত্তরের পাইপ গান চালান আর পেটো বাঁধতে পারা স্লোগান সর্বস্ব রোমান্টিক আবেগের লোকজন নয়। এরা সব ট্রেইনড। যাকে বলে গেরিলা ওয়ার ফেয়ার, মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি ট্যাকটিকস জানা, এক্সপ্লোসিভ বিশেষজ্ঞ লোকজন। আর ডি এক্স, হ্যানড গ্রেনেড, ডিনামাইট, ডিটোনেটর, একে ফিফটি সিকস, একে ফরটি সেভেন, নাইন এম এম পিস্তল, রাইফেল, রিভলভার—সব ধরনের আর্মস চালাতে এরা এক্সপার্ট। আর আছে মাইন।

শীতের ঝকঝকে আকাশে চাঁদটা কোথা থেকে উড়ে আসা চিলতে মেঘের আড়ালে গিয়ে একদম মাইন কভার হয়ে গেল। পুরনো দিনের মাইন যেমন হত। ক্যাপ আছে মাথার ওপর। সেখানে পা পড়লেই ধুড়ুম। বিশাল বিস্ফোরণ। তাতে জান বাঁচলেও দু পা বাঁচান খুবই কঠিন। এখন অবশ্য আরও মডার্ন আরও অনেক বেশি সফিসটিকেটেড মাইন চলে এসেছে বাজারে। আমরা নিজেরাই ক্লেমোর মাইন বানাচ্ছি। ব্যবহার করছি। উড়িয়েও দিচ্ছি।

এসব কথা পর পর মনে পড়ার কথা নয় তার। পড়েও নি হয়ত। কিন্তু গল্প শুরু করতে গেলে লেখক, মানে যিনি লেখেন, তাঁকে খানিকটা হাজর বাজর বকতেই হয়। সেই বকাবকির মধ্যে কোথা দিয়ে যেন বেরিয়ে আসে গল্পের মূল সুতোটি। যেমন তসর বা রেশম তৈরি করার আগে গরম জলে সেদ্ধ করে মারা হয় ভেতরের গুটিপোকাটিকে। তারপর তা থেকে ব্যর করে আনা হতে থাকে, হতেই থাকে তসর-সুতো, মুগা, এণ্ডির সুতো। সিল্কের ধাগা। তার মানে এই কি, কাহিনির বীজকে টিপে মেরে তারপর গল্প ফাঁদার চেষ্টা! যেমন ফুটন্ত জলে তসর বা রেশম গুটি। তারপর তার গা থেকে সুতোর আঁশ ছাড়ান। একই পদ্ধতি কি চালু গল্পের বেলাতেও?

হাতের তালু, পায়ের পাতা শীতে বেশি বেশি ঘামে। কেন এই ঘাম, তার একটা অন্য বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। সেই ঘাম হওয়ার মূল পয়েনট অনেকেরই জানা। কিন্তু রাইফেলের বাঁট অনেকক্ষণ হাতে ধরে থাকলে পর পর হাতের ঘেমো পাতা থেকে সেই রাইফেল বা একে ফিফটি সিকস সরিয়ে ঘাসের ওপর, পাথরের খাঁজে শোয়ালে, কিংবা দীর্ঘ বৃক্ষের গায়ে হেলান দেওয়ালে হাতের মধ্যে সেই গন্ধটা

পাওয়া যায়। যে ঘ্রাণ মিশে থাকে তসর বা রেশম গুটির গায়ে, তখনও সে জ্যান্ত। ভেতরে নড়াচড়া করে প্রাণ। আর দু চার দিন অপেক্ষা করলেই সেই গুটি কেটে বেরিয়ে আসবে প্রজাপতি। তার ডানায় ডানায় তখন পৃথিবীর অনেকগুলো রঙ। হয়ত বা আকাশের, সমুদ্রের, আর অরণ্যেরও কিছু বর্ণালী ছুঁয়ে যায় তার পাখা।

সেই কবে কার রেকর্ড করা একটা গান শোনা ছিল না—'*প্রজাপতি প্রজাপতি পাখনা মেল....*' আধুনিক বাংলা গান। পরের পরের সব লাইন আর মনে নেই সে ভাবে। বরং সেখানে একটু বাদে ছিল একটা লাইন—'*রঙে রঙে রঙমশাল জ্বাল*'। সেটুকু মাথার ভেতর থেকে উঁকি মারল মনের আয়নায়।

সাত-আট জনের একটা স্কোয়াড। দিনের বেলা তাদের চলা ফেরা, মুভমেন্ট একরকম। রাত নামলে সেই কায়দা বদলে গিয়ে পুরোপুরি আলাদা। সেখানে তখন পুরোপুরি মিলিটারি যেন, এমন মেকআপ। অলিভ গ্রিন, নয়ত খাকি উর্দি। প্যানট শার্ট টুপি, মানে মাথার ক্যাপ—সব কিছুই ম্যাচ করে। তার ওপর পিঠে বেশ ওজনদার রুকস্যাক। তার মধ্যে নিজের নিজের সব জিনিস। যেমন রেগুলার ফৌজিদের হয়। জলের বোতল, দড়ি, টর্চ, ছুরি, এক্সপ্লোসিভ। এসপিওনেজের আরও নানান মেটিরিয়াল। তার ওপর রাইফেল, বন্দুক বা একে ফরটি সেভেন, নয়ত একে ফিফটি সিকস। অন্ধ্রে এই আর্মড স্কোয়াডের নামই তো দলম। যা বহন করে চলেছে তেলেঙ্গানার আর্মড পিজেন্টস ট্রাগলের গৌরবজনক ট্রাডিশান। তাই তো আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা পরভিনজি বলেন—

কী বলেন?

হাতিয়ার উঠাও অওর ইয়ে খুনি জমানা কো খতম কর।

কিসান ক্রান্তিকে নিয়ে কিসান মজদুর অওর ছাত্র যুবা পিড়িকে গাঁটবন্ধন জরুরি হ্যায়।

সাংবাদিকরা আমাদের প্রশ্ন করেন, আপনারা কি রেগুলার আর্মি তৈরি করেছেন?

নিশ্চয়ই। সে আর্মি লং মার্চ করছে।

না, মানে সব জায়গাতেই কি আপনাদের রেগুলার রেড আর্মি, আই মিন সংগঠনের স্কোয়াড বা দলম, তাকে যাই বলি না কেন—

মেয়েটিকে কথাব মধ্যে থামিয়ে দি।—আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না।

কতই বা বয়স মেয়েটির বড় জোর কুড়ি বাইশ। সবে গ্র্যাজুয়েশন করেছে। তারপরই হঠাৎ ইনটারন্যাশনাল রিলেশান নিয়ে পড়তে পড়তে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। তার নাম বোধ হয় মধুরিমা।

জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ-র ডাক রাত বাড়লে তীব্র হতে থাকে। মাইনমুখো চাঁদের ঝকঝকে আলোয় তেজি ঝিঁঝিরা এত জোরে গলা সাধে যে কিছু বলার নেই। সে তো ওদের জায়গা ওর গলা ফাটাবেই। এমন কি বাঁকুড়ার সুতানের জঙ্গলে যখন ভ্রাম্যামান আর্মড স্কোয়াড নিয়ে ছিলাম কয়েক দিন বি এস এফ, সি আর পি-র

তাড়া খেয়ে, তখন দুপুর বেলা, এই বড়জোর বেলা বারোটা একটার সময় কি যে ডাক ঝিঁঝির, সে যারা না শুনেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবে না। সেই ক্রিকেট সং শুনতে শুনতে এক এক বার মনে হয় ওরে বাবা, এবার বুঝি মাথার মধ্যে ঢুকে পড়েছে সমস্ত পোকারা। আর তারা এক সঙ্গে দু হাত তুলে নাচছে, গাইছে। সে এক অন্য রকম অভিজ্ঞতা। পরে থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছিল।

বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক মধুরিমা বিশ্বাস। মনে আছে এখনও। সঙ্গের যে ছেলেটি ক্যামেরা চালায়, প্রায় একই বয়সি। দুজনের পোশাকও প্রায় একই ছাঁচে। নীল জিনসের ওপর সুতির ঢোলা, গোল গলা টি শার্ট। মধুরিমারটা কালো। ছেলেটি—তার নাম পরঞ্জয় মুস্তাফি, তারটি হলুদ। হলুদ মানে বেশ নরম হলুদ। চোখে ক্যাট ক্যাট করে লাগে না।

ওদের সঙ্গে আরও একজন ছিল। মানে তিনজন এসেছিল ওরা এক সঙ্গে কলকাতা থেকে। সঙ্গী আর একজনের নাম সাত্তার মল্লিক। চাকরি সূত্রে রয়েছে এই চ্যানেলের সঙ্গে। বড় একটা টাটা সুমো নিয়ে এসেছে ওরা পাঁশকুড়া থেকে। সেটা সাত্তার সমেত থেকে গেল শহরেই। দুজনের বেশি কাউকেই অ্যালাউ করবে না আমাদের অর্গানাইজেশান। তাছাড়া মধুরিমা লোকাল করেসপনডেন্ট। তার সঙ্গে খানিকটা কনট্যাকট, পরিচিতি, বিশ্বাসের ভিত আছে বলেই সেই ইনটারভিউয়ের সুযোগ।

পরঞ্জয় ক্যামেরার লেন্সে লুক থ্রু করতে করতে বলেছে, এবার যাব?

দাঁড়া, আগে চারপাশটা ঠিকঠাক গুছিয়ে নি।

পরঞ্জয় তখন তার ক্যামেরায় চোখ ছুঁয়ে আছে।

গানস সামনে রাখলে আপত্তি নেই তো?

না, না আপত্তি কিসের? আমরা তো আর্মড স্টাগল করতেই নেমেছি। ক্লাস এনিমিদের বিরুদ্ধে ক্লাস স্ট্রাগল। সেটা তো আর বন্দুক ছাড়া সম্ভব নয়। আপনি তো এই সিস্টেমকে বাঁচিয়ে রেখে, আই মিন যে সিস্টেমটা একদম সড়া হুয়া—মনে পচে গলে তার চোদ্দটা বেজে গেছে, তাকে তো জিইয়ে রাখতে পারছেন না।

আপনার ভয়েসটা একটু দেখে নেব।

ও সিওর। হোয়াই নট। পরঞ্জয়, তুই যা—

যেতে পারি তো? পনিটেল দুলিয়ে হলুদ টি শার্ট বলে উঠল।।

আলো ওকে?

ওকে।

না, না মুখে মাফলার ঢাকার দরকার নেই। ওটা ক্যামেরায় যা করার আমরা করে দেব, না, না, মুখ বুঝতে পারবে না। কেউ লোকেট করতে পারবে না আপনাদের প্রোফাইল।

আমি মধুরিমাকে জিগ্যেস করেছিলাম, চেহারা যে আড়ালে থাকবে, তার কোনো গ্যারানটি আছে?

অবশ্যই আছে। আমরা কখনও কোনো কনট্যাকট নষ্ট করি না। কোন ফুলিশ পার্সন ব্রেক করবে এই কনট্যাকট? পাগল না পেট খারাপ?

কম্পোজিশানটা ব্যাপক আসছে। উইথ গানস ফ্রেম করছি। রাইফেল, এস এল আর, একে ফরটি সেভেন এটসেটরা এটসেটরা।

সবটা আনবি। উইদ আউট গান কম্পোজিশান হবে নাকি? বিশেষ করে জাঙ্গল ওয়ারফেয়ারের ব্যাপারে?

ম্যাডাম, আমরা যদি ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে বসি!

সেটা কী ঠিক হবে ভাই! আপনারা বুঝে দেখুন। হাওয়ায় প্রশ্ন ভাসায় মধুরিমা। তার কথায় হয়ত বা খসে পড়ে জঙ্গলের আরও কিছু বুড়ো পাতা। শুকিয়ে যাওয়া পাতার গায়ে লাল মাটির উড়ুক্কু ধুলো।

ক্যামেরা ওকে? জানতে চায় মধুরিমা।

ওক্কে।

লাইট?

ওক্কে।

ঠিক আছে। তাহলে এবার যেতে পারি? জানতে চায় মধুরিমা।

পারিস।

মধুরিমা তার টি ভি চ্যানেলের নাম লেখা মাইক্রোফোন এগিয়ে ধরে মুখের সামনে। তার হাতের তালু আমার হাতের তালু যেমন ঘামে সেরকমই ঘামছে দেখি। বার বার বড় তোয়ালে রুমাল বার করে হাতের চেটো মুছতে থাকে মধুরিমা। তার রুমাল থেকে খুব চড়া পুরুষালি পারফিউমের গন্ধ মিশতে থাকে বাতাসে। আর তার হাতের পাতা থেকে সেই যে চেনা কাঁচা গুটিপোকার গন্ধ যেমনটি পাওয়া যায়, ফুটন্ত জলে সেদ্ধ হওয়ার আগে, তাই উড়ে উড়ে আসে প্রবল বিক্রমে।

হাওড়ার স্কুলে বায়োলজি স্যার উপেনবাবু শুঁয়োপাকা থেকে প্রজাপতি হওয়ার বৃত্তান্ত শোনালেন। জীবন বিজ্ঞান টিচার একদিন স্কুলে নিয়ে এলেন আস্ত গুটিপোকা। তার গায়ে কেমন উজ্জ্বল হলুদ ঢাকনা।

এর ভেতর পোকা আছে।

জ্যান্ত স্যার!

জ্যান্ত মানে একদম জ্যান্ত।

নড়ে চড়ে।

নিশ্চয়ই।

হলুদ গুটিটা নিয়ে আমি অনেকটা কাছে আনি। তখনই তার গা থেকে পেয়ে যাই চেনা গন্ধটা। যেমন কিনা ঘামে ভেজা হাত পা থেকে পাওয়া যায়। হাতের আঙুলের ফাঁকে, পায়ের আঙুলের ফাঁকে। মিষ্টি মিষ্টি ঝিমঝিমে, ভারি—একটু

যেন আঁতুড় আঁতুড় গন্ধও। যেমন কিনা সিজারিয়ান বাচ্চা নিয়ে বড়দি সাতদিন বাদে নার্সিং হোম থেকে ফিরে এলে নতুন জন্মের একটা গন্ধ বাড়ির বাতাসে। তখন বর্ষাকাল। খুব ঝরছে দিন রাত। মুতের কাঁথা, অলিভ অয়েল, এডি ভিটামিন অয়েল, জনসন বেবি পাউডার—সব মিলিয়ে কি এক অপত্য আর স্নেহের মন কেমন করা সুবাস। কোলে নিলে গায়ে নাক ঠেকিয়ে রাখতে হয়।

মা বলতেন, এখন আর আঁতুড় আঁতুড় কি! সে সব গেছে আমাদের ওপর দিয়ে। ছেলে হলে সাত দিন, মেয়েদের বেলা এক মাস। জন্মের আঁতুড় মানে তো সব সময় ছোঁয়া ছানতি বাঁচিয়ে রাখা। খালাস হওয়া পোয়াতির বিছানা সে তো ছুঁলে পরেই চান করতে হবে। তার নাড়ি শুকনোর জন্যে গাওয়া ঘি গরম করে তাতে কালোজিরে আর রসুন দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করার পর সেটা নিয়ম করে দুবেলা খাওয়ান। আর ঝাল ফালের কোনো বালাই নেই রান্নায়। কাঁচা পোয়াতির নাড়ি জ্বলে যাবে শুকনো লঙ্কা খেলে। তাই শুধু দু চারটে গোলমরিচের দানা বড়জোর, ব্যস। আঁতুড় ঘরে মশা তাড়ানর জন্য ধুনোর ধোঁয়া। খোকা নয়ত খুকির হাগা মোতার ন্যাকড়া কেচে টাঙানোর ব্যবস্থা, যদি বর্ষা নামে। আর কদিন পর সবে হওয়া ছেলেটির বা মেয়েটির গায়ে কাঁথা উঠবে। তারও ক দিন পর সরষের বালিশ। তাতে মাথার গোল ভাবটা সুন্দর থাকবে। তালের আঁটির চেহারার তে এঁটে মুণ্ডু হবে না। হবে না চ্যাপটাপানা বাজে মার্কা। ছোটদের গায়ে তখন আঁতুড় ঘরেই মাসি পিসি বেরয়। ছোটো ছোটো অ্যালার্জির দানা যেমন, তেমন হয়। মাসির কাপড়, পিসির কাপড় গায়ে দিলে নাকি সেই র‍্যাশ ভ্যানিশ।

খোকার ছ দিন হলে ষষ্ঠীর দিন বাঙাল বাড়ি বেশ ঘটা। নতুন কাপড়ের গায়ে কাঁচা হলুদে একশো আট বার রাম রাম রাম লিখে তারপর সেই কাপড় বাচ্চার গায়ে ছোঁয়ান। ছ জন বামুনের নেমন্তন্ন সেদিন। বামুনরা সেদিন কাঁসার নতুন ডিশে মিষ্টি পাবেন। সঙ্গে গোটা পান, গোটা সুপুরি, একটা আস্ত পৈতে, নগদ একটা কাঁচা টাকা। তাঁরা পায়ের ধুলো দেবেন কাঁসার নতুন রেকাবিতে। সেই ধুলো মাখানো হবে ছোট্ট খুবি বা খোকার মাথায়। আর ঘটি বাড়ির ষাট ষষ্ঠী-র দিনে আট কড়াই। বাট কড়াই।

আঁতুড় ঘরের বাইরে কুলোর ওপর মোটা লাঠি বাজাতে বাজাতে বলতে থাকে ছোটরা, *আটকড়াই বাট কড়াই ছেলে আছে ভালো/ছেলের বাবা দাড়ি ধরে টানা টানি কর।*

এরকম বার বার তিন বার, চার বার পাঁচ বার....। পুরনো কুলো বাজাতে বাজাতে যাকে বলে একদম ফরদা ফাঁই করে দেওয়া কুলোর গা হাত পা। সোজাসুজি ভুতুড়ি বেরিয়ে গেল কুলোর। তারপর কুলো বাজান শেষ হলে তখন বাচ্চাদের জন্য পোড়া মাটির চ্যাটাল খুরি, নয়ত বাঁশের চ্যাচারিতে তৈরি ছোট চুবড়িতে খই, গুড়ের বাতাসা, মুড়কি, চিনির তৈরি বড়সড়, রঙিন, ফাঁপা ফেনি

বাতাসা, গোটা গোটা সুপুরি। আর বামুনদের জন্য আস্ত পৈতে, দক্ষিণার একটা কাঁচা টাকা। কুলো বাজান খোকারাও পেত দশ নয়া পাঁচ নয়া। খুব বেশি হলে বড় জোর চার আনা। যারা কুলো ভাঙল তারা কখনও কখনও একটু আধটু স্পেশাল। মানে দু একটা গুজিয়া, নয়ত একটা আস্ত দানাদার বাতাসার পাশে উপরি পাওনা হিসেবে।

আসলে মধুরিমার টি ভি চ্যানেলের মাইক্রোফোন ধরে রাখা হাতের তালু থেকে উঠে এল গুটিপোকার গন্ধ। সেই গন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল কত দিনের ছেড়ে আসা আঁতুড় গন্ধ। বড়দির সেই ছেলে এখন বেশ লায়েক। দেখা হলে মাঝে মাঝেই বলে উঠত, কি সব কর তোমরা! ইনকামের চেষ্টা নেই। টাকা না থাকলে কিছু হয় নাকি! টাকা মানেই এনজয়মেন্ট। নতুন নতুন আনন্দ। লেট নাইট। বড়দি আমার থেকে মোটে তিন বছরের বড়। তারপর মেজদি। এরপর আমি। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের আমি তার থেকে বছর কুড়ির ছোট ভাগ্নেটির দিকে তাকাই। ডান কানে ফুটো করে দুল পরার ব্যবস্থা করেছে। চুলের সামনের দিকে কালার হাইলাইট। হাতে অনেক টাকা দামের ঘড়ি। পরনের শার্ট, প্যানট, জুতো—সবই খুব নামি ব্র্যানডের আর বেশ দামি।

ইদানীং অবশ্য দেখা হয় না। তার কারণ হাওড়াই আর যাওয়া হয় না বেশ কয়েক বছর। একজন পেশাদার বিপ্লবীকে তো চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকলে বিপ্লবেরই কাজে। অর্গানাইজেশন তৈরি করা, নতুন নতুন বেল্ট, অ্যাকশানের পরিকল্পনা, অ্যাকশানের পর ঘেরাও দমন কেটে বেরিয়ে যাওয়া, বেস তৈরি করা—সবটাই মাথায় রাখার ব্যাপার আছে।

মধুরিমার থেকে টিভি মাইক্রোফোন গুটিপোকার গন্ধ উড়ে আসে বারবার। আমার মনে পড়ে যায় উপেন স্যারকে জিগ্যেস করেছিলাম, কোথা থেকে পেলেন স্যার গুটিপোকা?

সে পেলাম এক জায়গা থেকে।

স্যারকে বেশি চাপ দেওয়া যায় না। তবু মনের মধ্যে জানতে চাই-এমন একটা ভুড়ভুড়ি। বোকা বোকা মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আছি দেখে স্যার বললেন, শোন, কিনে আনিনি। যেমন কিনা ব্যাঙ, গিনিপিগ, কেঁচো, আরশোলা কিনতে হয় বায়োলজি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য। তারপর তাদের ক্লোরোফর্ম করে অজ্ঞান করিয়ে শাদা মোম বসান ট্রেতে পিন দিয়ে গেঁথে গেঁথে ব্যাঙের চার পা টান টান করে সিজার্স আর স্ক্যালপেল দিয়ে ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্র, জননতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, কেঁচো আর আরশোলা ডিসেকট করে করে তাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিসগুলো দেখা পর পর।

আমার ছোট ভাই হাওড়া স্টেশনে গুডসবাবু তো। ও-ই মাঝে মাঝে আনে এইসব পলু।

তার মানে উপেন স্যারের ভাই, যিনি হাওড়া স্টেশনে রেলের মালবাবু. তিনিই নিয়ে আসেন এই গুটিপোকাদের। কিংবা রেশম গুটি। শাদা অথবা উজ্জ্বল হলুদ যাদের রঙ। গায়ে জ্যান্ত জ্যান্ত গন্ধ। ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারি মাস্টারমশাইয়ের কথা শুনে।

পলু জানিস তো তুঁত গাছে হয়।

সজনে গাছে খুব শুঁয়োপোকা হয় দেখেছি। শিউলি গাছেও। একদম ভরতি শুঁয়ো। কালো, শাদা—দু রকমই হয়। শাদার থেকে কালোর শোঁয়াতে নাকি বিষ বেশি। হাওড়ায় কালো শুঁয়োপোকাদের কেউ কেউ বলে যমরাল। যমরাজ নয়, যমরাল। বানানটা কি জ দিয়ে হবে য-এর বদলে! পরে ভেবে দেখেছি। তবে উত্তর পাইনি কোনো।

উপেন স্যার তাঁর আগের কথাকেই টেনে এনে বলতে থাকেন তুঁত পাতা খায় এই সব পলুরা। তারপর গুটি বাঁধে। খুবই চাষ হয় বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার দিকে। এক এক পোকা ঘিরে এক এক রকমর সুতো। তারপর আরও সব কী কী যেন বলতে থাকেন স্যার রেশম পোকার চাষ নিয়ে।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, ঝাড়খণ্ড, বিহার আর অন্ধ্রের বিপুল এলাকা যে চষে ফেলতে হবে তখন কি জানতাম ছাই!

বাংলা মিডিয়াম স্কুলে জীবন বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে পলু, শূককীট, মূককীট—এরকম কত কি জানতে হয়। জেনে নিয়ে রাখতে হয় মাথার মধ্যে।

সেভেনটিজ-এর সেই যে আন্দোলন, তার সঙ্গে আপনাদের এই দু হাজার দুই তিন বা চারের মুভমেন্টের পার্থক্য কী?

মাইক্রোফোনের সামনে বেশ প্রত্যয় নিয়ে বলি, আসলে কি জানেন তো, সেভেনটিজ-এর মুভমেন্টে অনেক স্যাক্রিফাইস ছিল, আত্মত্যাগের ব্যাপার ছিল। কিন্তু সেটা অনেকটাই মধ্যবিত্ত ওরিয়েনটেড। প্রেসিডেন্সি, স্কটিশচার্চ, শিবপুর বি. ই. কলেজ, যাদবপুর এনজিনিয়ারিং, দুর্গাপুর এনজিনিয়ারিং—এখানকার ক্রিম ছেলেরা সব মুভমেন্টে জয়েন করেছিলেন। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এঁরা সবাই পড়াশুনোয় খুব ভালো, কেরিয়ারও খুব ভালো। যাদের বলা যেতে পারে একদম ক্রিম অফ দ্য সোসাইটি, তাদের তুলে আনল মুভমেন্ট। কিন্তু এই ব্যাপারটার মধ্যে একটা অসুবিধেও হল। ডিক্লাসড হওয়ার মানসিকতা নিয়ে, প্রফেশানাল রেবেলিউশানারি হিসেবে যাঁরা গ্রামে এসেছিলেন ভূমিহীন কৃষকদের নিয়ে সংগঠন গড়বেন বলে, আমি ছোট করছি না কাউকে, তাঁরা কেউ কেউ মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে একেবারেই মুক্তি পাননি। এটা একটা বড় ত্রুটি ছিল। তাঁদের আচারে আচরণে, গায়ের রঙে—সব খানেই বাঙালি মধ্যবিত্তয়ানা। ফলে যতই শ্রদ্ধেয় নেতার নির্দেশ থাক চায়ের দোকানে কখনও বসে গপপো করবে না....

কালো টি শার্ট নিয়ে এবার যেন ঝাঁপিয়ে আরও খানিকটা সামনে চলে এল মধুরিমা—চায়ের দোকান মানে? যে প্রত্যন্ত গ্রামে আপনি কৃষকের জীবনকে বরণ করে নিয়ে ডিক্লাসড হয়ে সংগঠন করতে গেছেন, সেখানে চায়ের দোকান কই আড্ডা মারার মতো?

সে কথায় আসছি। ঠিক সেই দূর প্রত্যন্তর অঞ্চলে হয়ত নেই। কিন্তু শহর বাজারে চায়ের দোকান আছে। সেখানে বসে চা বেগুনি বা ফুলুরি খাওয়া ছেলেটির গায়ের রঙ, কথার উচ্চারণ, চুলের ভাঁজ—কিছুই তো মেলে না ওখানকার মাটির সঙ্গে। ফলে দ্রুত চোখ পড়ে যায় জোতদারের লোকজন, অন্য পলিটিক্যাল ফোর্স, থানার ইনফরমার— তারপর যদি একটা অ্যাকশান হয় তখন তো কথাই নেই। সবাই ভয়ঙ্কর অ্যালার্ট। জোতদার নয়ত ধনী চাষী বা পুলিশের এজেনটের ওপর অ্যাটেম। হয় ফিনিশ, নয়ত আধমরা। খতম বা আধা খতম—যাই হোক না কেন, তখন তো টনক নড়ে গেছে। সর্বত্র রেড অ্যালার্ট, নাকাবন্দি। গ্রাম ঘিরে কুম্বিং অপারেশান। সি আর পি, মিলিটারি, পুলিশ তো ছিলই। আর থাকত ই এফ আর—

আপনি সেভেনটিজ-এর কথা বলছেন?

অফ কোর্স। সেভেনটিজ-এর গোড়ার কথা। মানে ইমারজেন্সি চালু করার আগে পর্যন্ত। তারপর তো সব ছিটকে ছেতরে গেল।

কিন্তু মাগুরজান, রূপসকুণ্ডী—রাইফেল ছিনতাই। পুলিশ ফাঁড়ি অ্যাটাক করে রাইফেল ছিনতাই করা হল। চারু মজুমদার বললেন, গণমুক্তি ফৌজ তৈরি হয়ে গেছে। ভূমিহীন কৃষক হাজার হাজার বছরের শোষণের জোয়াল কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে—

ম্যাডাম, আপনি বোধহয় সেভেনটিজ-এর লিটারেচার, মানে 'দেশব্রতী', 'লিবারেশান'—এইসব পড়ে কথা বলছেন।

তা হয়ত খানিকটা, পুরোপুরি সবটা নয়, কিন্তু কিছু তথ্যানুসন্ধান, আই মিন ফিল্ড ওয়ার্ক তো আমাকে করতেই হয়েছে। ফিল্ড ওয়ার্ক ছাড়া কিছু হয় নাকি!

বাঁ হাতের তালুতে চুন মেশান তামাক কুচি ডলতে ডলতে মুখের মধ্যে ফেলার আগে আরও একবার আকাশের দিকে চোখ চলে গেলে দেখতে পাই শীতের আকাশ যে রকম হয়, তেমনই ঝকঝকে ধোঁয়াহীন আর সুন্দর।

খুব সকালে ওরা এসেছে ক্যামেরা, যন্ত্রপাতি নিয়ে। তার আগেই খবর দেওয়া ছিল। যোগাযোগ করেছিল আমাদের ওরা সঙ্গে সংগঠনের সোর্স মারফত। কাল রাতে পুবে চাঁদ হেলে গেলে শেষ রাতে জঙ্গলের মধ্যে তৈরি করা প্লাস্টিক ছাউনির টেনটে চাঁদের বিদায়ী আলো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। বনের মধ্যে জমে থাকা শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কখনও কখন কিছু একটা দৌড়ে চলে যাওয়ার শব্দ। তেমন করে ঘুম তো লেগে থাকে না দুচোখে, সতর্ক থাকতে হয়। পাশে রাইফেল, গুলির কেস। বুলেট ভর্তি ম্যাগাজিন, একে ফিফটি সিকস।

খৈনির ধুলো ঝাড়ছি। ফুঁ দিয়ে আলগা চুন, তামাক পাতা উড়িয়ে দেওয়ার আগে মুখ, চোখ সরিয়ে নিল মধুরিমা। হাত পাতল ফোটোগ্রাফারটি। খৈনির ভাগ চাইছে।

আঃ! পরঞ্জয়, তুই না—

পরঞ্জয় নামের হলুদ গেঞ্জি আমার বাঁ হাত থেকে নিজের ডান হাত পেতে খৈনি নিতে নিতে হালকা করে দোলাল নিজের পনিটেল। ওর নীল জিনসে শীতের রক্তিম ধুলোবাহার।

গালে খৈনির টোপলা করে ক্যামেরায় আবার লুক থ্রু করল পরঞ্জয়। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ত। আমার পুরনো কলেজ। কি করে যে হাওড়ার বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুল থেকে এসে জেভিয়ার্সে চানস পেলাম। তখন অবশ্য ডেল্লি বোর্ডওলাদের এত দাপট ছিল না।

যা বলছিলাম, মধুরিমা আবার তার পুরনো কথার গায়ে কথা বসাতে চাইল।

আমি কি যাব? পরঞ্জয় জানতে চাইল।

চল।

মানে সব ঠিক আছে তো?

ঠিকই তো আছে। নো প্রবলেম।

আমি বলছিলাম, পরঞ্জয়কে আগের বাক্যটি বলে পরের কথা আমার দিকে বলল মধুরিমা। মানে বলতে চাইছি সেভেনটিজ-এর আর্মড স্ট্রাগল অনেকটাই মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক হয়ে গেল। প্রেসিডেনসিয়ান—মানে প্রেসির ছেলে-মেয়ে মূলত ছেলেরাই, বি. ই কলেজ, যাদবপুরের ছেলেরা—

এই আরবান মিডল ক্লাস অ্যাগরেরিয়ান স্ট্রাগলে যোগ দিল বা যোগ দিতে চাইল, কিন্তু...

সেই কিন্তুটাই তো জানতে চাইছি আপনার মুখ থেকে।

এটা কোনো ক্রিটিসিজম বা ব্যাক বাইটিং নয়। যেটুকু আমার অভিজ্ঞতা, তাতে বলছি সেভেনটিজ-এ অনেক পরের দিকে—বলতে গেলে স্ট্রাগলের শেষ সময়ে যে ট্রাইবালরা—আই মিন সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, লোধা, খেড়িয়া, শবর, ওঁরাও—এরকম যাঁরা আছেন, যাঁদের ঘাড়ে সামন্ত শাসনের জোয়াল সব চেয়ে বেশি করে চেপে আছে তাঁরা এই স্ট্রাগলটাকে ধবে নিলেন। অর্থাৎ ওঁদের লড়াইটা লড়ছেন ওঁরাই। বাবুরা, শহর থেকে আসা প্রফেশানাল রেভেলিউশানারিরা লড়ে দিচ্ছেন না। দেখবেন আমাদের সংগঠনে টুডু, মাঝি, সোরেন, হাঁসদা, কিসকু, শবর, মুণ্ডা এই পদবির মানুষরা অনেক অনেক বেশি এসেছেন শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানর জন্যে। এটা কিন্তু সেভেনটিজে ছিল না।

একেবারে ছিল না কি?

হয়ত একেবারেই ছিল না—এটা বলা নেহাতই বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, কিন্তু যতটুকু যা হয়েছিল তখন, মানে যাদের আন্দোলন, তাদের অংশগ্রহণ—ডিরেক্ট

পার্টিসিপেশান সেটা পশ্চিমবাংলায় যত না হয়েছে, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি হয়েছে বিহারে, ওড়িশায়, অন্ধ্রে। আদিবাসী মানুষ উইথ র‍্যাডিকাল পলিটিকস বন্দুক ও তীর ধনুক উঠিয়ে নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে একেবারে এই আন্দোলনের প্রায় শেষ পর্যায়ে।

তার মানে আপনাদের যে কর্মপদ্ধতি, তার সঙ্গে সেভেনটিজের কাজকর্মের নিশ্চয়ই অনেক ফারাক।

অবশ্যই। আমি কারও আত্মদানকে ছোট করছি না, অসম্মান করছি না। এখানে আমি না বলে অবশ্য আমরা বলাই শ্রেয়। আমরা বলতে আমাদের অর্গানাইজেশান, সেখানে আমরা দেখেছি স্টেট মেশিনারি সাংঘাতিক পাওয়ারফুল। তার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত। সেভেনটিজে যে টেকনোলজির অ্যাডভানসমেনটের কথা ভাবাই যেত না। তখন পুলিশ মিলিটারি, সি আর পি, বি এস এফ, ই এফ আর-এর হাতে ওয়ারলেস সেট। এখন তো পকেটে পকেটে মোবাইল। দূরে যাবে—রোমিং করিয়ে নিলেই হল। সিগন্যাল ব্যবস্থা জোরদার থেকে আরও জোরদার হচ্ছে ক্রমে।

আপনারাও কি ওয়ারলেস সেট, ওয়াকিটকি—

হ্যাঁ, করছি। ব্যবহার করছি। একে ফরটি সেভেন আটকাতে পালটা একে ফরটি সেভেন। একে ফিফটি সিকসের বদলে বা বলতে পারেন তাকে প্রতিরোধ করতে পালটা একে ফিফটি সিকস। নাইন এম এম কে রেজিস্ট করতে নাইন এম এম। শুধু আবেগ আর পাইপগান দিয়ে রেজিস্ট্যানস গড়ে তোলায় আমরা বিশ্বাস করি না।

কিন্তু ভিয়েতনামে—

হ্যাঁ, তাঁরা পেরেছিলেন কমরেড হো-র নেতৃত্বে। কিন্তু দেখুন, সেখানেও একটা কনটিনিউ সাপ্লাই লাইন ছিল। আর্মস সাপ্লাই লাইন। চীন এবং সোভিয়েত—নিজেদের সমস্ত রকম কন্ট্রাড্রিকশানস, ঝামেলা শিকেয় তুলে রেখে। এমনকি উসুরি নদীর ধারে তখনকার সোভিয়েত লাল ফৌজ আর চাইনিজ রেড আর্মি যে আই বল টু আই বল—একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তখনও কিন্তু ভিয়েতনাম গেরিলাদের জন্য সোভিয়েতের অস্ত্র, বারুদ, গুলি, রসদ—সব যাচ্ছে চীনের ভেতর দিয়ে। তার আগে অবশ্য চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল আমেরিকান সেভেনথ ফ্লিট, সপ্তম নৌবহরকে জল দেওয়া। সে যাই হোক, চীন কিন্তু অ্যালাউ করেছে সোভিয়েত সাপ্লাই ভিয়েতনামের গেরিলাদের জন্য। নর্থ ভিয়েতনামের রেগুলার আর্মির জন্য।

আপনাদের এরকম কোনো সাপ্লাই লাইন।

নো কমেন্টস। তবে এটুকু বলতে পারি ইন্টারন্যাশানাল সিচুয়েশান তো এখন একেবারেই অন্যরকম—সেই অর্থে তো সোসালিজমের কোনো সেনটার এখন আর নেই।

শুনেছি একটা করিডোর নাকি আপনারা বানিয়েছেন আপনারা, মানে আপনাদের মুখপত্র, আই মিন অরগ্যান-এ বেরিয়েছে ডিটেল ম্যাপ ট্যাপ দিয়ে নেপালের যে মাওয়িস্ট মুভমেন্ট, তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখা—একদম ইউ পি, দণ্ডকারণ্য, বস্তার, অন্ধ্র, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড হয়ে পশ্চিমবাংলায়—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, খানিকটা হুগলি। এর অনেকটাই নাকি লিবারেটেড জোন। সেখানে আপনাদেরই রাজ চলে, প্যারালাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশান—

প্যারালাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে কথা আপনি বলছেন, সেটা ঠিকই আছে। ওটা চলছে বহুদিন। অন্ধ্রে, বিহারে—বিশেষ করে মধ্য বিহারে, ঝাড়খণ্ডের বহু জায়গায়, বস্তার, দণ্ডকারণ্যে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশানই চলছে। রেগুলার আর্মি—পিপলস লিবারেশান আর্মি মার্চ করছে সেখানে। অন্ধ্রের কাঠ মাফিয়া, তেন্দুপাতার—মানে বিড়ি যারা তৈরি করে তাদের মূল লিফটা যোগান দেওয়ার যে মজুরি ছিল, তাকে আমরা বাড়িয়েছি থ্রু মুভমেন্ট। এর জন্য অনেক খেসারত দিতে হয়েছে আমাদের। শহিদ হয়েছেন আমাদের কমরেডরা। জেলে গেছেন। জঙ্গল মাফিয়া, তেন্দুপাতার ব্যবসায়ীরা শেষ পর্যন্ত মাথা নুইয়েছে। হার মেনেছে। রাজি হয়েছে আমাদের শর্তে।

সেখানেও অভিযোগ আছে আপনাদের সম্বন্ধে--কোথাও কোথাও গোপনে আপনারা নাকি অ্যালায়েনস করেছেন কাঠ মাফিয়া আর তেন্দুপাতার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। মানে আপনারা তোলা হিসেবে টাকাটা নেন—

কথাটায় তীব্র আপত্তি আছে আমার। তোলা তুলতে থাকা বলতে আপনি কি বোঝেন! আমরা তো মস্তান বাহিনী নই যে তোলা তুলব। কিন্তু হ্যাঁ, অর্গানাইজেশান চালাতে গেলে অনেক অনেক টাকা লাগে। আর্মস, অ্যামিউনেশান, ফুড, ড্রেস—

আপনারা শুনেছি পুলিশ, মিলিটারির ড্রেস, জুতো, টুপি কিনে জঙ্গলে পাঠান?

নো কমেন্টস। এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।

বাজার থেকে এত এত পোশাক, জুতো কিনে জঙ্গলে পাঠান কিভাবে গেরিলাদের কাছে?

এই প্রশ্নের জবাবও আমি দেব না।

ওকে।

ভায়োলেন্স বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি—

আমরা ভায়োলেন্স সমর্থন করি। রাষ্ট্র যখন জোর করে ভায়োলেন্স চাপিয়ে দেয় আমাদের ওপর, তখন বাধ্য হয়ে আমরাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

কিন্তু আপনারা তো চাইছেন এই স্টেট মেশিনারিকে থ্রু আর্মড স্ট্রাগল উচ্ছেদ করে, একটা নতুন সিস্টেম আনতে।

অবভিয়াসলি। চাইছিই তো। এ ব্যাপারে কোনোই লুকোছাপা নেই আমাদের। বরং আমরা এ ব্যাপারে খুবই স্পষ্টবাদী। আমরা চাই এই যে শোষণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, তাকে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলে দিতে।

তাহলে রাষ্ট্র তো রিট্যালিয়েট করবে। মানে আই মিন রাষ্ট্রও তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে। রাষ্ট্র—মানে স্টেট পাওয়ার তো আসলে একটা অন্ধ শক্তি। পুলিশ, মিলিটারি, সীমান্ত, কাঁটাতার, আইন, বিচার, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, জেলে—সবই তো তার হাতের মধ্যে। তো আপনারা যদি সেই মহাশক্তিধর সিস্টেমকে আক্রমণ করেন, তাকে উচ্ছেদ করতে চান, তাহলে সিস্টেম তো বদলা নেবেই। আর রাজ-শক্তির রিভেঞ্জ বড়ই ভয়ংকর। তার আক্রমণ—এখানে আমরা হয়ত প্রতি আক্রমণ শব্দটাও ব্যবহার করতে পারি, কারণ স্টেট তো একটা সিস্টেম। সেই সিস্টেম চালায় একটা মেশিনারি। আপনারা তো সেই মেশিনারিকেই অ্যাটাক করেছেন। ফলে সিস্টেম তো আপনাকে অ্যাটাক করবেই। আর যখন এই আক্রমণ—যাকে আপনারা ঘেরাও, দমন, রাষ্ট্রের প্রতিহিংসা বলছেন, নেমে আসবে আপনাদের ওপরে তখন যদি আপনারা তাকে আটকাতে না পারেন আর সঙ্গে সঙ্গে 'মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে' বলে চিৎকার করতে থাকেন, সেই সময় কি গোটা ব্যাপারটা খানিকটা হালকা হয়ে যায় না?

এই প্রশ্নে মুখে আলাদা কোনো ভাঁজ পড়ল না তার। বরং একটু হেসে, সামান্যতম উত্তেজিত না হয়েই জবাব দিল, দেখুন—এটা হচ্ছে ফিলসফি অফ ওয়ার। হোল মার্কসিজমই বলতে গেলে তাই। অর্থাৎ যুদ্ধ। আমরা রাষ্ট্রকে আঘাত করছি। মানে রাষ্ট্রের সিস্টেমকে আঘাত করছি, রাষ্ট্রও পালটা আঘাত করছে আমাদের। কিন্তু যুদ্ধেরও তো একটা এথিকস আছে।

না, সেটা বোধহয় নেই। আমি ইনটারাপট করছি আপনার কথায়। এই কথাটুকু অফ দ্য রেকর্ড বলি, আপনাদের মারছে পুলিশ, মিলিটারি, বি এফ এফ—তাতে আমাদের কোনো সমর্থন নেই। কিন্তু আপনারাও তো মাইন বসিয়ে পুলিশের জিপগাড়ি, ভ্যান উড়িয়ে দিচ্ছেন। মারা যাচ্ছেন নিরীহ পুলিশ কর্মচারী।

কে বলেছে, সবাই নিরীহ! বান্দোয়ানে যে মাইন ব্লাস্ট করিয়েছে আমাদের সংগঠন, তাতে যে ও সি মারা যায় সে ভয়ানক অত্যাচারী ছিল। তাকে মারতে গিয়ে কয়েকজন আপাত নির্দোষ পুলিশ কর্মী মারা গেছেন। এটা নিয়ে নিশ্চয়ই সমালোচনা হবে। কিন্তু আমরা যেটা বলছি, আমরা তো সিস্টেমের বিরুদ্ধে। এই সিস্টেমটাকে ভাঙতে চাই। তাই আমাদের সামনে সিস্টেমের রক্ষাকর্তা হিসেবে যা যা বাধার প্রাচীর আসে, তার সবটাই উপড়ে তুলে ফেলি। বা তুলে ফেলতে চাই।

পাশে ফটাফট করে খৈনি ঝাড়ছে একটি ছেলে। ইন্টারভিউ নেওয়ার মাইক্রোফোন না সরিয়েই মধুরিমা তার মুখখানাকে একপাশে সামান্য ঘুরিয়ে

রাখল। সিগারেট তবু সহ্য হয়, কিন্তু এই চুন-তামাকের গুঁড়ো, ওফ অসহ্য। ফট ফট ফটর ফট করে খৈনি ঝাড়াঝাড়ি। বাঁ হাতে রেখে ডান হাত দিয়ে পেষা—সবটাই কেমন যেন অস্থির অস্থির আর অসহনীয় মনে হয়।

দূরে কোথায় যেন পাখি ডাকছে। একদম না থেমে—একটানা। কি পাখি কে জানে! এই জঙ্গলে কত রকমের পাখিই তো আছে। তাদের কারও ডাক, সবটা তো চেনা সম্ভব নয়। শহর, আধা-শহরে আর কতটুকু রাখে পাখির খবর। সেই তো কাক, চড়াই, বড়জোর শালিক, গাংশালিক—ব্যস। দু এক পিস দোয়েল বা বুলবুলি হলে তো রাজ্য জয় হয়ে গেল একেবারে যাকে বলে।

নিজের কাঁধ ব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই বার করল মধুরিমা। এটাও ছাড়তে হবে। খুবই হার্মফুল এই টোব্যাকো। কিন্তু টেনশনের কাজ থাকলে তখন স্মোকিং খানিকটা যেন আশ্রয় আর আরাম দেয়। সেই সময়টুকুর যে চাপ, তাকে আড়াল করেও খানিকটা। কিন্তু তাতে তো সিগারেট বেড়ে যায়। একটার পর একটা সিগারেট। চট করে তখন তার হিসেব রাখাও মুশকিল।

আমি যদি একটা সিগারেট খাই—

নিশ্চয়ই। আপত্তি নেই।

না, সেভাবে পারমিশান নিইনি। কিন্তু আপনি তো ধোঁয়া না খেলেও আই মিন স্মোক না করলেও দেখলাম চুন মেশান র তামাক চিবোচ্ছেন। সেটাও কিন্তু কিছু কম হার্ম ফুল নয়। প্রথমে আমি আপনাকে নন স্মোকার ভেবে সিগারেট ধরাইনি। পাছে প্যাসিভ স্মোকিং-এ অন্য ধরনের কোনো ক্ষতি—

না, না ধরান না। তাতে কি আছে? একথা বলেই হয়ত আনমনা হয়ে গেল মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলা লোকটি। কান খাড়া করে কি যেন শোনার চেষ্টা করতে লাগল বার বার।

সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে লাইটারে তার মুখাগ্নি করার আগেই মধুরিমা খানিকটা যেন চুপ হয়ে গেল।

পাখিটা ডেকেই যাচ্ছে। ডেকেই যাচ্ছে। একটানা, তীক্ষ্ণ সেই কলতান।

তবে কি কোনো সংকেত। কোনো বিপদের গন্ধ পেয়েছে আরও অনেক দূরে পাহারায় থাকা সেই তিন বা চার জন, যারা জঙ্গলের বড় বড় গাছের আড়ালে নিজেদের খানিকটা বুঝি গোপনই রেখেছিল। তবু তাদের জলপাহ উর্দির আভাস, রাইফেলের ইস্পাত কঠিন নলে শীতের বোদের আশ্চর্য ফুলকারি, কঠিন মুখ, তীক্ষ্ণ ঝকঝকে চোখের আবছা এক ঝলক—সবটুকুই তো মোটর বাইকে অনেকটা এসে তারপর অচেনা হাঁটাপথ। চোখে কালো কাপড়ের পট্টি বাঁধা অবস্থায় অনেকটা পথ হাঁটা। ইনটারভিউ করতে যাওয়া তো নয়। এ সময় তো নিজেদের কেমন যে পণবন্দি পণবন্দি মনে হয়, অকারণেই।

পাখির ডাকটা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। বাঁ হাত বাড়িয়ে অভ্যাসে খৈনি দিতে দিতে আবারও চুপ করে মাথা নিচু করে থাকা মানুষটাকে দেখে মধুরিমার মনেই হয়,

এর মাথার দাম এক লক্ষ টাকা। মাথা ভর্তি কালো চুল। একটু বড়ই। বাকিরা যে দু তিন জন আশে পাশে পজিশান নিয়ে আছে, কিংবা খুব কাছে বসে, দাঁড়িয়ে হাতিয়ারদের দেখভাল করছে যে তার মাথাতেও একদম ফৌজি কাটিং। যাকে বলে মাথার চামড়া ঘেঁষে চুল ছাঁটা।

আমাকে একটা দে তো। নীরবতা প্রথম ভাঙল পরঞ্জই। এই এক দোষ পরঞ্জয়ের। সব রকম নেশা করবে। কিন্তু কোনোটাই নিজে রাখবে না। সব সময় হাত বাড়িয়ে দেবে। খুবই ক্যাজুয়ালি, যেন কিছুই হয় নি। এটা ওর প্রাপ্য।

কোনো কথা না বলে মধুরিমা সিগারেট এগিয়ে দিল পরঞ্জয়ের দিকে। তারপর না চাইতেই লাইটার।

পাখিটা তখনও ডেকে যাচ্ছে। এ কি তবে সংকেত! বিপদ সংকেত কোনো? রাষ্ট্রের কোনো পাল্টা অ্যামবুশ অভিযান। গোটা অ্যাকশানটাই কি গুটিয়ে আনছে তারা? ঋত্বিক কুমার ঘটকের যুক্তি তক্কো আর গপ্পোর শেষ দৃশ্য যেমন। মদ্যপান করা নীলকণ্ঠ বাগচী। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন, ট্রটস্কিকে নিয়ে অনেক অনেক কথা, দীর্ঘ সংলাপ তাঁর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা র‍্যাডিক্যালদের সঙ্গে। তারপরই শেষ রাত থেকে রাষ্ট্রের আক্রমণ। খাকি উর্দি। অবিরাম গুলি ও পাল্টা গুলি বর্ষণ। অবশেষে নীলকণ্ঠ বাগচীর মৃত্যু। তখন প্রায় ভোর কিংবা ভোর। বাংলা মদে নিজের নিয়তিকেও হয়ত বা ধুয়ে দিতে চেয়েছিলেন ঋত্বিক। কিন্তু এখন, ঠিক এই মুহূর্তে এরকম যদি কোনো অ্যাকশান হয়, সেই দনাদ্দন দনাদ্দন ছুটে আসে সিসের বুলেট। ট্যা-রা-রা-রা করে ডেকে ওঠে একে ফরটি সেভেন বা একে ফিফটি সিকস। কি বি এস এফ যদি মর্টার দাগে। কিছুই তো বলা যায় না। আত্মগোপনকারী বিরোধীদের খুঁজে বার করতে রাষ্ট্র তো কত কি করে।

সিগারেটে খুব আলতো আলতো টান দিতে দিতে মধুরিমার ঠোঁট আরও শুকনো খসখসে লাগছে। সিগারেটের ফিলটারের হলুদ ঐ শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁটে বসে যেতে চায় বেশি করে আরও। তাকে ছাড়িয়ে দু আঙুলের ফাঁকে আনতে গেলে টান পড়ে নরম চামড়ায়। তাতে ঠোঁট ফাটার ভয় থাকে আরও একটু বেশি। এই সময়ে নিজের সাইড ব্যাগ থেকে লিপ গ্লস বা লিপগার্ড, নয়ত ভেসলিন বের করে লাগানটাই একমাত্র রেমিডি। কিন্তু সেটা এখনই, এই পরিস্থিতিতে করা সম্ভব নয়। খুবই বিসদৃশ লাগবে। ঐ লিপগ্লসের ব্যাপারটা কিছুই যায় না এই সঙ্গে। তার চেয়ে বরং পাতি যা সিস্টেম, সেটাকেই প্রয়োগ করা। জিভ বুলিয়ে বুলিয়ে থুতু দিয়ে ভিজিয়ে রাখা ঠোঁট। ওপর নিচে ক্রমাগত জিভের ন্যাতা বুলোন। তাতে অবশ্য ঠোঁট ফাটার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে আরও অনেক বেশি। ফাটবেও। কিন্তু আর উপায় তো কিছু নেই না। ফলে ঠোঁটের ওপর জিভের আনাগোনা বাড়ল।

গালে খৈনি ফেলার আগে পরঞ্জয়ের দিকেও এক চিমটে বাড়াল মধুরিমার অ্যাসাইনমেনটের সাবজেকট। ডান হাতে সিগারেট রয়েছে। তবু বাঁ হাত বাড়াল,

পরঞ্জয়, অভ্যাস। তারপর বাঁ হাতের তালুতে বানানো খৈনি নিয়ে ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে রাখা সিগারেট ঘন ঘন টানতে লাগল।

পাখিটা তখনও ডাকছে। সিগারেটে হালকা হালকা টান দিতে দিতে মধুরিমার দু হাত সামান্য সামান্য কাঁপল। হাতের তালু, পায়ের পাতা ঘামছে অনেক বেশি। গুটিপোকার চেনা গন্ধটা আবারও মুচড়ে ধরছে শীতের বাতাস। চমৎকার হলুদ রোদ একটু সবুজ সবুজ ছায়া মেখে খানিকটা অন্যরকম রঙ নিয়ে গড়িয়ে পড়ছে শুকনো পাতা, ঘাস, জংলি লতার গায়ে। সেই সবুজ আর সবুজ-ধূসরতার পাশে হয়ত একটি দুটি তিনটি হলুদ-কালো নয়ত ভেলভেট-কালো রঙের প্রজাপতি। তাদের ডানার ছন্দে নতুন দিনের আনন্দ।

দূরে পাখি ডাকছে।

খৈনি মুখে নেওয়া সেই তেত্রিশ-চৌত্রিশ চুপচাপ বসে। তার নাকে কি বার বার উড়ে আসছে মধুরিমার হাতের তালু থেকে উড়তে উড়তে বাতাসে মেশা গুটিপোকার গন্ধ? হলুদ-কালো, আর কালো যেন ভেলভেটের পেছন পেছন শাদার ওপর চিত্তির-বিত্তির অন্য একটি প্রজাপতি উড়তে উড়তে দূরের সবুজে হারিয়ে যেতে চাইল। সঙ্গে রাখা মোবাইলের সুইচ অফ। তেমনই শর্ত ছিল ইনটারভিউ নেওয়ার আগে থেকে। পরঞ্জয়ের সেলফোনও বন্ধ। কোনো যোগাযোগ নেই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে। চারপাশে শুধুই শীতের জঙ্গল, বড় বড় গাছ। ঝরা পাতা।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে একটু দূরে ছুড়ে দিল পরঞ্জয়। তারপর বাঁ হাতে রাখা খৈনি ফেলে দিল মুখে। জিভটি খানিকটা নাড়াচাড়া করে জায়গা মতো খৈনির ঢিবলিটাকে সেট করে জানতে চাইল, এবার যাব?

দাঁড়া, একটু জল খাব। বলেই মধুরিমা নিজের শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিতে নিতে সাইড ব্যাগে হাত দিল।

জল খাবেন! আনাব! অবশ্য আপনাদের মিনারেল ওয়াটার দিতে পারব না বোতলের। টিউব ওয়েলের পরিষ্কার জলও না। পুকুরের জল ফুটিয়ে ছেঁকে ফিলটার করে খাই আমরা। প্রিমিটিভ সিসটেমে। কখনও কখনও ছোট ঝরনা, কুণ্ডি বা নদীর জলও খাই এভাবেই।

সেটা কেমন? জানতে চাইল পরঞ্জয়।

নো থ্যাঙ্কস। লাগবে না। জল আছে আমার। বলে মধুরিমা তার বোতল খুলল।

মাটির বড় কলসির ভেতর জল, মোটা করে বেছান বালি, নুড়ি। তার নিচে ফুটো। এবার তারও নিচে একই রকম কলসি, সেখানে শুধু বালি আর নুড়ি। ওপর থেকে নিচের কলসিতে জল পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে। তারও তলায় তিন নম্বর কলসি। সেখানে ফাইনাল জল জমা হচ্ছে। এবার ছেঁকে নিয়ে ফটকিরি বা হ্যালোজেন মেশান। কর্পূরও চলতে পারে। আগে খুবই ব্যবহার হত জীবাণু

নাশক হিসাবে। কিন্তু এখন তো সবই সিনথেটিক কর্পূর। তবুও আমরা ব্যবহার করি। গ্রামের লোককেও শিখিয়েছি। বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বস্তারের কমরেডরা অনেক সময়ই ঝরনার জল খাওয়ার জন্য ধরে রাখেন। বোতলে ওয়াটার বটলে। কিন্তু তাতেও রিসক থেকে যাচ্ছে। এনিমি কখনও কখনও মিশিয়ে দিতে পারে বিষ। তাতে পুরো দলটাই বিপদে পড়ে যাবে। ফলে সতর্ক থাকতে হয়।

মধুরিমাকে জল পরিশুদ্ধকরণের কথা বলতে বলতে চোখের সামনে স্কুলে পড়া বিজ্ঞান বইয়ের পাতা মাঝে মাঝেই ফর ফর ফর ফর করে উড়ে যাচ্ছে। কাল সারা রাত ফৌজি পোশাক পরে জঙ্গলে কেটেছে, ঘুমোবার অবকাশ ছিল না। ডিউটি ছিল গার্ডে, মানে যারা গার্ড দিচ্ছে, তাদের নেতৃত্ব দেওয়া আর কি। সারা রাতই জুতো মোজা পরা আছে। শীতে বরাবরই পা ঘামে। সেই ঘামাঘামিতে মোজার যা অবস্থা হয়েছে, খুললেই জমাট বাঁধা দুর্গন্ধ ছুটে এসে ধাক্কা দেবে নাকে। কিন্তু সময় পাওয়া গেল না জুতো-মোজা ছাড়ার। তার আগেই ওরা এসে গেল। শীত বলে তাই জলপাই সবুজ জামা-প্যানট। এখনও ঘামে ঘামে সেদ্ধ হয়ে যায় নি। গরম হলে আর দেখতে হত না। আসলে এত ঘামি না। মাথায় ফৌজি ক্যাপও রাখতে পারি না সব সময়। খুলে রাখতে হয়।

পাখিটা সমানে ডাকছে।

যার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য এখানে আসা তার বডি ল্যাঙ্গোয়েজে কোনো চঞ্চলতার আভাস নেই। ফলে পরঞ্জয় সবুজ ঘাসের ওপর খৈনির রঙ মাখা কালচে সবুজ থুতু নামিয়ে দিতেই একটা ঘেসো পোকা কিলবিল কিলবিল করতে করতে বেশ ধীর ছন্দেই লুকিয়ে পড়ল সবুজ ঘাসের আড়ালে।

স্কুল পাঠ্য বিজ্ঞান বইয়ের পাতা হাওয়ায় উড়ে উড়ে তার সামনে কতবার যে এলোমেলো হয়ে গেল। এমন কি সেই জল পরিশোধনের ছবিটিও বদলে গিয়ে সেখানে প্রতিফলন, প্রতিসরণ, আলোর গতি, সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য পৃথিবীর অবস্থান, বিকার, বকযন্ত্র, টেস্টটিউব—সবই আগে পেছনে, কেনো নিয়ম না মেনেই চলে আসতে থাকল। আর কাল রাতে, আবছা মতো কুয়াশার আড়ালে তারা যে সাত আট জন এসে দাঁড়িয়েছিল বনেব পথে সেটা নিজের চোখে না দেখলে তো বিশ্বাসই হবে না। কি অসম্ভব বিশাল সেই চেহারা। কুয়াশার সেলোফেন মোড়া চাঁদের গা থেকে তখন যেটুকু আলো বনের গাছে, পাতায়, জমিতে পৌঁছেছে, তার সবটুকুই ছানা কাটা জল রঙের। অথচ তারা চুপচাপই দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ একজন চাঁদের দিকে শুঁড় তুলে হঠাৎই আনন্দধ্বনি অথবা বিপদ সংকেত দিলে আমরা—মানে আমিই বরং তাদের বাঁ হাত উঠিয়ে দাঁড়াতে বলি। ফিস ফিস করে বলি, ডোনট মুভ। আর এগিও না। আগে মত বাঢ়ো। আসলে ইংরেজিটাই কেন জানি না প্রথম এসে যায় জিভে। তিন বছর সেন্ট জেভিয়ার্সে ইংলিশে অনার্স পড়ার সূত্রে। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে সেন্ট

জেভিয়ার্সে ভর্তি হওয়া তখনও বেশ টাফই ছিল। তার ওপর হাওড়ার বাংলা মিডিয়ামে। যদিও ইংলিশে নম্বার ভালো। তাই অ্যাটেম নিলাম। তারপর হাওড়ার বিনু চৌধুরি মানে সকলের কমন বিনুদা বললেন, জেভিয়ার্সে স্পোর্টস কোটায় হয়, তুই তো ক্রিকেটটা ভালোই খেলিস। দ্যাখ না অ্যাটেম করে। ফর্ম তোল। তারপর আমি দেখছি। ওর কিন্তু ক্রিকেট টিমটা মন দিয়ে করবে।

কিন্তু শুনেছি নানা রকম কোটা আছে বিনুদা।

তা আছে। ক্রিশ্চান কোটা তো একটা আছেই। তবে প্লাস পয়েন্ট একটা মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের প্রেফারেন্স আছে। এ রকম আমি শুনেছি। ফাদারের সঙ্গে সামান্য জানাশোনা আছে আমার, খেলাধুলোর সূত্রেই। তোর ইংরেজিতে ভালো নম্বর আছে, ক্রিকেটটা ভালো খেলিস। দ্যাখই না ট্রাই করে।

হাওড়ার ইয়ং মেনস ক্রিকেট ক্লাব-এর বিনু চৌধুরির কথায় উৎসাহিত হয়ে ফর্ম তুলে এনে ফিলাপ করে জমা দিয়ে দিলাম। হয়েও গেল। বলতে গেলে স্পোর্টস কোটাতেই। কলেজের হয়ে ক্রিকেটও খেলেছি বেশ নিয়ম করেই। আর তারপর সেখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির টিমেও বেশ ডেঁটে থেকে যাওয়া যাকে বলে। আসলে জেভিয়ার্সের অভ্যাসেই মুখ দিয়ে আগে ভাগে চলে আসে ইংরেজিটা। আর গতকালই রাতে ডোনট মুভ বলে গোটা আর্মড স্কোয়াডকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার পর আমি তো সেই চাঁদ অথবা আকাশের দিকে শুঁড় তোলা গজরাজের দিকে তাকাই! তার শুঁড়ের দুপাশে বেরিয়ে থাকা শাদা দাঁতে চাঁদের আলোর থাকা না থাকা। এই কি তবে দলপতি? মাঠে মাঠে ধান পাকার সময় তো এটাই। গ্রামে গ্রামে তাড়ির দোকানে বাখর দেওয়া খেজুর রসের হাঁড়িতে নতুন তাড়ি। এটাই তো সময় ওদের নেমে আসার।

গোল চাঁদ পুবে টুপ করে নামার আগে বেশ ছড়িয়ে বসেছে আকাশে। হাওয়ায় দারুণ শীত। ওদের কী ঠাণ্ডাও লাগে না। অন্তত সে রকম কোনো জড়তা তো চোখে পড়ল না আমাদের। ডোনট মুভ, আগে মত বাড়ো—এটা শোনার পর আর্মড স্কোয়াড় আর সামনে এগোয়নি। কিন্তু দলমের সবাই যথেষ্ট একসাইটেড। আমাদের এই যে বেস এরিয়া, যেখানে আমরাই প্যারালাল প্রশাসন চালাই। গণ আদালত বসিয়ে স্পট রায় নিই সেই রায় এগজিকিউট করি পিপলের সামনে। নিয়মিত স্কোয়াড ঘুরে বেড়ায় রাতে, দিনেও। যত মিটিং হয় সব গভীর রাতে। সেখানে সংগ্রামের রিপোর্ট, ভুলত্রুটি নিয়ে সমালোচনা, সমালোচনার সঙ্গে ইনার পার্টি স্ট্রাগল। ডেমোক্রাটিক সেন্ট্রালিজম—গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার তো এটাই বৈশিষ্ট্য।

আকাশের গোল চাঁদ নিজের শুঁড়ে প্রায় ধরে ফেলেছে যে হাতিটি, সেই কি দলপতি? ওদের ছ সাত জনের দল, তার এরিয়া বা কোর কমান্ডার? নাকি সে নিতান্ত সৈনিক!

কুয়াশার পাতলা আড়ালের ওপারে চাঁদ লাগা ছ-সাতটি কালচে মাটি রঙের ছোটখাট পাহাড়। তাদের শুঁড়ে, মাথায়, পায়ে—গায়ের আরও কোথাও কোথাও চাঁদ নিংড়োন আলো। সেই আলোয় যত না আলো, তার চেয়ে ছায়া কিছু কম নয়।

এরা বনে ঢুকল মানে আমাদের অসুবিধে হবে। দলমের কে একজন যেন বলে উঠল চাপা গলায়।

কেন, কিসের অসুবিধে হবে? ওরা ওদের মতো। আমরা আমাদের মতো।

সেটা ঠিক আছে হয়ত। কিন্তু এক বন থেকে অন্য বনে, এক রাজ্য থেকে ভিন্ন রাজ্যে হাতি যাওয়া মানেই তো হুলা পার্টি, মশাল, হইচই, টায়ার জ্বালান আগুন তাদের দিকে ছোড়া—সবই নাকি জংলি হাতি তাড়াতে, এভাবেই ওদের ফেরানর চেষ্টা পুরনো ঠিকানায়। কিন্তু হাতিরা শুনলে তো! মাঠে, মাঠে নতুন ধান পেকে উঠেছে, হাওয়ায় হাওয়ায় তার সুগন্ধ এদিক ওদিক—সব দিক। তাছাড়া তাড়ির দোকানে খেজুর তাড়ির সফেন আহ্লাদ। ফলে সোনালি ধান বোঝাই মাঠে নেমে পড়া। যত ইচ্ছে খাও পেট পুরে। বাকিটা খেতে না চাইলে—মানে পেটে না ঢুকলে নষ্ট কর। তাড়ির দোকানের বেলাতেও তাই। সুযোগ পেলে ঢুকে তাড়ি খাও চোঁ চোঁ। তারপর মাতাল হয়ে ইচ্ছে খুশি কাজ কর।

হাতের ইশারায় দাঁড়িয়ে পড়েছে দলমের সাথীরা। কিন্তু হালকা হালকা কুয়াশার ঠিক ওপারে প্রায় গায়ে গা লাগান গজবাহিনী। তাদের এই এক সঙ্গে লেগে লেপটে থাকা দেখে বেশ ভালো লাগে। কেমন বিশ্বাস করে একে অন্যকে। অথচ দু পা, দু হাত আর একটি মাথাঅলা মস্তিষ্কজীবী মানুষ, কখন যে আক্রমণ করে বসবে কাকে!

চাঁদের দিকে শুঁড় তোলা দাঁতাল আবারও নিজস্ব বৃংহণে একটু যেন এলোমেলো করে দিল বনভূমি। দুরের আকাশে তখন জ্বল জ্বল করছে শুকতারা। মাথার ওপর পা ছড়ান শিকারি কালপুরুষ। তার হাতের তীর-ধনুক, সঙ্গের কুকুর—সবই তো নক্ষত্রে বোনা। তারায় তারায় ফুটে ওঠা সেই নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে তাকালে মাটির দিকে নেমে আসা হিমের চোরা মার টের পাওয়া যায়।

আর যেটা জিজ্ঞাসার ছিল, হাতের জ্বালান সিগারেট প্রায় শেষ করে অনেকটা দূরে ফেলে দেওয়ার পর মধুরিমা জানতে চাইল, স্কুল কলেজ বাড়ির কথা কিছু বলবেন?

না। এক কথায় সারা হয়ে গেল।

কেন? এরকম একটা জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে ঢেউ তুললেও তা বলা হল না মধুরিমার। সংগঠনের কাছে ব্যক্তি, তাহলে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর।

বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না! দেখতে ইচ্ছে করে না পুরনো পাড়া, বন্ধু-বান্ধব? ছেড়ে আসা স্কুলের গেট, পাঁচিল, খেলার মাঠ, কলেজের কমন রুম?

এর উত্তর আমি দেব না।

হাতিদের দলপতি তার দাঁতে জ্যোৎস্না মেখে নিয়ে বারবার শুঁড় তুলে জানতে চাইছিল কাল রাতে, এ ভাবে মাইন বিছিয়ে রেখেছ রাস্তায়, যদি আমাদের পা পড়ে, তখন তো উড়ে একেবারে ফরদা ফাঁই হয়ে যাব।

না, না। সেভাবে মাইন বিছিয়ে রাখি নি একেবারেই। বরং খবর থাকলে তখনই অ্যাকশানের পরিকল্পনা করে আমরা মাইন পুঁতি। তারপর দূর থেকে রিমোট কনট্রোলের বোতাম টিপে....। সে সব শুধু পুলিশ, মিলিটারি, সি আর পি, বি এস এফ-এর ভ্যান ওড়ানোর জন্য। কনভয়ের পাইলট কার বা গোটা কনভয়কেই ধুলো করে দেওয়ার জন্য এইসব রিমোট কনট্রোলের ব্যবস্থা।

আমি কি যাব? খৈনির থুতুতে মুখ বোঝাই অবস্থাতেই জানতে চাইল পরঞ্জয়।

না, এগুলো তো আসবে না।

ওক্কে।

আকাশ থেকে চাঁদ প্রায় পেড়েই আনব—শুঁড় নাড়ানর এমন ভঙ্গিতে গজপতি যাকে কিনা দলপতিও বলা যাবে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, রেল লাইনে তো প্রায়ই কাটা পড়তে হয় ইদানীং। ট্রেনেব ধাক্কায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে হাতি। নয়ত ধাক্কা খেয়ে কাতরায়। বন কেটে, পাহাড় ফাটিয়ে রেল লাইন। বেশ, তা নয় হল। কিন্তু হাতির যাওয়া আসার রাস্তা। সেটা কারা দেখভাল করবে? জঙ্গল কেটে বসত, ফসলের ক্ষেত, মানুষের ঘর-বাড়ি, তাড়ির দোকান, বাংলা মদের ঠেক, বাজার, হাট, পঞ্চায়েত অফিস, পার্টি অফিস—সব হচ্ছে কিন্তু হাতির চলাফেরার রাস্তা নেই। কেউ এসব নিয়ে ভাবে কি? আন্দোলন তো দূরের কথা। তাহলে হাতি যাবে কোথায়? বনে তার খাবার নেই। যে সব জিনিস হাতি খায় কয়েতবেল, কলা গাছ, কলা গাছের নরম পাতা—সে সব ক্রমেই কমের দিকে। তাহলে হাতি কি করবে? সে তো নামবেই কাঁচা-পাকা ধানের ক্ষেতে, ভাঙবেই তাড়ির দোকানের ঝাঁপ।

হালকা হালকা কুয়াশার ঢেউ দুই দলপতির মাঝখানে। দুজনে দুজনকে সবটা হয়ত দেখতেও পাচ্ছে না সব সময়। বাড়া কমার কিছু একটা ব্যাপার আছে কি কুয়াশার মধ্যে? নাকি অনেকক্ষণ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে দুচোখ। হয়ত সে তখন মনে মনে বলে ওঠে, আমি আর দেখব না। এই না বলা টুকুই হয়ত আড়াল তৈরি করে দেখা না দেখার মাঝে। হাতিদেরও কি এমন হয়?

দলপতির কথা শুনে হাতের একে ফিফটি সিকস আপনা থেকেই কেমন যেন আলগা হয়ে আসতে চায়। কোনো রকম দেবী-দেবতা, অতি প্রাকৃত শক্তি, অলৌকিকে আমারও বিশ্বাস নেই। কিন্তু প্রায় শেষ রাতের এই প্রায় হওয়া না হওয়ার মাঝে কোনো এক এক অজানা আলো অন্ধকারে মাখামাখি দলপতি আমায় কি এক প্রশ্নের মুখোমুখি যেন দাঁড় করিয়ে দেয়।

এই যে এখনকার সমাজ, যার বিরুদ্ধে পুরো লড়াই আমাদের, তা পুরোপুরি

বদলে গেলেই কি হাতিদের নির্বিঘ্নে পথ চলা আদৌ সম্ভব হবে? পায়ে চলা রাস্তায় কেউ বানাবে না ঘর-বাড়ি, বসাবে না বাজার, বুনবে না ফসলের ক্ষেত? এসব ভাবতে ভাবতে কমান্ডারের আঙুলও আলগা হতে থাকে একে ফিফটি সিকসের গা থেকে। শেষ রাতের জ্যোৎস্না ঠিক সেই সময় একই সঙ্গে নতুন করে আছড়ে পড়ে মহা মহা হাতিদের পিঠে, একে ফিফটি সিকসের নলে। সেই ইস্পাত-কঠিন বারুদ ওগরান কালচে রঙ সেটুকু সময়ের জন্যও হয়ত কেমন যেন নরম হয়ে ওঠে আকাশ থেকে নামা আলোর দোলনায় দুলতে দুলতে।

আমরা কোথায় যাব? দাঁতাল জানতে চায়। ক্রমশ জঙ্গল কমে আসছে একটু একটু করে। তাও কাটা কাটির পর যেটুকু বন-বাদাড় ছিল, সেখানে আবার তোমরা সেঁধচ্ছ। তোমাদের হাতেও বন্দুক। ওদের হাতেও বন্দুক। মাঝখানে আমরা। আমাদের কোনো বন্দুক নেই, বারুদ নেই। গ্রেনেড, আর ডি এক্স, ল্যানড মাইন—কিছু নেই। তাহলে আমরা কোথায় যাব বাপু হে? সর্বত্র নাকি খুব উন্নয়ন হচ্ছে, এসব শুনতে পাই এখন। কিন্তু আমাদের উন্নয়ন নিয়ে তো কেউ ভাবে কি?

পনিটেল রোদ মেখে শুয়ে আছে ঘড়ে। তাকে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে সামান্য নিচু হল পরঞ্জয়। কোত্থেকে একটা বুড়ো পাতা যেন বোঁটা থেকে খসে উড়তে উড়তে তার শ্যাম্পু করা চকচকে পনিটেল, ঘাড়, হলুদ গেঞ্জি ছুঁয়ে ছুঁয়ে মাটির ওপর খুব সাবধানে এসে ল্যানড করল।

সত্যি সত্যি সেই ছ সাতটা হাতির দল যদি হঠাৎ বন ফুঁড়ে এসে দাঁড়ায় পরঞ্জয়ের সামনে! আর মধুরিমা বিশ্বাস তার স্বভাব মতো পরঞ্জয় তুই এবার যা—এটুকু বলে দলপতির শুঁড়ের কাছাকাছি এগিয়ে দেয় মাইক্রোফোন, তাহলে কত যে দীর্ঘশ্বাস, কত কত না বলা কথা, ছবি। কত যে এক্সক্লুসিভ স্টোরি।

ইনটারভিউ দিতে দিতে একটা জায়গায় এসে কেমন যেন আটকে গেছে কমান্ডার। ঘাসের ওপর তার পা ছড়িয়ে ভঙ্গিই কি বলে দিচ্ছে, আমি একটু টায়ার্ড! আর এই বিরতিটুকুর ফাঁকে এক গাদা খিদের মিসাইল যেন বা একই সঙ্গে আছড়ে পড়তে শুরু করেছে একই সঙ্গে। সঙ্গে বিস্কিটের প্যাকেট আছে। কয়েকটা ভেজিটেবল স্যান্ডুইচ, ডিম সেদ্ধ কয়েকটা। এতক্ষণ সাক্ষাৎকার নেওয়ার উত্তেজনায়, তাড়সে খিদের বোধটাই চলে গেছিল বোধহয়। এখন একটু একটু করে খিদের বোধ খোঁচা দিচ্ছে ভেতরে।

আমাদের রাস্তা কী হবে কমান্ডার? দলপতি নিজের গলায় শাঁখ বাজিয়ে জানতে চাইল।

হিমিকা মেশান চিকের আড়ালে আশ্চর্য রকমের শান্ত সেই হাতিরা। কেবল একই প্রশ্ন করে যাচ্ছে দাঁতাল দলপতি। কমান্ডার তার কোনো উত্তর দিতে পারছে না। হাতে একে ফিফটি সিকস হয়ত একটু একটু করেও আলগাও হয়ে উঠছে। এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে।

বন কেটে বসতি মানে কি উন্নয়ন? জানতে চাইল দলপতি।

কমান্ডারের মুখে কোনো কথা নেই।

হাতির গম্ভীর নাদে কেঁপে কেঁপে উঠছে শান্ত বনভূমি। শীতের হলুদ হয়ে যাওয়া প্রবীণ পাতারা একটা দুটো, একটা দুটো করে খসে পড়ছে সকলের অজান্তেই।

হঠাৎই আরও কোনো গভীর, পুরু ছায়া তৈরি হয়ে গেল কমান্ডারের দলম আর দলপতির পালের মধ্যে। যে শুঁড় দিয়ে চাঁদ পাড়ার কথা ভেবেছে দলপতি, সেই আকাশের চাঁদও কেমন যেন লাফ দিয়ে গেল আরও খানিক পুবে।

চাঁদ ছোঁয়ান অন্ধকারে জোনাকি এদিক ওদিক আলোর ফুল সাজিয়ে চুপচাপ বসে আছে। কোথাও কোথাও হঠাৎ হঠাৎই অজানা সর সর শব্দ। হয়ত মেঠো ইঁদুর, নয়ত বেজি কিংবা শেয়াল।

মধুরিমার ঠোঁট, গলা শুকিয়ে এল আবারও তেষ্টায়। শীতে জল তেষ্টা পেতেই থাকে। তার ওপর খরখরে হয়ে আছে ঠোঁট। ঝোলায় রাখা প্যাকেট থেকে বিস্কুট বার করে চিবোতে চিবোতে মধুরিমার মনে হল খিদেটা বুঝি বেড়ে গেল আরও। এতক্ষণ খাওয়া হয়নি, তাই বোধ হয় পেটের মধ্যে খাব খাব ভাবটা চাপা পড়েছিল। এখন বিস্কুট আর জল পড়তেই লাফিয়ে উঠল খিদের আগুন। খাই খাই করে এক জ্বালা শুরু হতে লাগল ভেতরে ভেতরে। মস্ত এক ঢোক জল খেয়ে মধুরিমা বলল, এবার আমরা গুটিয়ে আনব।

কমান্ডারের মুখে আবারও ক্যামেরা লুক থ্রু করতে করতে আলোছায়া—সব বুঝে নিতে চাইল পরঞ্জয়। আর সে একটু যেন অবাক হয়ে দেখতে পেল তার লেনসে ফুটে উঠছে একটি মস্ত শুঁড়অলা মাথা। ব্যাপারটা বুঝে নিতে নিতে তার চোখে শাদা শাদা এক জোড়া দাঁত জেগে উঠল। এবার গজদন্তসমেত ভারি মাথা, খুদি খুদি চোখ, চোখের কোণে একটু যেন শাদা মতো পিচুটিও, তার গায়ে কালো কালো দুটো একটা মাছি—সবই দেখতে পাচ্ছে পরঞ্জয়।

অদ্ভুত চুপচাপ এই বনভূমিতে ঘাসের গায়ে প্রজাপতিরাও স্থির হয়ে আছে। আর তারপর তারা উড়ে কখন যে চলে গেল পরঞ্জয় টেরও পেলনা। বরং ঘাসগুলো নীল, গাছেরা সব লাল আর প্রজাপতিরা ঝলমলে সোনালি, রুপোলি হয়ে গেলে তার ক্যামেরায় এদের সবার ছায়া নিজস্ব রঙে। তারপর সবটাই কোন ম্যাজিকে ফিল্মের নেগেটিভ হয়ে যায় কেমন করে পরঞ্জয় বুঝতে পারে না। এমন কি তার পাশে এখন নিজেদের চ্যানেলের নাম লেখা, লোগো আঁকা মাইক্রোফোন হাতে মধুরিমাও নেই।

পরঞ্জয় বেশ অবাকই হল মনে মনে। কি আশ্চর্য, সবাই কি আউট অফ ফোকাস হয়ে গেল নাকি! তার ক্যামেরার লেন্সে তখন শুধুই একটি বড় দাঁতালের মাথা, শুঁড়। চোখের কোণে কালচে কালচে মাছি, প্রথমে মনে হয়েছিল সামান্য, এখন

দেখা যাচ্ছে অনেকটাই ক্যাতর। তারপর এদিক ওদিক দু-একটা জোঁক, এক দম রক্ত খেয়ে টাবটুব।

কমান্ডার, তোমরা তো তোমাদের করিডর তৈরি করে নিতে পেরেছ বলছ, নেপাল থেকে শুরু করে, নেপালের লাগোয়া উত্তরপ্রদেশ, বস্তার, দণ্ডকারণ্য, অন্ধ্র, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড হয়ে অবশেষে পশ্চিমবাংলা। বিপ্লবী জোন তৈরি নাকি কমপ্লিট, সেখান থেকে—মানে ঐ রাস্তায় রেগুলার মার্চ করবে রেড আর্মি, দলম, আর্মড স্কোয়াড, কিন্তু আমাদের করিডর তার কি হল!

পরঞ্জয় সেই মহাগজের কথা শুনতে পাচ্ছে। তার ক্যামেরার ফ্রেমে শুঁড় খানিকটা আকাশের দিকে তুলে বলে যাওয়া এই দলপতি আবারও জানতে চাইল খাবারের টান পড়েছে জঙ্গলে। থাকার জায়গা নেই। আমাদের হাজার হাজার বছরের চলার রাস্তা একটু একটু করে বন্ধ করে দিয়ে সেখানে দখলদার মানুষের ক্ষেতিবাড়ি, মদের দোকান, সিনেমা হল, ভিডিও হল, পার্টি অফিস।

আমরা আমাদের জায়গা হারিয়ে ফেলেছি বহু বছর। যে সব গাছ, গাছের কচি ডাল পাতা খেয়ে আমরা পেট ভরাতাম, বাঁচতাম, সেই সব গাছ এখন আর নতুন করে প্রায় লাগানই হয় না। তার বদলে বন সৃজনের নামে যা লাগান হচ্ছে—সেই ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি—আমরা তা খাই না। খেতে চাই না। কচি বাঁশ, তেঁতুল, কয়েতবেল—কে লাগাবে তাদের?

দলপতির এসব কথা কি শুনতে পাচ্ছে মধুরিমাও? টেক করছে?

আমাদের সমস্ত রাস্তা নষ্ট হয়ে গেল। এখান ওখানে রেল লাইন, বাস রাস্তা। বিদ্যুৎ ছোঁয়া তারের বেড়া দিয়ে দিয়ে আটকানর চেষ্টা করা হতে লাগল আমাদের। কিন্তু সেই আড়াল আমরা মানলে তো! বেড়াকে কি ভাবে বিদ্যুৎহীন করা যায়, সেটাও আমরা বুদ্ধি করে বার করলাম। কায়দা করে গাছ বা কলাপাতা ফেলে দিয়ে তারপর কৌশল করে বেরিয়ে যাওয়া।

হাতি লোকালয়ে ঢুকলে হই হই পড়ে যায়। হুলা পার্টি, পটকা, কেরোসিন-মশাল, টায়ার জ্বালান আগুন—কিছুই বাদ থাকে না তাদের তাড়াবার জন্য। জ্বলন্ত মশাল গায়ের ওপর ছুড়ে মারলে কেমন লাগে? ছ্যাঁকা লাগে না? আগুন লাগান টায়ার যদি লাগান যায় নরম চামড়ায়, তাহলে যন্ত্রণা হয় না? হাতি বলে তার কি কষ্ট দুঃখ কিছুই নেই!

পরঞ্জয়ের ক্যামেরায় দাঁতালের দিগন্ত জোড়া ছবি। সবটা ধরাও যাচ্ছে না। ঠিক করে মাঝে মাঝেই অতবড় শুঁড়, মুখ—সব খানিকটা খানিকটা কেমন করে যেন চলে যাচ্ছে ফ্রেমের বাইরে। এই যে এতক্ষণ ছিল আকাশ আলো করা রোদ্দুর, তার তাপ-উত্তাপ, রঙ যেমন তেমন করেও পেয়েছে চার পাশ, সেই সব রোদ্দুরের রঙ, গন্ধ সরে গিয়ে কোথা থেকে যেন উড়ে আসতে লাগল কুয়াশার গুঁড়ো। তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসা হিম হিম ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর উঠতে লাগল শিউরে শিউরে। এ

কোন অলৌকিক কুয়াশা? অন্ধকারের একি মার অসময়ে! পরঞ্জয়ের হলুদ টি শার্ট বনের অন্ধকারে ডুবে যাবে বলে হাত বাড়াল।

বেশ জোরে জোরে হাওয়া দিচ্ছে এখন। শীতে এমনিই প্রকৃতির স্বাভাবিকতায় প্রবল থাকে শীতের বাতাস। এখন এই হিম-হাওয়ায় পরঞ্জয়ের মনে হতে লাগল তার একদম ভেতর পর্যন্ত সব বরফ হয়ে যাবে। দমকা হাওয়া, কুয়াশা, শীতের জোরদার ঘেরাটোপ, একটু আগে তার তো কোনো চিহ্নই ছিল না।

পরঞ্জয় নিজের ভেতর নিজে হাতড়াচ্ছে। যে মোটরবাইকঅলারা তাকে আর মধুরিমাকে চোখ বেঁধে নিয়ে এসেছে এই বেশ গভীর বনে, তারাই বা এখন কোথায়? আর সেই গাইডদের দেখা না পেলে তো প্রায় অসম্ভব এই বন থেকে বেরন। কোথায় কোন রাস্তার মার-প্যাঁচ আছে কে জানে! এই জঙ্গল তো হাতে পায়ে ছড়াতে ছড়াতে ঝাড়খণ্ড হয়ে চলে গেছে ওড়িশায়।

হাওয়া দিচ্ছে বেশ জোরে। হাওয়া না বলে তাকে ঝড় বলাই ভালো। বনের মাটিতে লুটিয়ে থাকা শুকনো পাতারা পাক খেয়ে খেয়ে পাক খেয়ে খেয়ে উঠে যেতে চাইছে আকাশে। পাগলা বাতাসের টানে শুকনো পাতাদের সেই আকাশমুখি হওয়ার দৃশ্য অন্যসময় হলে হয়ত গেঁথে রাখত পরঞ্জয় ক্যামেরায়। স্টক শট হিসেবে। পরে কোনো ভাবে কাজে লাগিয়ে দেওয়া যাবে। এরকম সুযোগ তো সব সময় ঠিক সামনে আসে না। এতো যাকে বলে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছে চান্স। শুধু তাকে দু হাত বাড়িয়ে নিয়ে নাওয়া।

বনের মধ্যে ঝড়ের সঙ্গে পাতা উড়ছে। উড়ে বেড়াচ্ছে লাল ধুলো। তার সঙ্গে আর কিছুই নেই প্রায়। শহরে জোরাল বাতাসের সঙ্গে যেমন ধুলো, ময়লা, আবর্জনা, বাতিল প্লাস্টিক, ফেলে দেওয়া ঠোঙা, শালপাতা, আলগা চুল, ছেঁড়া কাগজ, বাস ট্রামের টিকিট, আর সাত সতের হাবিজাবি ওড়ে, এখানে সেই সুযোগ নেই। বরং এই ভীমকায় বাতাসের ছোটাছুটিতে রঙবাহারি প্রজাপতিরা সুতো কাটা ঘুড়ি হয়ে এদিক ওদিক এলোমেলো খানিকটা ওড়াউড়ি কবার পর বাতাসের গায়ে ভর দিয়েই কোথায় যেন উবে গেল। হয়ত ভয় পেয়েছে। হয়ত বাতাসে ডানা ভাসিয়ে স্থির থাকতে পারছে না। তাই—।

শুধু পরঞ্জয়ের হলুদ টি শার্টে একটি কালো প্রজাপতি বাঁ কাঁধের সামান্য নিচে ডিজাইন হয়ে দু ডানা ছেতরে বসে। ওসব দিকে অন্য সময় নজর পড়লে খুবই আহ্লাদ হত হয়ত একস জেভিয়ার্স স্টুডেন্ট পরঞ্জয় মুস্তাফির। কিন্তু এখন এই উথাল-পাথাল হাওয়ার ভেতর, সর্বনেশে হিম হিম ঠাণ্ডায় পরঞ্জয় বুঝতেই পারল না কি করবে। মাথার মধ্যে সমস্ত কিছু এক সঙ্গে নেচে বেড়াচ্ছে তাল পাকিয়ে গিয়ে। সে এক মহা জগঝম্প অবস্থা। এই কাহিল সিচুয়েশানের মধ্যেই ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে আবারও দাঁতাল আর তার সঙ্গের ছ-সাত কি বড় জোর আটটি হবে—বাহিনীকে দেখতে পেল পরঞ্জয়। দলপতি দাঁতাল এখন অনেকটাই লং

শটের দূরত্বে চলে গেছে হয়ত। তার সঙ্গেই অন্যরাও দিব্যি এঁটে গেছে ফ্রেমের মধ্যে। কেউই তেমন করে আউট অফ ফোকাস হচ্ছে না। অথচ এদের সবাইকে অল্প আউট অফ ফোকাসের কায়দায় ফেড করে দিয়ে যদি একটু বেশি প্রমিনেন্ট করে তোলা যায় দাঁতালকে, তাহলে ছবির কমপোজিশান, ফ্রেম, বলতে গেলে টোটাল মজাটাই বদলে যাবে। কিন্তু এখন সেই সব মজা নিয়ে ভাবার সময় আর নেই। দূরে—কোথায় সেই যে পাখিটা ডাকতে আরম্ভ করেছিল খানিক আগে, সে আবার শুরু করেছে ডাকাডাকি। ডাক না বলে তাকে গোঙানি বা কঁকানি বলাই ভালো। সেই ডাকাডাকি শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে গড়িয়ে যেতে থাকে হিম-পাথর। বরফের বল গড়াতে থাকলে যেমন অবশ করে দেয় সব কিছু—তার গড়ানর রাস্তায়, তেমনই প্রায় হাল এখন পরঞ্জয়ের।

পাখিটা আবারও ডাকছে। থেকে থেকে ডাকছে। বনের গাছেরা নীলচে-ধূসর কুয়াশা মেলে একদম দৈত্যরাজের এক একটি চ্যালা। পরঞ্জয়ের হলুদ টি শার্টে একটা কালো প্রজাপতি, ডানা ছেতরে চুপচাপ। মাঝে মাঝে তার পাখায় নড়াচড়ার ছন্দ। হয়ত সেটা বেপরোয়া বাতাসের জন্য, নয়ত এমনি এমনিই। অচেনা জঙ্গলে কত কি ঘটে থাকে।

আমি ফিরব কি করে? যার বাইকে এসেছি, সেই কনট্যাকট ম্যানকেও দেখছি না। সেই লোকটিকে, যার মুখ, মাথায় মাংকি টুপির রহস্যঘন আবরণ, আর তার ওপর গামছার প্যাঁচ, তাকে কিছুতেই আবিষ্কার করা যাচ্ছে না কাছাকাছি কোথাও। নামও জানা নেই যে চিৎকার করে করে সেই নাম ধরে ডাকবে পরঞ্জয়। আসলে নাম জিগ্যেস করে জেনে নেওয়ার কোনো সুযোগই তো তৈরি হয় নি আসার সময়।

হাওয়ার টানের সঙ্গে একটা গোঙান শব্দও চারপাশে। কমান্ডার, মধুরিমা—কেউই আশেপাশে নেই। ঘাস, ঝরা পাতার ওপর শুয়ে থাকা রাইফেল, একে ফিফটি সিকস, একে ফিফটি সেভেন, দোনলা বন্দুক—কিছুই আর চোখে পড়ছে না এখন। কোথায়, কোনখানে ভ্যানিশ হয়ে গেল তারা? কোন দিগন্তে। সাত্তার বসে আছে—অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য কখন ফিরব, এই উদ্বেগ নিয়ে পাঁশকুড়ায়। তার সঙ্গে ভাড়ায় আনা টাটা সুমো।

পকেটের মোবাইল ঝড়, কুয়াশার মধ্যেই বার করে অন করার চেষ্টা করল পরঞ্জয়। যদি সাত্তার, মধুরিমা কাউকে ধরা যায়। বোঝা যাবে সিচুয়েশনটা। কিন্তু কোথায় কী? সিগন্যালই নেই। হাজার বোতাম টিপেও ধরা যাচ্ছে না কোনো লাইন। রাগে, কষ্টে, কি এক না জানা ব্যথায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে পরঞ্জয়ের। এখান থেকে বেরব কি করে আমি! কোনো রাস্তাই চিনি না। তার ওপর মধুরিমা নেই। কোথায় যে উবে গেল টিভি জার্নালিস্ট মধুরিমা বিশ্বাস। আর কোথায়ই বা সেই পরভিনজির অর্গানাইজেশনের এরিয়া কমান্ডার?

কোথাও কিছু নেই। আছে শুধু ঝড় আর থকথকে গাঢ় কুয়াশা।

মধুরিমা, মধু—উ-উ—পরঞ্জয়ের খুব ইচ্ছে হল গলা ছেড়ে ডাকে। তারপর বলে কো-থা-য়, তু-উ-মি। কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা যেন পাতি বাংলা নয়ত মুম্বাইয়া হিন্দি সিনেমা সিনেমা হয়ে যাবে ভেবে গাঢ়, ভারি কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইল পরঞ্জয় মুস্তাফি।

পাখিটা সমানে ডাকছে।

ঝড়ের মধ্যেও তার ছেঁড়া ছেঁড়া গলার স্বর ভেসে আসছে কানে।

ক্যামেরার লেনসে ছায়া ছায়া ছবি হয়ে তখনও দলপতি। তার শাদা গজদাঁতে লাল ধুলো। বনের শুকনো পাতার টুকরো, শুকিয়ে যাওয়া ঘাস। পরঞ্জয় মুস্তাফির হলুদ টি শার্টের বাঁ দিকে ডানা মেলা কালো প্রজাপতিটি আবারও ডানা নাড়তে লাগল।

এগার

দলপতি শুঁড় তুলে চাঁদমাখা অন্ধকারকেই যেন স্যালুট করল।

বনভূমি জুড়ে, গোটা বনস্থলী ঘিরেই থাকার কথা ছিল আশ্চর্য নীরবতা, সেখানে এখন শুধু ঝিঁঝির ডাকই যা একটু সম্বল, সেই মৌন কাটানোর জন্য। অথচ মাইন ফেটে যাওয়া মাটি, মাঠ, চরাচর, বন—সবই বারুদ গন্ধে সন্ত্রস্ত। ভয় তো এভাবেই জড়াতে থাকে একটু একটু করে।

এরই মধ্যে দলপতি শুঁড় তুলল।

খবর এসেছে আরও একটা দলের কাছ থেকে, কাছাকাছি বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে রাস্তার ওপর—রাস্তা মানে তাদের যাওয়া-আসার রাস্তার ওপরে। সেখানে অনেক অনেক লোহা-লক্কড়, মেশিনপত্তর, এই সব সাত সতেরো আর কি, যা দিয়ে সহজেই আটকে ফেলা যায় পথ।

দলপতির গায়ে বর্ষার মেঘের অন্ধকার। রাতে তার ওপর চাঁদ আছাড় খেয়ে খানিকটা অন্যরকম পুলটিস দিলেও, সে তো অন্ধকারই থাকে। হয়তো একটু কেমন যেন মাটি মাটি, সবুজাভ। এই বর্ষায় বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর জঙ্গলে খানিকটা জল টুপটুপ আবহাওয়া তৈরি হয়। সেই রকম জল-ছোঁয়া পরিবেশের মধ্যে দলপতি দাঁড়িয়ে দেখতে পায় দূরে দূরে কারা যেন আবছামতো শরীরে ঘোরাফেরা করে।

দলপতির শরীর অনেক বড়। তুলনায় চোখ অনেকটাই ছোট। সেই চোখের ক্যামেরায় চাঁদ ডোবে, ভাসে। আকাশে ভাঙা চাঁদের বিষণ্ণ হাইতোলায় যেটুকু জ্যোৎস্না, তাতেই ঐ ঐ ছেলে-মেয়েগুলো, অনেকটাই যেন ছায়া ছায়া।

তাদের হাতে এ. কে ফরটি সেভেন।

অটোমেটিক রাইফেলের ট্রিগারে তাদের সতর্ক আঙুল।

এমনকি একটু পুরনো হয়ে যাওয়া দোনলা, একনলা বন্দুকও হাতে কারও কারও।

সময় বহে যায়।

সময় চুপ থাকে।

আবার সময়ই কথা বলে।

জলপাই রঙ উর্দির পাশাপাশি আবছা আলোছায়া।

সে দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দেখা যাবে মাথার ফৌজি ক্যাপ খুলে ছেলেটি একবার আকাশের দিকে তাকাল।

কী এক বিষণ্ণতা ঘিরে ধরছে সমস্ত পৃথিবীকে একটু একটু করে।

সেই ব্যথার গায়ে একে ফিফটি সিকস আঁচড় বসায় মাত্র।

কোনো এক নাম না জানা পাখি বর্ষায় ভিজে গা নিয়ে পাখা ঝাড়ে গাছের ডালে। তার শব্দ ছড়ায় একটু একটু করে এখানে, ওখানে সেখানে।

দলপতি পাখির ডানা নাড়ানাড়ির আওয়াজে চমকায় না। কিন্তু হাতের এ. কে ফরটি সেভেন কেমন যেন চলকে যায় জলপাই উর্দির।

আকাশে ভাঙা চাঁদ রূপকথার গল্প বলে।

সে এক দিন ছিল, যখন সব মানুষ সমানভাবে থাকত। মানে কারও হাতে বেশি কিছু নেই। সবাইয়ের কাছে সব কিছু একই রকম।

এক হওয়া সম্ভব না কি!

একজনের গলায় গান থাকবে।

কারও থাকবে ছবি আঁকার হাত।

কেউবা ভালো নাচতে পারে।

কিন্তু কোনোটাই তো একা একা নয়।

সবটাই সমবেতভাবে। সমস্বরে।

এসব নানান কথা বলতে থাকে গাছেরাই।

বলা শেষ করার কথা না ভেবেই তারা তর্ক জোড়ে।

তর্ক বলে তর্ক। একেবারে ধুন্ধুমার যাকে বলে।

কথা বলতে বলতে মাথা নাড়ায় তারা।

তাদের ডাল-পাতা নড়ে।

দলপতি বহুদিন আগে শোনা একটা ছড়ার লাইন মনে করতে পারে।

জল পড়ে পাতা নড়ে
পাগলা হাতির মাথা নড়ে...।

এই দু'লাইনের ছিকুলি কি দলপতি শুনেছে কখনও?

নাকি ভেবেছে?

ভাবতে পেরেছে কোনোদিন?

দলপতি যা ভাবে, তা কি মানুষ ভাবে?

ভাবা সম্ভব?

তাহলে কি এভাবে বিদ্যুৎ তৈরির কারখানা হত না কি হাতির যাওয়া-আসার রাস্তা আটকে!

এ. কে ফরটি সেভেন, এ. কে ফিফটি সিকস, সাবেক দোনলা বন্দুকে, রাইফেল ট্রিগারে আঙুল রাখা সতর্ক জলপাই উর্দিরা কেউ কেউ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল চাঁদ ভেঙে যাচ্ছে।

ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

এবার কি নেমে আসবে লক্ষ বছরের অন্ধকার!

দলপতি নিজের মনে শুঁড় কপালে তুলে ডাক দিল।

সেই বৃংহণে ছিল কি কোনো সংকেত? সাবধান, হুলা পার্টি আসছে—পালাও। পালাও।

আসলে বড্ড জ্বালাতন করে হুলা পার্টি।

জ্বলন্ত টায়ার, মশাল ছুড়ে মারে আমাদের গায়ে। পটকা ফাটায়। সেই বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠি আমরা। অন্ধকারে, মাথার ওপর আকাশকে সাক্ষী রেখে তখন দৌড় লাগাই।

দৌড়। দৌড়। দৌড়।

তখন বন, বনানী জঙ্গল কিছুই আর কোনো বাধা নয় তার কাছে।

ছুট। ছুট। ছুট।

মাথার ওপর কালচে নীল আকাশে এখন অনেক মেঘ। সেই মেঘদলে চাঁদ ঢাকা পড়ে যেতে থাকে। আবার হাওয়ার টানে মেঘে সরে গেলে আবার যে-কে সেই। আগের মতোই সব কিছু।

মাইন পুঁতে কয়েকদিন আগে পুলিশের জিপ ভ্যান উড়িয়ে দিয়েছে ওরা। ক্লেমোর মাইন। অনেকটা জায়গা জুড়ে গর্ত। বারুদের গন্ধ। ছিন্নভিন্ন মানুষের শরীর।

কি ভয়ংকর আওয়াজ।

এখনও মনে পড়ে দলপতির। মনে করলেই চমকে চমকে উঠতে হয়। দিনের বেলাতেই, এই তো সেদিন—সমস্ত জঙ্গলে তখন আলো-আঁধারি। জিপের শব্দ। মাইন ফাটার ভয়ানক আওয়াজ। গুলি চলার দনাদ্দন। দনাদ্দন।

অনেকক্ষণ ধরেই চলল গুলি।

শান্ত বনস্থলী কেঁপে কেঁপে উঠল গুলির শব্দে। প্রজাপতিদের ডানার রঙ কোথাও কোথাও খানিকটা যেন জ্বলে গেল গুলির শব্দে, আঁচে।

বারুদের ধোঁয়ার কাশি আসে প্রজাপতিদেরও।

সেই কাশি চাপতে গিয়ে, তারা কখনও কখনও হেঁচে ফেলে।

এই যে দলপতি, মাথার কাছে শুঁড় তুলে—সেই শুঁড় কপালে ঠেকিয়ে বারে বারে কী যেন কত কথা বলে, তারও মনে হয় মাইন খুব বিপজ্জনক। বিস্ফোরণের পর মাটি, গাছ, পাথর, মানুষ, প্রজাপতি, বুনো খরগোশ—কারওরই রেহাই নেই।

রাষ্ট্র আসলে এক ভয়ানক ভারি শেকল, খাঁচাও বলা যেতে পারে। এরকম মাঝে মাঝেই মনে হয় এ. কে ফরটি সেভেনের ট্রিগারে আঙুল রাখা বাইশ-তেইশের।

এই তো গতবারই, বইমেলা থেকে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রিট পেরনোর সময়ই তো ঠিক একটা পুলিশের জিপ। বোঝাই করা খাকি উর্দি। বেশ জ্যাম জমাট পার্ক স্ট্রিট, যেমন বইমেলার সময় হয়। পুলিশের জিপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বার বার তাদের চার-পাঁচজনকেই যেন আটকাতে চাইছে খাকি প্যানট শার্ট সোয়েটার, কালো বুট।

তারা তো রাস্তা পেরেবেই। যেভাবেই হোক।

কোনোভাবেই তাকে আর সঙ্গে যারা, তাদের আটকাতে না পেরে খুব জোরে জিপের দরজাটা খুলল খাকি পোশাক। যাতে সেই দরজার ধাক্কায় বেশ খানিকটা চোট পায় বাইশ-তেইশ। কিন্তু বাইশ-তেইশও তখন তার স্বাভাবিক রিফ্লেক্সে নিজেকে সরিয়ে নিতে পেরেছে। যেমন যে কোনো প্রাণীই করতে চায় আর কী! মাইন ফাটার সময় হাতিরাও তো দূরে, আরও দূরে ঘন জঙ্গলের আড়ালে, গাছেদের কঠিন সীমারেখা, বেড়ার ওধারে যেতে চেয়েছে, যাতে না আঘাত লাগে কোনো। তখন তাদের চোখে ভয়মাখা কী এক কষ্ট।

আতঙ্কের মধ্যেই তারা বলতে থাকে, এ কি রে বাবা! এ কি কোনো আরও বড় হুলা পার্টি! কামড়ে খাবে নাকি আমাদের!

পুলিশের জিপের দরজা বা পেছনের ডালা, এখন মনে হচ্ছে দরজা নয়, পেছনের নীচু ডালাটাই হবে, তাকে আড়ে খুলে দিয়ে সেপাইটি আঘাত করতে চাইল বাইশ-তেইশকে। তখন তার দু'চোখের মণিতে খ্যাপা জানোয়ারের ঘোর। সেই লালচে ঘন ঘোরের দিকে এক ঝলক তাকালেই বোঝা যায়, চারপাশ বড় সুখী আর ফুরফুরে নয়। বরং সেখানে অনেক কাঁটাতার, গরাদ, গারদ, শৃঙ্খল।

এর দিন দুই পরে বইমেলা থেকে বেরিয়ে—বেশ রাতই হয়ে গেছে তখন, কার একটা বারো ঘণ্টার বন্‌ধ ছিল সেদিন, কিন্তু বইমেলার তাতে কি! সেখানে তো অনেক লোক। আর বাইশ-তেইশদেরও বুক স্টল আছে একটা। স্টল না বলে তাকে টেবল বলাই ঠিক হবে। একদমই ধূলিগন্ধে ভরা শীতের বিকেল-সন্ধে, সেখানে তারা তিন-চার জন। গিটার বাজিয়ে গানও গায় কেউ কেউ। ভিকটোরিয়ার কাছাকাছি, ঠিক মাথার ওপর নয় হয়তো—এক পাশে একটু টেরচা করে কালো পরির গালের কাছাকাছি টুসটুসে একখানা গোল চাঁদ। আহা,

কলকাতাতেও এমন চাঁদ হয়। সত্যি সত্যি। আর সেই বিধুর জ্যোৎস্নায় শাদা ভিকটোরিয়ার মাথায় উড়তে চাওয়া কালো পরির গালের টোল কেমন করে যেন স্পষ্ট জেগে ওঠে। তখনই মেলা ছেড়ে, সাউথে—নয়, একসট্রিম সাউথে ফিরতে হবে। তার বাস পাওয়া, পার্ক স্ট্রিটের দিকের গেট থেকে বেশ দুরূহই। কেন না বাস তো চট করে ওখানে থামতে চায় না। বিশেষ করে সরকারি বাস। মিনিবাস, প্রাইভেট বাসও কি হাত তুললেই দাঁড়ায়? বললেই দাঁড়াবে।

তখন দুপাশ দেখতে দেখতে সাবধানে চওড়া রাস্তা পেরিয়ে এদিকের ফুটপাথে উঠে পড়ার আগেই মিনিবাসের তীব্র আলো। সেই হেডলাইট চোখ ঝলসে দেয়। আর হাত তুলতেই কীভাবে যেন গতি কমে যায় তার। আর পাদানিতে নিজেকে কোনোরকমে উঠিয়ে নিতে নিতে টের পায় বাইশ-তেইশ তার ঠিক পেছনে সবে কয়েক বছরের পুরনো ইউ এস আই এস-এর নতুন অফিস। সেখানে খানিকটা বাংকার কায়দায় ঘেরাটোপের আড়ালে পুলিশ, সি আর পি। হয়তো বা আধা ফৌজিও। তাদের রাইফেল নলে বারো ঘণ্টা বন্‌ধের পর কলকাতার নিয়ন আলো আর চাঁদ একই সঙ্গে লুটোপুটি খাচ্ছে।

হয়তো সেই ঘেরাটোপ থেকেই নয়, পাগে দাঁড়ানো কোনো টুপি রাইফেল ইউনিফর্ম—এক সঙ্গে খিঁচিয়ে উঠল। পাঁচ অক্ষরের হিন্দি গালাগাল। তারপরই একই সুরে—তেরা মা-কা—

হাতের এস এল আর, তার সঙ্গে উদ্ধত গোঁফ, টুপির খানিকটা আস্ফালন—সব মিলিয়ে বড়োই কঠিন সময়। আর পাদানির ওপর উঠে পড়ে বাইশ-তেইশের মনে হল এই তো রাষ্ট্র। তখনও অন্ধ্র বিহার হয়ে রাইফেল ট্রেনিং, গেরিলা ওয়ার ফেয়ারের নানা কায়দা, মাইন তৈরি ও ফাটানর কৌশল শিখে তার ফিরে আসা হয়নি এই জঙ্গল ভূমিতে।

কিছুদিন আগে ও শহরে গিয়ে খানিকটা হাঁফ ছেড়ে একটা প্রাইভেট শো-তে সৌমিত্র দস্তিদারের করা মণিপুরের ওপর একটা ডকুমেন্টারি—যেখানে অসম রাইফেলসের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়ছে মণিপুরের ছাত্র-যুবরা, মেয়েরা। সেখানে ইনডিয়ান আর্মি কেমন করে সন্ত্রাস দমনের নামে অন্য রকম সন্ত্রাস চালাতে চাইছে, সেই রাষ্ট্রের দাঁত-নখ—বার বার ফুটে উঠতে থাকে চোখের সামনে।

একটা সিডি—সৌমিত্রর ওই ডকুমেন্টারির। দেখতে দেখতে চোয়াল শক্ত হতে থাকে। মনোরমা নামে সেই মেয়েটি, যাকে কিনা আর্মি রেপ করার পর তার প্রাইভেট পার্টসে গুলি করে, পর পর। যাতে কিনা মুছে যায় ধর্ষণের চিহ্ন। আর রাষ্ট্র তো বলাৎকারের ছবি, নিজের নষ্টামির সাক্ষ্য মুছেই দিতে চায়।

এই মোছার চেষ্টা তো তার বরাবরের।

রাষ্ট্র এ ভাবেই সব কিছুকে একটু একটু করে খেয়ে নেয়। তার স্বভাবসিদ্ধ অজগর-ধর্মে। ময়াল যেভাবে আস্তে আস্তে গ্রাস করে হরিণ শিশু বা ছাগল ছানা। এমনকি মনুষ্য শাবকও।

মণিপুরের ইরাবত সিং, তাঁর তৈরি লাল ফৌজ, তখনকার কমিউনিস্ট পার্টি, সেই সময়কার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রতিরোধ সংগ্রাম। ইরাবত সিং তখন মণিপুরের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। হয়তো বা লোকগাথায়। কিংবা হতে পারে মায়েদের ঘুমপাড়ানি গানের সঙ্গেও। এত অবশ্য এরকম নয়, সেলিম জাভেদের 'শোলে'র চিত্রনাট্য যেরকম হয়, সে রকম করে—শো যাও বেটে, গব্বর আ রহা হ্যায়, তেমন কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, পারস্পরিক বিশ্বাসে সাধারণ মানুষ মনে রাখে তাঁদের।

বাইশ-তেইশ এসব জেনেছে সৌমিত্র দস্তিদারের ছবির সিডি দেখে। রণাঞ্চল ছেড়ে শহরে গেলে বড্ড অস্বস্তি হয়। মধ্যবিত্ত মন, থেকে যেতে চায় শহরে। রাজপথ, গাড়িঘোড়া, কফিহাউস—বড় মায়াময়। কত স্মৃতি যে জাগে। নগর তো এমনই কিনা। গ্রাস করে। খেয়ে নিয়ে থাকে একটু একটু করে। কলকাতা, কলকাতা। বাস, ট্রাম, জ্যাম, ডিজেল-গন্ধ—শীতকালে দলা দলা কফ হয়ে ঝুলে থাকা কুযাশা বা ধোঁয়াশা—যাই বলি না কেন, তবু তো জীবন থাকে। মিছিলে মিছিলে, পোড়া পেট্রোল আর মবিলের গা ওলটানো গন্ধ—সব মিলিয়ে এত আমারই শহর। শহর কলকাতা।

কফি হাউসের উলটো দিকে সাজান বকুল-বৃক্ষটি থেকে বড় অবহেলায় ফুল ঝরে। গন্ধ বিলোয়। সেই বকুল পুষ্প, বকুল-ঘ্রাণ চটকে যায় ভারি জুতোর নীচে। তবু বকুল ফোটে। তবু তো ফুল সুঘ্রাণ ছড়ায়। এসব কথা মনে করতে করতে বাইশ-তেইশের মনে হয় আসলে এসবই কি বুর্জোয়া ভাইসেস বা ফিউডাল অবশেষ। যেরকম করে জীবন গড়াতে থাকে।

বাইশ-তেইশের হাই ওঠে। বার্ষায় পাতা পচা গন্ধ, বনের আশ্চর্য এক ঝিমঝিমে ঘ্রাণ তাকে চাঁদের দিক থেকে অন্য কোথাও টেনে নিয়ে যেতে চায়। তার হাইয়ের বাতাস ফুসকুড়ি এঁকে দিতে থাকে জ্যোৎস্নায় গায়ে।

জ্যোৎস্না আপন খেয়ালে গড়ায়।

বইমেলা থেকে বেরিয়ে এপারে চলে এসে আমেরিকান লাইব্রেরির পাশে এসে বন্‌ধের বাজারে হাত তুলে মিনিবাস থামানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই খাকি উর্দি বুট টুপি গোঁফ এস এল আর-এর ধমক ধামক, খিস্তি—তার চোখে জ্বলেজ্বলে শ্বাপদ, দুচোখেই।

বাইশ-তেইশ তখনই বুঝে যেতে পারে এই তো, এই তো রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র ভারি বোঝা চাপিয়ে দেয়।

একজনকে, দুজনকে—অনেক জনকে সেই বোঝা নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

দলপতির চোখের মণিতে চাঁদ ঝুলে থাকে। তার দলবল, মেয়ে হাতিরা, বাচ্চারা—সবাই স্থির। মাইন ফাটার পর জঙ্গল তছনছ হয়ে যাচ্ছে। খোঁজাখুঁজি, চিরুনি তল্লাশি চলছে খুব। যেমন হয়।

খাকি উর্দি। সবুজ উর্দি।

টুপিও অনেক রকমের।

হরেক ডিজাইন।

ক্লেমোর মাইন তারা তৈরি করল কীভাবে? এর নো হাউ এল কোত্থেকে? সবটাই কি এল টি টি ই-র কানেকশন? অন্ধ্র হয়ে আসছে সমস্ত বিস্ফোরক। ফাটানর ট্রেনিংও হচ্ছে অন্ধ্রে, বিহারে।

টার্গেট।

টার্গেট।

টার্গেট প্র্যাকটিস।

বাইশ-তেইশ জানে নিশানা নিখুঁত না হলে কিছু করা যায় না। একদম সঠিক নিশানা। নড়তে দেওয়া যাবে না। এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে জঙ্গলের মধ্যেই।

ভুল খবর দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ভুল খবরের টোপ দিয়ে ডেকে এনে অ্যামবুশ। বদাম। বদাম। বারুদের গন্ধ। জিপ উড়ে গেল। ট্রাক উড়ে, মুখ থুবড়ে আগুনের গোলা পাকিয়ে এক ভয়ানক আওয়াজদার বোমা হয়ে ফেটে পড়ল।

ধোঁয়া। চিৎকার।

গাছের ডালে ঝুলিয়েও নাকি ফাটিয়ে দেওয়া যায় নিজেদের তৈরি মাইন, এমন ডিভাইস আছে হাতের মধ্যে।

বর্ষায় বনের গন্ধ বদলে যায়।

ভিজে মাটি, একটু কম, সামান্য বেশি পচে ওঠা পাতারা কী এক ঝিমঝিমে ঘ্রাণ ছড়িয়ে দিতে থাকে বনের মধ্যে। কত রকমের ফুল ফোটে। তাদের গন্ধবাহারও বড় তীব্র, তীক্ষ্ণ।

বারুদের গন্ধ বুনো ফুলের গন্ধের কাছে হেরে যায় কি? তীব্র সুরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকে বনের ছায়ায় ছায়ায়। ঘাসের ফাঁকে। আরও কত রকমের পোকা-মাকড়ের চিৎকার। তার শব্দে কান পাতা যায় না।

তোমরা মাইন ফাটাও কেন? উফ, কী ভীষণ শব্দ! সহ্য করা যায় না। হুলা পার্টির পটকা থেকেও অনেক অনেক জোরাল আওয়াজ। আগুনের ঝাঁঝও তীব্র। অসম্ভব জোরে ঝলসে ওঠে আগুন।

রাষ্ট্র, সরকার আমাদের ভাষা বোঝে না। ভাষা বোঝাতে গেলে মাইন ফাটাতে হয়। বাইশ-তেইশ আকাশের দিকে মুখ তুলে এসব কথা বলে।

তোমাদের শ্রদ্ধেয় নেতাও তো তাই বলেন।

হ্যাঁ, বলেন তিনি। এ আর নতুন করে বলার কী হল?

এখন দেখছি তুমিও তো তার গলাতেই কথা বলছে?

কার গলায়?

কেন, শ্রদ্ধেয় নেতার।

এ রকম কথা ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, বসন্ত বিশ্বাসরাও বলেছিলেন।

কবে?

কেন, দিল্লিতে বোমা ফাটানর পর। বড়লাটকে তাঁরা ভারতবাসীর কথা শোনাতে চেয়েছিলেন।

তখন আর এখন কি এক হল?

কেন? আলাদা কী!

তখন দেশ পরাধীন। ব্রিটিশ আমাদের মাথার ওপর রাজ করছে।

এখনই বা আমরা কতটা স্বাধীন? তোমার রাস্তা খোলা থাকছে? বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না তোমার চলার পথ? তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎকেন্দ্র। নতুন নতুন ঘরবাড়ি, ফসলের ক্ষেত। ভিডিও হল, মদের দোকান, তাড়ির ঠেক—সবই হচ্ছে। তুমি কি চলাফেরায় স্বাধীন?

দলপতি বাইশ-তেইশের এই জিজ্ঞাসা শুনে চুপ করে থাকে।

তার মুখে উত্তর জোগায় না। শুধু চোখের মণিতে ভেসে থাকা চাঁদের ছায়া, সেদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়েও থাকা যায় না, দেখতে দেখতে মনে হয় সমস্ত চরাচর বুঝি বা চলে গেছে কোনো অলীক ঘোরের মধ্যে।

চাঁদের রঙে, ছায়ায় আলোয় দলপতির পাহাড় পাহাড় সারা গায়ে কী এক অজানা কারুকাজ। বাইশ-তেইশ এ. কে ফরটি সেভেনের ট্রিগার হাত রেখে কান খাড়া করে থাকে। রাত চরা পাখির ডানার শব্দ, শেয়াল বা বুনো খরগোশ নয়তো সজারুর আসা-যাওয়া তাকে সতর্ক করে। আরও খানিকটা কাঠ কাঠ হয়ে দাঁড়াতে হয়।

স্কোয়াড, দলম, আর্মড স্কোয়াড। গেরিলা ফৌজ—কত রকমের কত না নাম আমরা বলি। মিডিয়া বলে।

আসলে মানুষ জাগছে কিনা, সংগ্রামের সঙ্গে আসছে কিনা, সংগ্রাম চাইছে কিনা আদৌ—এটা একটা বড় ব্যাপার! মানুষকে বাদ দিয়ে তো কখনও কিছু হয় কি? হয় না। হওয়া সম্ভব নয়।

জঙ্গলের মধ্যে ভ্রাম্যমান স্কোয়াড নিয়ে মুহূর্তে ঘুরতে প্রতি মুহূর্তে পুলিশ বি এস এফ মিলিটারির সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে হয়—একুশ-বাইশ পারে।

অ্যাটাক। পালটা আক্রমণ। অ্যামবুশ। গোরিলা স্কোয়াড কোথা থেকে কোথায় যায়। পেশাদার বিপ্লবীদের বিপ্লব ছাড়া আর কিছুই ভাবনায় থাকতে নেই। মুক্তি। মানুষের সার্বিক মুক্তি। শোষণহীন সমাজ।

চাঁদের ভুলভুলাইয়ার নীচে দলপতিকে একদম অন্যরকম লাগে। তার থোড় রঙের দাঁতে জ্যোৎস্নার মায়া-মসলিন। দলপতি তার দলের মেয়ে-বাচ্চা, মাঝবয়েসি, সবাইকে আগলে রেখেছে। তার গায়ের চামড়ায় সময়ের ভাঁজ। ইতিহাসের পুরনো ধুলো। কিছু পোকামাকড়, ডাঁশ, মাছি। যারা রক্ত চুষে খেতে চায় দলপতির।

কি দরকার বল তো মাইন ফাটিয়ে? দলপতি আবারও জানতে চায়।

তোমাদের মাইনের শব্দে ছিটকে পালায় পাখ-পাখালি, সজারু, শেযাল, রেজি, ভাম। আমরাও ভয় পাই। ভাবি বড় কোনো হুলা পার্টি এসেছে, যারা সর্বস্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের ওপর।

কোমর বন্ধ কে তৈয়ার হো
মজদুর ভাইয়ো
হম ভুখ সে মরনেওয়ালে
কেয়া মওত সে ডরনে ওয়ালে
আজাদিকা ডংক বাজাও
উঠাও অগ্নিধ্বজা...

হম ভুক সে মরনেওয়ালে—গুন গুন করতে থাকে বাইশ-তেইশ। তার মনে হতে থাকে—এ গান সেই আই পি টি এ পর্বের। এ গান সেই বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টি বর্বের। যখন তেভাগা, তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ, চন্দনপিঁড়ি, লালগঞ্জ, অহল্যা-মা, গজেন মালী—সবাই একটু একটু করে ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে।

এসব তো এখন ইতিহাস।

সব কিছু আর্কইভে আছে।

বসে গবেষণা করো। থিসিস লেখো। পেপার সাবমিট করো। সেমিনারে হাজির হও। কাগজের বাক্স বন্দি চিকেন চাওমিন, মিনারেল ওয়াটার, দামি স্যান্ডুইচ, কফি—সব মিলিয়ে সে এক মোচ্ছব! কিন্তু চন্দনপিঁড়ির রাস্তায় যাওয়ার নাম কোরো না। অহল্যা নামে শহিদ বেদি হোক, সভা হোক তাতে ঝিনিক পিনিক ঝিনিক পিনিক লাল-নীল টুনি বাল্ব জ্বলুক, কিন্তু ভুলেও চন্দনপিঁড়ি, লালগঞ্জের রাস্তা নিও না। অহল্যা মায়ের ছেলে নাতিরা অনেকেই কংগ্রেস রাজনীতি করে। কাটা হাত না ঘাসফুল—সে অবশ্য জানা যায়নি। কিন্তু তারা কেউ লালা ঝান্ডার দিক মাড়ায় না। কেন মাড়ায় না?

গজেন মালী, সত্য মাস্টার—সবাই কি ভুল করল? কাকদ্বীপ ভুল, তেলেঙ্গানা ভুল? বনের ভিজে গন্ধে মাথার ভেতর ঘুম ঢুকে পড়তে চায় বাইশ-তেইশের। চাঁদ তার আরও খানিকটা ঘোলা আলো কুলকুচি করে পাঠিয়ে দেয় পৃথিবীর দিকে। সেই জ্যোৎস্নায় কিছু বা আলগা আলগা নেশা জড়িয়ে থাকে।

হাওয়া দিচ্ছে ধীরে।

চাঁদে ভেজা দলপতি আবারও জানতে চাইল, তোমরা মাইন ফাটাও কেন? কারণে অকারণে।

বললাম তো।

কী বললে!

ঐ যে বললাম, আমরা রাষ্ট্রের কানের ভেতর জল ভরে দিতে চাই।

সবাই তোমরা একই ভাষায় কথা বলতে থাকো কেন বল তো! সকলেই এক সুরে কথা বল। যেন অরণ্যদেবের ঢাক। ডেনকালির জঙ্গলে বেজে উঠল। তারপর বাজল তো বাজলই। বেজে চলেছে। গুরান, মজবুড়ো, ডায়না পামার, কিলাউয়ির সোনাবেলা, খুলিগুহা, সলোমন আর নেফ্রিতিতি নামে দুই ডলফিন—সবাই শুনছে। শুনছে আর শুনছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। প্রশ্ন করছে না। সকলেই চুপ করে আছে কেমন। তারপর সেই ঢাকের ঢেউ উড়তে উড়তে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। সংকেত হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে দ্রুত। তোমাদের কথাও সেই রকম। সবাই একই সুরে, এক লয়ে বল—যখন বলতে থাকো। কী আশ্চর্য। তবু তোমাদের কথা শুনতে মন্দ লাগে না।

দলপতির কথা শুনে বাইশ-তেইশ ম্লান হাসল। তার হাসির রেখায় বিঁধে গেল চাঁদ। দূরে আবারও শোনা গেল রাতচরা পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ।

তোমরা মাইন ফাটাও কেন?

বললাম তো।

এটা কোনো উত্তর নয়। দলপতি যেন বা গুঙিয়ে উঠল। তারপর বলল, জানো মাইনে, মাইন ব্লাস্টে কী সর্বনাশ হচ্ছে জঙ্গলের। পরিবেশের। প্রজাপতিরা ভয় পেয়ে যাচ্ছে. তাদের পাখায় আগুন। পুড়ে যাচ্ছে ঘাস। আকাশের গায়ে কারা যেন এঁকে দিচ্ছে বারুদের ধোঁয়া। এর মধ্যে বাঁচা যায়। বাঁচতে পার তুমি?

কী করব বল! আমরা যে সৈনিক। সৈনিকের কাজই হল আদেশ পালন করা—ডু আর ডাই। তাই তো করছি।

কিন্তু এতে কি বিপ্লব এগোবে? এভাবে এগোয় বিপ্লব? পারবে তোমরা সেই কাজটা করে ফেলতে যা তোমরা চাইছ!

বাইশ-তেইশের এ. কে ফরটি সেভেনের নলে চাঁদের কান্নাকাটি। সেখানে বেশিক্ষণ চোখ রাখা যায় না। ঠাণ্ডা ইস্পাতের নল প্রতীক্ষায় থাকে বুলেট বমি করার আদেশের।

দলপতির কথার কোনো জবাব দিতে পারে না বাইশ-তেইশ।

দূরে আবারও রাতচরা পাখি ডাকে।

সেই নিশিডাকে দুম দুম করে ওঠে কারও কারও সমস্ত শরীর। বাইশ-তেইশের এসব অভ্যাস আছে। তাকে শুধু সতর্ক থাকতে হয়। আদেশ পালন করতে হয়।

দূর দলমা থেকে নেমে এসে কোথায় যাব বুঝতে পারছি না। কোন দিকে চলে যাব। কেমন করে ঘরে ফিরব, সবাই এখন বড় এক ধাঁধা আমার কাছে। কীভাবে ফিরব ঘরে? মনে মনে ভাবে দলপতি।

আমিও কি ফিরতে পারব নিজের বাড়ি? কখনও? বিপ্লবের আগে, পরে কিংবা মাঝপথে? আদৌ ফেরা হবে কি কোনোদিন? হয়তো এসব জিজ্ঞাসা, ইচ্ছে—নেহাতই মধ্যবিত্তসুলভ, পাতি—পাতি বুর্জোয়া ব্যাপার স্যাপার, দগদগে

ভাইসেস, পচাগলা বুর্জোয়া চিন্তা। কিন্তু তবু তো ঘরে ফিরতে চায় পাখি। ঘরে ফেরেও। বিপ্লবীর ঘরে ফিরতে চাওয়া কি অন্যায়?

ভাবতে ভাবতে হাই ওঠে বাইশ-তেইশের।

দূরে ভিজে পাতার ওপর জেগে উঠল কি কোনো ভারি ফৌজি বুটের শব্দ?

এসপিওনেজ।

কাউনটার এসপিওনেজ।

অ্যাটাক।

কাউনটার অ্যাটাক।

সব মিলিয়ে কী এক সমাহিত জাদুঘোর।

চাঁদের দিকে না তাকিয়েই ট্রিগার শক্ত করে আঙুল রাখল বাইশ-তেইশ।

বার

চাঁদ ছোঁয়া অন্ধকারে রাজশেখর সান্যাল দেখতে পেলেন বনমালাকে। যেমন আসে বনমালা জ্যোৎস্নায়, এ আসা ঠিক তেমনই। হাওয়ায় বর্ষার জোলো গন্ধ মিশে আছে। পেছনে ধীরে বয়ে চলা জলঙ্গি, তার বুকে জলের সঙ্গে খেলতে থাকা চাঁদ, সামনে অনেকক্ষণ ধরে সাঁতরে নদী পেরিয়ে আসা দুই হাতি, তাদের গায়ে বসে থাকা জোনাকিদের আলোকিত আড্ডা, সবার মাঝখানে বনমালা।

বাতাসে ট্যালকম পাউডারের চেনা গন্ধ মিশছে ধীরে।

বনমালা, বনু—ফিসফিস করে ডাকলেন রাজশেখর সান্যাল।

কোনো সাড়া নেই।

বনু, শুনতে পাচ্ছ—খানিকটা যেন বাংলা সিরিয়ালের ডায়ালগ থ্রো করছেন, অনেকটা যেন এমন ভাবেই ডেকে উঠলেন রাজশেখর।

নদীর পাড়ের হাওয়াও যেন ফিসফিস করে উঠল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

বৈতাল ঋষিদাস এই আবছা অন্ধকারে বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে। কী করবে এখন ধূলিচন্দন এস্টেটের সান্যালবাড়ির মাইজাকর্তাকে নিয়ে, কিছুই বুঝতে পারছে না।

মেঘডম্বরু, মেঘপাল—খুব আস্তে আস্তে ডাকলেন রাজশেখর।

দুই হাতি নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে কান নাড়তে লাগল শুধু।

মাইজাকর্তা এরা ইনডিয়ার বন থিকা বাইরাইসে। তারপর নদী সাতরাইয়া চইল্যা আসছে বাংলাদ্যাশে। মেঘপাল, মেঘডম্বরু মইর‍্যা ভূত হইয়া গেসে গিয়া। সেই কবে, পাকিস্তান হওনের সময়। তারা বর্ডারে বইয়া আসিল। পাকিস্তানের পুলিশ ওগো আটকাইল।

খাবার নাই, জল নাই। ও হো—দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললেন রাজশেখর। তোমাগো ফালাইয়া আসলেন ঠাউরদা। আমি আসছি তোমাগো কাছ থিকা ক্ষমা

চাইতে। মাফ কইর‍্যা দ্যাও। আমারে মাফ কইর‍্যা দ্যাও। সান্যালগো মাফ কইর‍্যা দ্যাও। রাজশাহির ধুলিচন্দন গ্রামের দশ আনি সান্যাল গো মাফ কইর‍্যা দ্যাও।

বলতে বলতে ফুঁপিয়ে ওঠেন রাজশেখর। যেমন সাধারণভাবে ফোঁপায় বাচ্চারা।

মাইজাকর্তা! মাইজাকর্তা! শোনেন শোনেন। বৈতাল ঋষিদাস তার গলা থেকে খুব সমবেদনা মাখা স্বর বার করে ডেকে ওঠে রাজশেখরকে।

দু হাতের চেটোয় দুই চোখ চাপা দিয়ে সামান্য নিচু হয়ে ফোঁপাচ্ছেন রাজশেখর।

বাতাসে ট্যালকম পাউডারের গন্ধ ছড়াচ্ছে ধীরে।

চাঁদের বিধুর আলোয় বনমালার এক রাশ ঢল নামা খোলা চুল, লালা পাড় কোরা রঙের তাঁত শাড়ি কেমন করে যেন মিশে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার সঙ্গে।

'ভাঙা ঘরে দু দিনেরই খেলাঘর...'

গীতা দত্তর মায়া মাখা গলাতেই কি গেয়ে উঠল বনমালা?

ছেলে, ছেলের বউ, মেয়ে—সবাই ডাক্তার—তবু তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে বনমালা? রাজশেখর নিজের কাছেই যেন জানতে চান নিজে।

আমি তো মরে গেছি। নেই আর। যাকে বলে মরে ভূত।

যার পোলায়, পোলার বউ, মাইয়া হগগলে ডাক্তার—সে মরব ক্যামনে? সে কি মরতে পারে কখনও? হেইডা সম্ভব?

রাজশেখর সান্যালের এই কথায় শব্দ করেই হেসে ওঠে বনমালা। দূর অন্ধকারে তার শাড়ি আঁচল ছড়িয়ে উড়তে থাকে।

তুমি কি এখনও খয়ের ছাড়া পান খাও? জানতে চান রাজশেখর।

কথায় কোনো উত্তর আসে না। শুধু শব্দহীন হাসি হাসে বনমালা। তার সেই হাসির রেশ আলো হয়ে মিশে যায় চাঁদের আলোয়।

কেমন আছ তুমি বনু?

কোনো উত্তর নেই। শুধু চাঁদের আলোয় উড়তে থাকে তার শাড়ির আঁচল। রেশম রেশম চুল। সেই দীর্ঘ কেশভারের দিকে তাকিয়ে থাকলে কেন যেন আষাঢ় শ্রাবণের ঘন মেঘদলকে মনে পড়ার পুরনো উপমাই ভেতরে ভেতরে ভেসে ওঠে রাজশেখরের।

মানুষের কেন বয়স হয় বনু?

কেন যে বড় হয়। বুড়ো হয়। তারপর মরে যায়। কেন মরে যায়?

মরে যাওয়ার পর কোথায়, কোন নিরুদ্দেশে চলে যায় সে। আর ফেরে না। ফিরতে পারে না। নাকি ফেরে?

অন্ধকারে দাঁড়ান দুই হাতি অল্প অল্প মাথা নাড়ে।

জ্যোৎস্না ছোঁয়া আঁধারে নড়ে ওঠে তাদের দু জোড়া কান। একই সঙ্গে।

এই তো জীবন।

এই বাঁচা। বেঁচে থাকা।

মরা। মরে যাওয়া।

মেঘডম্বরু, মেঘপাল! বুকের ভেতর থেকে জমে থাকা হাজার হাজার মাইল কষ্ট যেন এক সঙ্গে বের করে আনেন রাজশেখর। তোমাদের নিয়ে যেতে পারেননি আমার ঠাকুরদা ভূপতিরঞ্জন সান্যাল, নিয়ে যেতে পারেননি, নাকি নিয়ে যেতে চাননি! এ নিয়ে মনের ভেতর ভেতর অনেক জিজ্ঞাসা লুকিয়ে আছে আমার। মানুষ কেন এরকম হয়! এত নির্দয়! এতটাই নিষ্ঠুর।

বনমালার কুয়াশা কুয়াশা শরীর ছুঁয়ে আকাশের চাঁদ একটু একটু করে হেলে যেতে থাকে যেন পুবে, আরও পুবে হেলে পড়ার জন্যই যেন তার ভেসে থাকা আকাশের গায়ে। চাঁদে নদীতে কাদায় জলে কান্নায় মাখামাখি সে এক আশ্চর্য অবস্থা।

বৈতাল ঋষিদাস অবাক চোখে দেখছে মানুষটাকে। এই সেই ধূলিচন্দনের দশআনি সান্যালবাড়ির মাইজাকর্তা! কি আশ্চর্য, মানুষটা এখন কেমন যেন পোলাপানের লাখান কানতাসে।

দূরে চাঁদের ছায়া জলঙ্গির জলে নিজস্ব ছবি হয়ে ভেসে আছে।

বনমালা! বনমালা! বনু! হাওয়ায় হাওয়ায় ফিসফিস করে ডেকে উঠলেন রাজশেখর।

কোনো সাড়া নেই।

শব্দ নেই।

হাতি গো নিয়া আমি ফিরুম। ঐপারে—ইনডিয়া। রাজশেখর সান্যালের এই কথার সঙ্গেই যেন গলা মিলিয়ে ডেকে উঠল জোড়া তক্ষক।—খক খক। খক খক। খক খক। একবার দুবার, তিনবার।

বনমালার কাছাকাছি হওয়ার জন্য এক পা দু পা করে সামনে হাঁটতে থাকলেন রাজশেখর। তাঁর হাত জোর করে টেনে ধরল বৈতাল ঋষিদাস।

আমারে ছাড়, হারামজাদা।

মাইজাকর্তা কই যান আপনে?

ক্যান চক্ষে কি কিসুই দ্যাখ না তুমি?

কম দেখি।

তোমাগো মাইজা মা-রে দ্যাখ না!

বৈতাল কোনো উত্তর দেয় না। শুধু বলতে থাকে, আপনে আর আউগাইয়েন না মাইজাকর্তা। সামনে মায়াহস্তি, মাইজা মা নাই।

তুমি অন্ধ হইয়া গেছস। পুরা অন্ধ। আমি তারে দেখতাসি। তারে সাথে লইয়া মেঘডম্বরু আর মেঘপালের পিঠে উইঠ্যা আমরা দুইজনে ধূলিচন্দন যামু। আমাগো

গেরাম। আমাগো বাড়ি। আমাগো পুখোইর। সেহানে গিয়া বনমালা গান গাইব। গীতা দত্তের গান।

দূরে তক্ষক ডাকল আবার।

চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাওয়া চরাচর, নদী, দুই হাতি—সবাই এই আলোর ছায়ায় কেমন যেন মায়া জড়ান।

মেঘপাল, মেঘডম্বরু—একখান দ্যাশ ভাইঙ্গা দুইখান হইল। তোমরা আটকাইয়া গ্যালা বর্ডারের ঐপারে। তোমাগো নিয়া আসতে পারলাম না।

কেমন যেন হাহাকারে ভেঙে গেল রাজশেখরের গলা।

বনু, তোমারেও তো দ্যাখতে পাই, ছুইতে পারি না। ক্যান পারি না ছুইতে! ক্যান পারি না! আমি কি অ্যাতডাই আকামের। এক্কেরে যারে কয় ছাইডা, কলাডা। অপদার্থ!

ট্যালকম পাউডারের মৃদু গন্ধ ছড়ায় বাতাসে।

আপন মনে বিড় বিড় করেন রাজশেখর। তোমারে হগগলেই ভুলতে বসছে বনু। কে আর মনে রাখে কারে? মনে করতে চায়! পোলারা, পোলার বউ, মাইয়া—হগগলেই ডাক্তার। হেয়াগো ব্যাবাক প্র্যাকটিস। দুই কানে দুই খান মোবাইল ফোন। দুই, দুইখান ঝক ঝইক্যা গাড়ি। হেই গাড়িতে আবার এসি ফিট করা। তারা ফেমিলি লইয়া শপিং করতে, বেড়াইতে যায় সিঙ্গাপুর, মরিশাস, ব্যাংকক। এসব যাওয়া আসা তাগো কাছে জলভাত। সবই রুগী গো পয়সায়। ওষুধ কোম্পানির দেওয়া টাকায়। মায়েরে স্মরণ করনের সময় কোথায় তাগো! নিজেগো নিয়া তারা অসম্ভব ব্যস্ত। তাগো শেয়ার আছে একাধিক নার্সিংহোমে। টাকা খাটে। টাকার পাহাড়ের উপর বইয়া রইসে হ্যারা।

সোহাগ—আমার বুইন, একমাত্র সে-ই তোমার কথা বলে মাঝে মধ্যে। কিন্তু এই যে সেদিন গ্যালাম বিরাটি, বুইনের লগে দ্যাখা করণের লাইগ্যা, সেই দিন কিন্তু তোমারে নিয়া কোনো কথা হইল না সোহাগের লগে।

রাতজাগা কি একটা পাখি অদ্ভুত ডাক ডেকে উড়ে গেল ডানা ঝাপটে ঝাপটে মাথার ওপর দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তাল মিলিয়ে ডেকে উঠল তক্ষকেরা। ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল বৈতাল ঋষিদাস।

একই সঙ্গে কতরকম ঘটনা হয় পৃথিবীতে। আমরা তার কতটুকুই বা খবর রাখি। 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর মালিক কাম রিং মাস্টার এস. আয়েঙ্গার একা একা চাঁদের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবন নিয়ে লোপালুপি খেলছে মনে মনে।

দেখতে দেখতে বয়স গড়িয়ে গেল। এবার কোনো একটা জায়গায় গিয়ে একদিন হঠাৎ থেমে যাবে। একদম ফুলস্টপ।

তারপর?

এই সার্কাস, আরতি, ডাব্বু—তারা পড়ে থাকবে। পেছনে থেকে যাবে সব কিছু। শুধু আমিই থাকব না। একা একা চলে যেতে হবে। সেই যাওয়াটা—ভাবলেই ছম ছম করে ওঠে মনের মধ্যে।

আকাশে মেঘের টুকরো-টাকরা ছড়িয়ে আছে এদিকে-সেদিক।

তাদের কারও কারও গভীরে জমে আছে বৃষ্টির ভারি ফোঁটা। কখনও হঠাৎ হঠাৎ বর্ষণ হয়ে ভেঙে পড়বে তারা।

আরতি আমার থেকে বয়সে কত ছোট। স্বাভাবিক ভাবেই সামনে তার লম্বা জীবন। কিন্তু ছেলেটা—ডাব্বু, তাকে নিয়ে তো নাটা ঝামটা হতে হবে আরতিকে। সারা জীবন, যত দিন বেঁচে থাকবে, তত দিন। একি অভিশাপরে বাবা। ভেবেছিলাম সন্তান হলে তার হাতে কিছু কিছু দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যাবে। সে হল যা হোক। পুত্র সন্তানই হল। ছেলে। আরতির বড় শখ ছিল ছেলের। আমিই বরং ভাবতাম যদি একটা মেয়ে হয় ফুটফুটে। আমাকে খুব আদর করবে। দেখাশুনো করবে। সারাদিন বাবা বাবা বাবা বলে নেচে বেড়াবে পায়ে পায়ে।

চাঁদের আলোয় বুক ভিজে যাচ্ছে আয়েঙ্গারের। চওড়া পিঠও। বুকের কোঁকড়া কোঁকড়া শাদা লোমে আঠাল জ্যোৎস্নার নিপুণ আলপনা। নিজের বুকের পেকে ওঠা লোম আয়নার সামনে দাঁড়ালে বড় বেশি চোখে পড়ে। আর যত চোখে দেখি, ততই মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় বয়স বেড়ে গেল। বয়স বেড়ে যাচ্ছে।

কিছুদিন আগে আগেও দাড়ি কামানোর কায়দায় বুকের পাকা লোমও কামিয়ে পরিষ্কার করে ফেলতাম। বেশ কিছু দিন হল সেই ইচ্ছেও কেমন যেন চলে গেছে। কিছুই আর ভালো লাগে না। খালি মনে হয় কী হবে করে এসব! যেমন চলছে চলুক। গতানুগতিক, ভাঙা ইঞ্জিন যেমন চলে। কিছুতেই আর তেমন করে আগ্রহ হয় না। টাকা হাতে পেলে তবু খানিকটা উত্তেজনা হয়। কারণ বাঁচতে টাকা লাগে। তার ওপর ডাব্বুর চিকিৎসায় বিপুল খরচ আছে।

ইদানীং সারা দিনই কি রকম একটা ঘুম ঘুম ভাব জড়িয়ে থাকে। কেমন আনমনা আনমনা সারাক্ষণ। হাই ওঠে। বিরক্তি লাগে কথা বলতে। শুধু এটুকু—মানে বোতল, গেলাস সাজিয়ে সেকেনড শো শেষ হলেই বসে পড়া, তার মধ্যে কোথায় যেন রিলিফ। মস্ত রিলিফ। কিন্তু এতেও তো শরীর ভাঙে। দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে সব কিছু। একটু একটু করে কমজোরি হয় ভেতর, বার। তাকে কে সামাল দেবে। মেজাজ অসম্ভব তিরিক্ষি থাকে আজকাল। সব ব্যাপারেই রাগ আর ক্ষোভ। সামান্য কিছুতেই রেগে উঠি। রাগ হয়ে গেলে হাতও চালিয়ে দি মাঝে মাঝে। লাড্ডু, টুপি, কুতু, কাতু—এই যে চার জোকার 'দ্যা গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এ তারা মার খায়।

চাঁদের ধোঁয়া ধোঁয়া আলো আয়েঙ্গারের গ্লাসে রাখা দিশি মদে একবার ডোবে একবার ভাসে। শুয়ে থাকা একটু দূরের বোতলটি বলে দেয় আজ বেশ ভালা

মতোই খাওয়া হয়েছে। এরকমই প্রায় রোজ হয়। খেতে খেতে খেতে এক সময় ফুল আউট হয়ে গিয়ে তারপর টুক করে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

এক সময়কার আরতি নন্দী, এখনকার আরতি আয়েঙ্গার—'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর ট্রাপিজ গার্ল মাঝে মধ্যেই দূর থেকে আয়েঙ্গারের পান-পর্ব দেখে। আজকাল বেশির ভাগ সময়েই একা একা খায় লোকটা। আগে তাও আমায় ডাকত। গ্লাসে ড্রিংকস ঢেলে দিয়ে সামনে নিয়ে বসতে বলত। তারপর খানিকটা খাওয়া হয়ে গেলে বক বক বক বক। অনেক কথা বলে যেত।

এখন চুপচাপ খায়। একা একা। নিঃশব্দে। তারপর খেতে খেতেই গড়িয়ে পাড়ে একসময়।

আয়েঙ্গারের সামনে গ্লাসের টলটলে ড্রিংকসে আরতির ভাঙা ছায়া কি ডুবে গেল? এক সময় আরতিকে নিয়ে বড় আনন্দ ছিল। দেখলেই ধরতে ইচ্ছে করত। ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করত। যখন তখন, সময় অসময় নেই। এমনকি ডাব্বু হয়ে যাওয়ার পরও।

আরতি মাঝে মাঝেই চোখ পাকিয়ে বলত, কি হচ্ছে কি! দিন নেই, দুপুর নেই লোকজনের আড়াল মানামানি নেই। যখন তখন যা ইচ্ছে। একদম হাঁস-মুরগির মতো। যেমন ইচ্ছে হয়, সেভাবে।

আরতিকে নিজের মধ্যে আরও যেন জাপটে ধরতে চাইতাম। বলতাম, তোমায় এবার কোনো দিন জল দিয়ে টপ করে গিলে খেয়ে নেব।

তাই খাও। না হলে তো দিন রাত খাই খাই। একেবারে খেয়ে নিলে আমি বাঁচি। তুমিও বাঁচ। বলতে বলতে মুখের রেখা, চোখের ইশারা, ভ্রূভঙ্গি আর ওষ্ঠের কারিকুরিতে কি এক আমন্ত্রণ যেন এঁকে দিতে পারত আরতি।

এক গ্লাস জল দিয়ে তোমায় আমি গিলে নেব। বলতে বলতে আয়েঙ্গার যেন আরও জোরে পিষে ধরত তাকে। দুহাত দিয়ে জাপটে ধরত আরও বেশি করে।

আয়েঙ্গারের চওড়া বুকের মধ্যে নিজেকে ছুড়ে দিতে দিতে গুন গুন করতে করতে বলে উঠত আরতি। তাই খাও। একেবারে খেয়ে নাও। এক দম এক সঙ্গে টপাত করে। দিন রাতই তো তোমার খাই খাই। কিছুতেই তো আর খাঁই মেটে না। বলতে বলতে কি এক অজানা সুখ অথবা পুলকে ক্রমশই গলা কেমন করে যেন বুজে আসত আরতির।

এ সব মনে পড়লে আয়েঙ্গারের সব কেমন যেন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হয়। এমনটি কি ছিল সত্যি সত্যি কোনোদিন! নাকি এসবই কল্পনা আমার। নিজের মতো একটা ছবি ভেবে নিয়েছি মনে মনে। কে জানে! আজকাল আর আরতিকে দেখলেই সেভাবে জেগে উঠি না। কেন জাগতে পারি না? সে কি বয়সের নিদারুণ ভার? সে কি ক্লান্ত হয়ে পড়া মনের কোনো নিষ্ঠুর অঙ্ক।

এখন মনে হয় আরতি কাছে এলেও যদি না পারি। ভেতরের ভয় তাড়া করে বেরিয়ে আসতে চায় বাইরে। তাই চেঁচামেচি করি অকারণ। রাগ দেখাই। শরীর

এতটাই বুড়ো হয়ে গেল! এত তাড়াতাড়ি? আর ম¨? সেও কি বুড়িয়ে হাবড়া হয়ে গেল শরীরে সঙ্গে সঙ্গে। নাকি শরীর আর মন—আসলে একই সঙ্গে নড়াচড়া করা দুটি ডানা। একটা নড়লে অন্যটা নড়ে।

বুড়ো হয়ে গেলাম, এত তাড়াতাড়ি। জীবনের কত কাজ, কত সাধ বাকি থেকে গেল। কিছুই তো হল না। কিছুই হল না। শূন্যতা শুধু। বুকের পাকা রোঁয়া আগে আগে একটু বড় হলেই কামিয়ে ফেলতাম। এখন বুকের পাকা রোম যেমন নিজের নিয়মে বেড়ে যায়, তেমন তো বাড়েই এমন কি গালের পাকা দাড়িও কাটতে ইচ্ছে করে না। অথচ দাড়ি না কামালে গালে জেগে থাকা শাদা শাদা বিন্দু কেমন যেন মন খারাপের ছবি নিয়ে আসে সামনে। আরও বয়স্ক, বুড়োটে, মৃত্যুরেখা আঁকা সেই মুখ দেখতে দেখতে সব চাইতে বিরক্তি আসে নিজেরই। বুড়ো হয়ে গেলাম। এত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেলাম? জীবনের কতটুকুই বা দেখা হল। বাকি রয়ে গেল আরও কত কি। আবার, আবার যদি শুর করা যেত গোড়া থেকে একদম নতুন কোনো একটা পয়েনট। যেখানে 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস' নেই। হাতি, বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক, শিম্পাঞ্জি, কাকাতুয়া, লোপার্ডের খেলা নেই। ব্যাটারির চাবুক, ট্রাপিজের খেলা, ট্রাপিজ গার্ল, জোকার—কেউ নেই। নেই আরতি নন্দী, ডাব্বু। নতুন কোনো একটা জায়গা থেকে জীবন শুরু করা, একদম নতুন করে, নতুন পরিচয়ে। একদম আনকোরা সব কিছু। এভাবে কি হয়? এমন করে হতে পারে? নাকি হওয়া সম্ভব আদৌ?

গ্লাসে বড় করে চুমুক দিয়ে মুখটা বেশ ছরকুটে গেল আয়েঙ্গারের। ভেতরটা কেমন যেন খারাপ আর বিস্বাদ হয়ে গেল। একটা ধিকি ধিকি যন্ত্রণা একটু একটু করে গড়িয়ে নামতে থাকে গলা দিয়ে। সেই নেমে আসার কষ্টটুকু খুব মন দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে রেলিশ করে আয়েঙ্গার। তারপর এক সময় সবটুকু কষ্ট ভেতরে নেমে গেলে খানিক পরেই কেমন একটা ফুরফুর মজা। বেশ খানিকটা হালকা যেন মনে হতে থাকে নিজেকে। নেমে গেছে সব ভার। আর কোনো সমস্যাই নেই এখন। সব কেমন রঙিন, মজাদার। আর তখনই সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন সত্যেন সরকার নামের সেই মানুষটি। মুখে একই রকম মজামারা হাসি।

কি বুঝছ ব্রাদার!

কি আর বুঝব! অ্যায়সে হি—

কেমন ফেঁসেছ দেখতে এলাম।

সে তো মাঝে মাঝেই আসেন। কিন্তু জানেন তো, আমার ভালো লাগে না কিছুই। কিস্যু ভালো লাগে না। বাঁচতেই ইচ্ছে করে না আর। কত, কতদিন ভেবেছি এই যে ঘুমোচ্ছি, কাল আর উঠব না। নতুন একটা সকাল যেন আর দেখতে না হয়।

কেন, কেন এত মেলাংকলিয়া গো তোমার!

খুব খারাপ লাগে। মন টিকতে চায় না কোথাও। কেমন রেস্টলেস হতে থাকি ভেতরে ভেতরে। মনে হয়। কিছুই নেই সামনে। কেউ নেই। কাউকে পাচ্ছি না।

তখন কেমন একটা রাগের ঝাঁঝ তৈরি হতে থাকে নিজের ভেতর। আপনি তো বেশ ছিলেন 'দ্য গ্রেট বেঙ্গল' নিয়ে। বেঙ্গলকে ইনডিয়া বানিয়েই আমার দশ দশা।

কেন, মালিক হয়েছ। টিকিট বিক্রির নগদ টাকা রোজ গুনে গুনে পকেটে পুরে ফেল। মালিক হলে এটুকু ঝঞ্ঝাট তো ঘাড়ে নিতেই হবে।

এখন অনেক ঝঞ্ঝাট সরকারমশাই।

সে তো 'ভারতমাতা', 'জয়লক্ষ্মী', 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা,' 'দ্য গ্রেট বেঙ্গল'—সব ফেজেই ছিল।

সে হয়ত ছিল, কিন্তু এখন ঝামেলাটা একেবারেই অন্যরকম।

কি অন্য রকম?

বাজার অনেক টাফ হয়ে গিয়েছে। কমপিটিশান, শুধুই কমপিটিশান। তার ওপর জীব-জন্তু নিয়ে খেলা দেখান কঠিন হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। বন্যপ্রাণী ভালোবাসাঅলারা, পরিবেশঅলারা—সবাই খুব চিৎকার চাপাটি করে জীব-জন্তু নিয়ে সার্কাস দেখানর বিরুদ্ধে।

শোন ভাই, প্রবলেম থাকবেই। দারুওয়ালা সাহেবের সময় এক রকম ছিল। আমার সময় আর এক রকম আবার তোমার সময় আরও নতুন নতুন ফ্যাকড়া। এই সব কিছুর মধ্যেই এগোতে হবে তোমায়। যা সামনে আসবে, তাকে অবলীলায় দু হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে এগোতে হবে। বলতে বলতে সত্যেন সরকার শামিয়ানার নিচে চাঁদে, ধুলোয় মাখামাখি উঠোনে গড়িয়ে যাওয়া কাচের শাদা বোতলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, কি ব্যাপার, একা একাই সবটা মেরে দিলে!

কোথায় আর সঙ্গী পাব!

কেন, আমি তো তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝেই এসে বসি।

মারা যাওয়ার পর কেউ যে মাল খায়, সেটা তো এই প্রথম দেখলাম।

ওসব কথা তুলছ কেন?

খাবেন আপনি! আনাতে পারি। আমার স্টকে আছে। সব সময়ই থাকে। কেমন যেন একটু জড়িয়ে জড়িয়েই বলল আয়েঙ্গার। তারপর একটু থেমেই আবার বিড়বিড়, আমার কোটা অবশ্য কমপ্লিট হয়ে গেছে।

তোমার আবার কোটা আছে নাকি বাবা! সে তো ছিল বহু বছর আগে। আর এখন আমাকে সামনে দেখেই খাওয়াতে হবে বলে বলছ কোটা কমপ্লিট। এতো বাবা জে এম টি টি—জাতে মাতাল তালে ঠিক।

আয়েঙ্গার এই রহস্যময় জ্যোৎস্নার মধ্যে নিজেকে মেলে ধরতে গিয়ে কখন যেন এক জোড়া ডানা লাগিয়ে দিতে পার নিজের দুপাশে। সেই ডানায় একই সঙ্গে ফুটে ওঠে সাতটা রঙ।

'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর রঙিন শামিয়ানায় জ্যোৎস্না পড়ছে টপটপিয়ে। তারপর শামিয়ানার ছাঁকনি গলে তা লুটোচ্ছে মাটির ওপর। আয়েঙ্গারের বুকে,

পিঠে, গালের পাশে, কানের ধারে জ্যোৎস্নার ছাপছোপ। তার দিকে হঠাৎ তাকালে মনে হবে আলোয় কালোয় সে একেবারে অন্যরকম কিছু। হয়ত আমাদের চেনা-জানার মধ্যেই নয় একেবারে।

রঙচঙে শামিয়ানা টপকে টপকে যেটুকু চাঁদের হাসি, তা সমস্ত গায়ে মাখতে মাখতে আয়েঙ্গার সত্যেন সরকারকে বলল, বলেন তো আমি এনে দিতে পারি। স্টকে আছে।

না, না থ্যাঙ্ক ইউ। এখন লাগবে না। তার চেয়ে বস। একটু কথা বলি।

না, না। আপনি মাল খেতে চাইলেন, আর আমি দিতে পারব না। এটুকু, সামান্য কাজটুকু করতে পারি না আপনার জন্যে! কি বলেন!

সত্যেন সরকার বুঝতে পারলেন আয়েঙ্গার রীতিমতো মাতাল হয়ে গেছে। মাতাল হয়ে এক দম আউট হয়ে গেলেই লোকে একই কথা বার বার বার বার বলতে থাকে। নেশা করে করে অনকটাই পুরনো হয়ে যাওয়া সত্যেন সরকার এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, না, ঠিক আছে।

সামান্য একটু মদ থেকে চাইলেন। তাও দিতে পারব না! এমনই হাড়ির হাল হয়েছে আমার। অথচ আপনি আমায় কত খাইয়েছেন, পরিয়েছেন, বড় করেছেন। রিং মাস্টার হয়ে উঠতে হেলপ, আই মিন মদত করেছেন। বলতে বলতে কান্না আর ভেতরে থাকা জমাট সর্দির দাপটে আয়েঙ্গারের গলা ভেঙে এল।

মদ খান না খান, একটু অন্তত বসুন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা বসব না কেন! বসছি।

সার্কাস যদি বন্ধ হয়ে যায় আয়েঙ্গার, কি করবে কিছু ভেবেছ!

না। মুখে না বলে মাথা নাড়ল আয়েঙ্গার।

তোমার কমবয়েসি বউ। স্প্যাসটিক ছেলে. তারও অনেক কম বয়েস। এদের তুমি কোথায় ফেলে রেখে যাবে ভেবেছ একবার!

না, ভাবিনি। খুব আস্তে আস্তে বলল আয়েঙ্গার। তারপর নিজের পায়ের দিকে হঠাৎই চোখ পড়ে গেলে দু পায়ের দশ আঙুলে বেশ বড় হয়ে যাওয়া একটু কালচে মতো নখ দেখতে পেল আয়েঙ্গার। তার নখ খুব শক্ত। চট করে কাটে না। আগে আগে মারকিউরোক্রোম দিয়ে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখার পর আরতি নিজে নরুন দিয়ে কেটে দিত খুব যত্নে, গোল করে। ব্লেড দিয়ে, এমন কি নতুন ব্লেডেও কাটা যায় না এই নখ—এত পুরু আর শক্ত। কখনও কখনও ভেঙে যায় ব্লেড।

আরতি আরও আগে কেটে দিত যত্ন নিয়ে, লক্ষ রেখে বলত, কি বন মানুষের মতো নখ রেখেছ, পায়ে লাগে। আয়েঙ্গার সেই কথা শুনে হাসত হা-হা করে।

রিং মাস্টার হওয়ার জন্য পায়ে যে জুতো পরে আয়েঙ্গার তার এক সাইজ তো বটেই, দু সাইজও বড় হতে পারে। সেই জুতোর মধ্যে মোজা ছাড়াই পা গালিয়ে দেয় আয়েঙ্গার মোজা থাকলে মোজাও ছিঁড়ে যাবে। অকারণ লোকসান।

ফুলছাপ রঙিন লুঙ্গি। বোধহয় লিনেনেরই হবে। কেমন যেন ঝ্যালঝ্যালে। নাভির বেশ খানিকটা নিচে নেমে এসেছে লুঙ্গির কষি। আজকাল প্রায় দিনই মদ খাওয়ার সময় এমনই হয়। খেতে খেতে খেতে কিছুতেই আর তাল রাখতে পারে না আয়েঙ্গার। একসময় লুঙ্গি নেমে আসে কোমর থেকে তলপেটে। তারপর তলপেট থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামে নিচে। আরও নিচে। একসময় লুঙ্গি শূন্য হয়ে গিয়ে আয়েঙ্গার গ্লাস নিয়ে একা একা বসে থাকে। তখন সেই দিগম্বর-দৃশ্য দেখার জন্য আকাশের চাঁদ ছাড়া আর কেউই থাকে না প্রায়।

কি করলাম এই জীবনে?

কি পেলাম?

এত বড় সার্কাস, কার হাতে দিয়ে যাব আমি?

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি কি থেকে যাবে এই সার্কাস?

অদৌ থাকবে!

নাকি জীবজন্তুদের দিয়ে শো টাইমে দেখাবার নানান আইটেম বাদ চলে গেলে সব ফুসফাস। এমনি এমনি বন্ধ হয়ে যাবে! বাঙালির কত সার্কাস তো এভাবেই বন্ধ হয়ে গেছে। লোক-জনের অভাবে। ঠিকঠাক মালিকের অভাবে।

সত্যেন সরকার দীর্ঘ ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁর পায়র কাফ লেদারের মসমসান পা ঢাকা জুতো। হয়ত তা আনান হত বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের চিনে বাড়ি থেকে, মিলের সরু পাড় ফাইন ধুতি—সব এই জ্যোৎস্নার ঘোরে এই আছে এই নেই।

কত কষ্ট করেছেন মানুষটি সার্কাসের জন্য। যাতে ঠিকঠাক টিকে থাকে সার্কাস। কিন্তু সেখানেও কত যে কাঁটা আর ভুল।

জীবন সব সময় এক ভাবে চলে না আয়েঙ্গার। তার নানা রঙ। নানান বাঁক। আমরা ছেলেবেলায় একটা খেলা খেলতাম।

কি খেলা?

এই ধর চোর চোর বা ওরকম কিছু।

অ।

তো সেই খেলা শুরুর আগে একটা গোনার ব্যাপার থাকে না।

হ্যাঁ বোধহয়। কথা না বলে মাথা নাড়াল আয়েঙ্গার।

সেই খেলাটা শুরুর আগে আমরা এ ভাবে গুনতাম। কী ভাবে বল তো!

জানি না। এবারও মুখে কিছু না বলে দুপাশে ঘাড় নাড়ল আয়েঙ্গার।

ছড়াটা হল। ছড়াটা হল .... ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে! আগের কথাটা শেষ করে বলতে শুরু করল সত্যেন সরকার—

এক দুই তিন
ভারত স্বাধীন
চার পাঁচ ছয়
নেতাজির জয়

সাত আট নয়
আর ভয় নয়
দশ এগারো বারো
ইংরেজকে মার...

এখন ধর এই যে গোনার ছড়াটা, এটা তো অনেকটাই এক দুই তিন ফাঁক, এক দুই তিন ফাঁক। এভাবে হচ্ছে না। যারা এক দুই তিন ফাঁক—এভাবে জীবন চালায় তারা ফাঁকটা খোঁজে। টইটম্বুর, টাইট কোনো শিডিউলে তাদের আগ্রহ নেই। আমি, তুমি দেখেছ চিরটাকাল টাইট শিডিউলে কাজ করেছি। কোনো ফাঁক নেই। অবসর নেই। নো রিল্যাক্সেসান। যা বলতে পারি একটু আধটু ঐ মাল খাওয়া। সেও তোমার সঙ্গে। এখনও সেই পুরনো লোভে মাঝে মাঝে আসি। এসে বসতে হয়। ফেঁসে যাই। তো যা বলছিলাম, হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম, ও হ্যাঁ—আবার এটাও ঠিক জীবনের জান তো কোনো ধরাবাঁধা, টাইট চেমবার যেন, এরকম নিয়ম নেই। একটু আলগা দিয়ে, হালকা করে কথা বলে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারও একটা থিয়োরি আছে। কিন্তু সেখানেও কাজ করতে হবে। কাজ। কাজ। কাজ। কাজ ছাড়া কোনো পথ নেই। যে ছড়াটা তোমায় বললাম একটু আগে, সেটাই দ্যাখ না—প্রথমেই বলে নিচ্ছে, এক দুই তিন/ভারত স্বাধীন—অনেক পরে, দশ এগার বার—ইংরেজকে মার...। একটু আগে পরে হওয়াই তো উচিত ছিল, তাই না! ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ইংরেজকে মারব কেন! ভেব না এসব আমি মদ খেয়ে ভাট বকছি। নেহাৎ মাতালের কথা। তোমার সামনেই তো দেখতে পেলে মদ স্পর্শ করলাম না পর্যন্ত।

আয়েঙ্গারের ঠাসা চুলভর্তি ধূসর মাথায় চাঁদ আরও কিছুটা শাদা রঙ পাঠিয়ে দিল স্প্রে করে। খানিকটা টলমল পায়ে আয়েঙ্গার উঠে দাঁড়ালে তার ফুল ছাপ ঝ্যালঝ্যালে লুঙ্গি নাভির কাছ থেকে খসে আরও নিচে নেমে এলে টুপি, লাড্ডু, কুতু আর কাতু অল্প দূর থেকে দেখে নিজেদের মধ্যেই চাপা গলায় হেসে ফেলে।

এইবার মালিক ভরপুর হয়ে গেছে। খুব চাপা গলায় বলে টুপি।

একদম গলা পর্যন্ত। ল্যাংটো হয়ে যাবে এবার। একদম আস্তে বলে ওঠে লাড্ডু।

ওতো রোজই হয়। খায়, খায়, খেতে খেতে খেতে তারপর একেবারে দিগম্বর শিব। সেই সাপের কোমরবন্ধনী আলগা হয়ে যাওয়ার পর বাঘছাল খসে গেছে কোমর থেকে। সেই যে গাজনের সময় নাচ হয় না—শিবো হে শিবো হে...

কিন্তু সেই নাচ যারা নাচে তাদের কাপড় খোলে নাকি! ফিস ফিস করে বলে ওঠে কাতু।

বাঘের খাঁচা থেকে পাতলা মতো হা-আ-আ-উ-উ-ম ডাক ভেসে আসে তখনই।

আরতির ঘুম আসে না কিছুতেই। মানুষটা যে কখন খেয়ে দেয়ে টর হয়ে ফিরবে কে জানে। আর এই যে খাওয়া, তার তো কোনো মাপজোক নেই। খেতে

খেতে যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যায়, প্রায়, ততক্ষণই চালাবে। তারপর টলতে টলতে এক সময় বিছানায় এসে ধপাস। কোনো কোনোদিন বিছানার আগেই, তখন ধরে তুলে আনতে হয়।

কোনো দিকেই আশার কোনো আলো দেখতে পায় না আরতি। সব দিকেই চাপ চাপ জমাট অন্ধকারই শুধু। এরকম একটা অবস্থায় কে কাকে ভরসা যোগাবে, কে কাকে আশ্বাস দেবে! ভেবে ভেবে সমস্যার কোনো তল-কূল পায় না আরতি। নেশা করে করে মানুষটা ছিন্নভিন্ন করছে নিজেকে। একটু একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে রোজ। আরতি বুঝতে পারে সবই। কিন্তু তারও হয়ত আর কিছু করার নেই। ইচ্ছে তো করে না কিছু করতে। তবে কি জীবন শেষ হয়ে এল? মরে গেল একটু একটু করে সমস্ত ইচ্ছেরা? এই এক জড়ভরত ছেলে। যত দিন যাচ্ছে, তার সমস্যা বাড়ছে। গাদা গাদা ওষুধ খাওয়াতে হয় তাকে। তার জন্য প্রতি মাসে একটা বড় খরচ। মোটা টাকা লাগে। ওষুধ ছাড়াও ডাক্তার দেখাতে হয়। আর ছেলে যা মতলবি! কখন কি করতে চাইবে, সেটা একেবারেই বলা মুশকিল। জেদ ধরে বসলে, গোঁ চাপলে তখন তাকে সামলান দায়। এই যদি এখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বাঘ, সিংহ, লেপার্ড দেখতে চায় তো হয়ে গেল। আরতিকেই কোলে করে টেনে টেনে নিয়ে যেতে হবে খাঁচার সামনে।

আয়েঙ্গার কেমন যেন হয়ে গেছে আজকাল। কি রকম এক নিষ্ঠুর পাথর পাথর। ছেলের দিকে ভালো করে তাকায় না পর্যন্ত। তার দেখভাল করা তো দূরের কথা। আস্তে আস্তে নিজেকে সব ব্যাপার থেকেই কেমন যেন ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিচ্ছে আয়েঙ্গার। সার্কাস, তার রিং মাস্টারি, টিকিট বিক্রির টাকা গোনা, পেমেন্ট দেওয়া—এ টুকুই যা করে থাকে আয়েঙ্গার। বাকি সব দিকে তার যেন কোনো নজরই নেই। কথাও খুব কম বলে। ভোম মেরে বসে থাকে একা একা। নয়ত মদ খায়। খেতেই থাকে। খেতেই থাকে।

বিছানায় শোয়া ডাব্বুর গালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে নাল। ফিক ফিক ফিক ফিক করে হাসছে ছেলে। হয়ত স্বপ্ন দেখছে কোনো। তখনই খানিকটা টালমাটাল পায়ে হেঁটে, কিছুটা যেন গড়িয়ে বিছানার কাছাকাছি পৌঁছে গেল আয়েঙ্গার। তারপর ধপাস। সোজা নিজেকে আছড়ে ফেলল বিছানায়। তারপর উপুড় হযেই শুয়ে রইল। আরতির একবার মনে হল চিৎ করে শুইয়ে দেয় বিছানায়। এভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলে চাপ পড়বে বুকে। কষ্ট হবে। তারপর কি ভেবে যেন বিছানা ছেড়ে আর উঠল না আরতি। থাক, এভাবে পড়ে থাকতে থাকতেই একসময় ঘুরে যাবে। চিৎ হবে, নয়ত পাশ ফিরবে। কতক্ষণ আর শুয়ে থাকবে এভাবে! এ তো রোজকার ব্যাপার। একই সিন তো রোজই হয়ে চলে।

মানুষটার হঠাৎ যদি কিছু হয় কি যে হবে আমাদের। মনে মনে নিজের কাছেই নিজে জানতে চায় আরতি। এরকম একটা হাবা গোবা ছেলে, এত বড় দল, এতগুলো ট্রাপিজের খেলা দেখান মেয়ে, বাঘ, সিংহ, লেপার্ড, হাতি, আমি যে কি

করব! তারপর শুনছি হাতি, বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক, লেপার্ড, শিম্পাঞ্জি—এদের দিয়ে আর খেলা দেখান যাবে না—এ রকম আইন চলে আসব আসব করছে। ব্যস, তাহলে তো হয়ে গেল। জীবজন্তু—শের, ভালু, চিড়িয়া না থাকলে নতুন নতুন আইটেম হবে কীভাবে। শুধু মানুষের খেলা দেখে মন ভরে না টিকিট কেটে সার্কাস দেখতে আসা ইনসানের। তাদের আইটেম চাই নয়া নয়া। না হলে সার্কাস কিসের! আর তা দেখতে আসাই বা কেন!

সুবর্ণরেখার বুক থেকে উঠে আসা বর্ষা দিনের জোলো বাতাস 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর তাঁবুর ভেতর ঢুকে মাঝে মাঝে ঘুরপাক খেয়ে যায়। হাওয়ার সেই চলনে কেমন যেন দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পায় আরতি। সুবর্ণরেখার ঢালু পাড়, দূরে দূরে আবছা মতো পাহাড়, জল, খানিকটা তফাতে হিন্দুস্থান কপারের আলো, এই অপুর পথ, দাহিগোড়া—সব কেমন যেন স্থির আর চুপচাপ হয়ে থাকে এই রকম রাতে।

মালিক অজ্ঞান হয়ে বিছানায় ঘুমোচ্ছে। তার নাক ডাকছে খুব জোরে জোরে—ফঁ-অ-র-ফঁ-অ-ত। ফঁ-অ-র-ফ-অ-ত। লাড্ডু আর টুপি সেই ডাক শুনতে শুনতে বুঝতে পারে এখন মালিকের—মানে আয়েঙ্গার স্যারের ঘুম খুব জোরদার। কিন্তু হলে হবে কি! মালকিন যদি জেগে থাকে, তাহলে তো সব চৌপাট। '*গুড়ির মা গুড়ি/তালতলায় পিণ্ডি*'—হয়ে গেল। আটকে গেল সব কিছু।

রাত বাড়লে সেই দুই পাহাড় টপকান, বন পালান হাতি এসে হাজির হবে। তাদের গায়ে, নিশ্বাসে জঙ্গলের গন্ধ। ঘাস, পাতা, ধানক্ষেত মাড়িয়ে আসা ঘ্রাণ।

দুমকা নাকি দলমা থেকে আসা দুই হাতি, তারা তিন বা চারও হতে পারে হয়ত, কিন্তু ভিজে ভিজে খোলা জ্যোৎস্নায় সেই সব হাতিদের চেহারা কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে। সবাই মিলে একটাই হাতি হয়ে ওঠে কি করে যেন।

হয়ত একটা কিছুতেই হয় না। হাতি কি মাখা সন্দেশ নাকি, যে তাল পাকিয়ে দিলেই সব সমেত একটা হয়ে যাবে! তো সে যাই হোক, লাড্ডু বা টুপির তো মনে হয় এরকমই—সে এক বিশাল মহাগজ যেন শুঁড় নেড়ে নেড়ে; কান নাড়িয়ে ডাকছে তাদের। তারপর তো এক সময় বেরিয়ে পড়া সেই ডাক শুনে।

সেই ধুলোকাদা, জঙ্গলের গন্ধমাখা মহাহস্তিদের পেছন পেছন তখন শুধু চলতে থাকা। ফুলডুংরি, রাতমোহনা, কোথায় না কোথায় যাওয়া যাবে তখন। সে এক ভারি মজার যাত্রা।

চাঁদের আলোয় একদম অন্যরকম লাগে সেই সব হাতিদের। তাদের পা, পিঠ, ল্যাজ, শুঁড়—সবই ভিজে ভিজে জ্যোৎস্নায় ছমছমে। তবু মজা আছে। এই যাওয়ার অন্য এক আনন্দ রয়েছে। কি যে সেই মজা আর আনন্দ তা ঠিক বলে বোঝান যাবে না।

মাথায় রাংতার টুপি, গায়ে ঝলমলে পোশাক, টুপি আর লাড্ডু রেডি হয়ে আছে হাতিদের পিঠে উঠে বসবে বলে। আর বনের হাতিরা তাঁবুর বাইরে, গেটের ধারে, শামিয়ানার পাশে দাঁড়ালেই কি এক ম্যাজিকে যেন পায়ের ওজনদার লোহার শেকল খসে যায় কামিনী আর সুন্দরীদের। সে তো এক মজার দৃশ্যই।

কামিনী, সুন্দরী দিব্যি গট গট গট গট করতে করতে সার্কাসের খেলা দেখান ট্রেনিং, সহবত ভুলে সেই সব বনের হাতিদের পিছু পিছু। সে এক অন্যরকম যাত্রা। যে গেছে কেবল সে-ই জানে কি এর মজা। বাকিদের পক্ষে কোনো ভাবেই বলা সম্ভব নয়।

কি এক অলৌকিক ঘোরে সেই চলা। চলতে থাকা।

জ্যোৎস্না মাখা প্রকৃতি রাতে একেবারেই অন্যরকম। সুবর্ণরেখায় পৌঁছনর আগে যে উঁচু পাড়, সেখানে যেতে গেলে ছোট ছোট চাষের ক্ষেত পেরতে হবে। সেই সব সবুজ শস্যের গায়ে চাঁদের অবিরাম হা-ডু-ডু, চড়াই কিত কিত। ঘাস, ঘাসফুল, নয়নতারা, কাঁটাঝোপ, শেয়ালকাঁটা, বাবলা, ফণী মনসা—সবার গায়ে মাথাতেই চন্দ্রশোভার কি বাহার কি বাহার। দিনের বেলা যাকে যেরকম দেখা গেছে, রাতে একেবারেই সে রকম নয় সে। বরং আরও অপরূপ, সুন্দর, রহস্যময়।

বিশেষ করে চাঁদ ডোবা রাতে এক রকম। আবার অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে আকাশের যখন ঝিলমিল ঝিলমিল তারাদের উৎসব, সেই নক্ষত্র বন্দনার মধ্যে, প্রকৃতির অসার রহস্যময়তায় গাছেরা, ফসলের ক্ষেত, দুব্বো ঢাকা মাঠ, দূরের পাহাড় সব অন্য রকম। এসবই জানা হত না লাড্ডু আর টুপির, যদি না বনের থেকে বেরন হাতিদের পেছন পেছন সুন্দরী আর কামিনীর পিঠে বসে যাওয়া যেত—এদিক ওদিক, সে দিক। আজ রাতমোহনা তো কাল ফুলডুংরি। নয়ত সুবর্ণরেখার পাড়ে, যেখানে ডান দিকে হিন্দুস্থান কপারের লাল আলো জেগে থাকে দৈত্যের চোখ হয়ে, তার পাশে বড় বড় উঁচু উঁচু চিমনি, তারাও তো আকাশের দিকে ধোঁয়া বমি করার জন্য তৈরি, তার আগে মানে ফসলের ক্ষেতটি পেরিয়ে অনেকখানি খাড়াই পাড়ে উঠে আসার আগে বি-শা-ল এক বট গাছ, তার শাখা-প্রশাখা, শেকড়—সবই তো কেমন যেন অন্যরকম এই জ্যোৎস্না আলোয়। তারা সকালে, দুপুরে, বিকেলে এক রকম। এমন কি শেষ বিকেলেও যখন ঘাটশিলার সূর্য তারই পেছন দিকে, নদী পেরিয়ে একদম পাহাড়ের ওপারে গিয়ে ঝুলতে ঝুলতে হঠাৎ টুপ করে ডুব দিতে চায় দিগন্তে, তখনও এই মহাবটকে মনে হয় না এতটা জীবন্ত। অনেক অনেক বছরের প্রাচীন এই বৃক্ষ তখনও কেমন চুপচাপ, বিনীত। অথচ রাতে, জ্যোৎস্নার পমেটম মেখে তার আহ্লাদ, আনন্দ—সবই তো দেখার মতো। সেই গাছ—বি-ই-শা-ল মহাদ্রুম আশ্চর্য এক খেলায় মেতে ওঠে চাঁদের আলোর সঙ্গে। তার মোটা মোটা ডাল-পালা, সবুজ সবুজ চিকন পাতা, শক্তপোক্ত ঝুরি—সবই তো এই আলোয় অন্ধকারে বড্ড জ্যান্ত

আর চনমনে। তাকে না দেখে সুবর্ণরেখার কাছাকাছি যাওয়ার উপায় নেই। আর তখন চাঁদে জলে নদীতে, পাহাড়ে, পাথরে মাখামাখি সে এক মহোৎসব। নদীর জল গান গাইতে গাইতে দৌড়য়। স্রোতে ভাসে অপরূপ চাঁদ। বুনো মোষের পিঠ হয়ে জেগে থাকা নদীর বুকের কালো কালো পাথরে জ্যোৎস্না নামার সঙ্গে সঙ্গে পরিরাও নেমে আসে দূর কোনো শূন্য থেকে। তারপর তারা জল ছুঁই খেলা খেলতে খেলতেই নিজেদের মধ্যে জল ছোড়াছুড়ি করে। কলকল করতে থাকে। হাসে, ছুটোছুটি করে। সেই পরি পাওয়া রাত সকলে দেখতেই পায় না। বরং খানিক দূরে—ডান দিকে হিন্দুস্থান কপারের অন্ধকার খামচান আলো, বড় বড় পালোয়ান পালোয়ান চিমনি, আলিশান কারখানা সবই বদলে যেতে থাকে রাতের কেরামতিতে। আরও দূরে খুব সরু করে পেনসিল রেখা আঁকা কালচে-সবুজ পাহাড় তখন, রাতের অন্ধকারে নিজেদের মতো করেই মুছে গেছে কালোর গভীরে। খুব নজর করলে হয়ত সেখানে একটি দুটি চকিত আলোর বিন্দু। তারপর আবার সব অন্ধকার।

কৃষ্ণপক্ষে একটু বেশি রাতের দিকে পশ্চিম দিগন্তে চাঁদ উঠে এলে তখন তো গুলি খেলার কোট হয়ে যায়—সমস্ত আকাশ। ঘর পাচার নামের গুলি খেলাতে যেরকম হয়, ঠিক সেরকমই বড় সড় কালো আকাশের গা দিব্যি যেন গুলি জেতার কোট। তার গায়ে টিপি টিপি তারারা, মিটমিট করতে করতে দিব্যি এক দুই তিন করে কেমন যেন ঝকঝকে কাচের গুলি। সেই সব কাচ্চিল গুলিদের টিপ করে মারার জন্যে গোল চাঁদ যেন মার্বেলের টল। অবশ্য চাঁদ যদি গোল থাকে, তাহলেই না। কৃষ্ণপক্ষে অনেক সময়ই তো ভাঙা চাঁদ।

এতসব কথা ভাবার সময় কোথায় লাড্ডু আর টুপিদের।

তারা এত এত ভাবতে যাবেই বা কেন?

বরং রাত অনেকটা বেড়ে গেলে বুনো দুই হাতির ডাকে সুন্দরী আর কামিনী পায়ের শেকল ছাড়িয়ে দিব্যি হাঁটতে থাকে সামনে। তখন তাদের পিঠে লাড্ডু আর টুপি। এই সময় তাদের আর পায় কে?

তখন তো মুক্ত, স্বাধীন দুজনে।

ক্রমাগত এগিয়ে চলো সামনে।

দুপাশে তখন একেবারে অন্যরকম পৃথিবী। শোনেই, ডিগবাজি নেই, ভাঁড়ামি নেই। সবই কেমন যেন দিব্যি পরিষ্কার আর ঝকঝকে।

দূরে দূরে, কাছে কাছে আনন্দ আর আনন্দ।

আয়েঙ্গারের মুখ ঝামটা নেই। ভয় নেই মারের। আইটেম, খেলা একটু যদি বিগড়ে যায়, তাহলে যে কি হবে কি হবে তখন—সেই টেনশন মুক্ত সময়ের মধ্য দিয়ে দিব্যি চলে যেতে থাকে টুপি আর লাড্ডু। হাতির পিঠে মৌজ করে বসে এরকম গদাই লশকরি চালের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চলতে চলতে কত দূর। কত

দূর। তখন মনে হয় না, আর ফিরে আসব না তাঁবুতে। শামিয়ানার নিচে, স্টেজের ওপর আর দাঁড়াব না ঝলমলে পোশাক পরে, গালে রঙ মেখে।

আইয়ে মেহেরবান, কদরদান, ভাইয়োঁ বহেনোঁ অওর সজ্জনো—এই বলে হ্যানডবিল বেলাতে বেলাতে চলে যাব না ঘাটশিলা কোর্ট, স্টেশনের ধার, বাজারের দিকে। নয়ত আরও দূরে জাদুগোড়া, রঙ্কিনীর মন্দির। সেখান থেকে গালুডি, টাটা—যেদিকে ইচ্ছে চলে যাওয়া যায়। এদিকে ঝাড়গ্রাম, গিধনি, খড়্গপুর। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো কোথাও যাওয়া যায় না। আবার তো ফিরে আসতে হয় সেই 'দ্য গ্রেট ইনডিয়া সার্কাস'-এর গেটের এপারে। তাঁবুর ভেতর, শামিয়ানার নিচে আলোয় ছায়ায়, অন্ধকারে। সেই তো এক ঘেয়ে জীবন। একই কথা। একই আইটেম বার বার। শো ফুল হল কি না, তা নিয়ে টেনশন। একঘেয়ে ভাঁড়ামি, লুকিয়ে চুরিয়ে কখনও কখনও একটু আধটু মদ খাওয়া, মদ খাওয়ার পর বাজে বকা। সেও তো সেই পাইনবাবুদের 'শীতনিবাস'-এ মনসুখের সঙ্গে। হয়ত কোনো কোনো দিন গাঁজাও—অবরে সবরে। মনসুখের কাছে সব জিনিসের স্টক আছে।

'শীতনিবাস'-এর মাথায় তখন খোলা আকাশ। তার গায়ে ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি সব তারারা। মনসুখ তার দেশের গল্প, ক্ষেতি-বাড়ি, গায়-ভঁইস, বকরি, বিবি-বাচ্চার গল্প বলতে থাকে। আর সেইসব কাহিনির ল্যাজামুড়ো থাকে না কোনো। যে কোনো জায়গায় শুরু। যে কোনো জায়গায় শেষ।

খানিকটা নেশা করার পর যেমন বওরায়—এলোমেলো ভাট বকে লোকজন। মনসুখও তেমনি। আলাদা কিছু নয় একেবারেই।

পাইনবাবুদের বাড়ির বিশাল হাতার ভেতর তখন হয়ত চুপচাপই ঝরে পড়ছে কোনো বুড়ো পাতা। মাঝ বয়েসি মনসুখ পর পর বলে যাচ্ছে তার নানা স্মৃতি। জীবনের কথা। সে হয়ত মনসুখের। কিংবা মনসুখের নয় আদৌ—এমনি এমনি বলছে।

অতশত বোঝে না টুপি আর লাড্ডু।

বরং তারা গাঁজা নয়ত দিশির ঘোরে চোখের কোণ থেকে নেশার নিয়মেই জল কাটাতে কাটাতে চারপাশ দেখতে থাকে।

মনসুখের সঙ্গে আড্ডায় বসতে আসার জন্য গেটের সিকিউরিটিকেও খানিকটা তুষ্ট করতে হয়। না হলে সে-ই বা গেট ছাড়বে কেন! তার যদি কোনো রকম ইন্টারেস্ট না-ই থাকে।

মনসুখ কথা বলতে বলতে হঠাৎই চুপ করে যায়। তখনই হয়ত দূরে বিচিত্র সুরে ডেকে ওঠে কোনো রাতচরা পাখি। ডানা মেলা পেঁচা উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে। বাড়ির উঠোনে সর সর সর সর শব্দ করে বুকে হাঁটে কি-যেন। ইঁদারায় হঠাৎই ঝপ করে শব্দ হয়। তাহলে কি বালতি পড়ল! কিন্তু এই সময় বালতি ফেলবে কে? আমরা তিনজনই তো এখানে—লাড্ডু আর টুপি মনে মনে ভাবে।

মনসুখ তখনও চুপ করেই থাকে।

পুরনো জংধরা কপি কলের ডাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্যাঁচকোঁচ ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করতে করতে জল তোলে কেউ।

ঘাসের ওপর দিয়ে বুকে হাঁটা সরসরানি শব্দটা বোধহয় আরও বাড়ে। দূর থেকে ভেসে আসা ঝিঁঝিদের ডাক তীব্র থেকে আরও তীব্রতর হয় বুঝি।

গোটা ব্যাপারটাই টুপি আর লাড্ডুর কাছে না-বোঝা কিছু একটা, না-জানা কোনো বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

মনসুখ চুপ করেই থাকে।

অবশ্য এরকম ভাবে অখণ্ড অবসর নিয়ে মাল টানা গাঁজা টানা আর হয় কোথায়? সার্কাস যখন, তাঁবু গাড়ব তাঁবু গাড়ব করে অপুর পথের পাশে বড় মাঠে, তখন সেই সব খুঁটি পোঁতা, পাল টাঙানর দিনে খানিকটা তো অবসর থাকে সন্ধের পর। তখনও সব কিছু ফিটফাট করে গুছিয়ে নেওয়া হয় নি। বাঘ সিংহের খাঁচা, হাতিদের থাকার জায়গা, নিজেদের বড় লরি, অ্যামবাসাডার—সবই এদিক সেদিক। তখনই শীত নিবাস-এ মনসুখের সঙ্গে রাত একটু বেড়ে গেলেই ভরপুর আড্ডা।

কপিকলের জংমাখা যান্ত্রিক শব্দ গড়িয়ে পড়ে ইঁদারার মধ্যে। তারপর শব্দ ওঠে জলের। মনসুখ কেন যে এর পরেও চুপ করে থাকে!

দূরে, নয়ত বাগানের চৌহদ্দির মধ্যেই কোথাও কি কেয়াফুল ফুটেছে? তার তীব্র গন্ধে আলোড়িত হতে থাকে বাতাস। লাড্ডুর এই গন্ধটা বেশ চেনা। কোথায় কবে যেন গ্রামের পথে পাওয়া যেত এই কেয়াফুলের সুবাস। তখন ঘোর বর্ষা।

কেয়া ফুলের গন্ধে সাপ আসে।

কেয়া ঝোপের মধ্যে অনেক সাপ আছে।

যাস না বাবা কেয়া ঝোপের কাছে।

মা এসব বলত।

কেয়া, কামিনী, হাসনুহানা, নাগকেশর—সকলের গন্ধই নাকি ডেকে নিয়ে আসে বিষধর সাপ।

লাড্ডু খবর নিয়ে জেনেছে এসব সত্যি নয় একেবারে। ওসব গল্প কথা লোকে এমনি এমনি বলে।

টুপি কি তখন দেখতে পায় উঠোনের কোণে সাত পুরনো একটা কদম গাছ। সেই কদম গাছ ভরে আছে ফুলে ফুলে। আষাঢ়ে সুগন্ধে আকুল হয়ে উঠছে কদমতলা। কদম ফুল, কদম্ব রেণু—সবই তো বড় মোহময় বর্ষা দিনে।

কদমের গন্ধ ছড়িয়ে যেতে থাকে এদিক থেকে ওদিক। তারপর ওদিক থেকে সেদিক। ওপাশে একটা খিরিশ গাছ। কদমের নিচে একটা শাদা-কালো ছাগল মা চার চারটে ছানা নিয়ে দাঁড়ান। মায়ের গলায় দড়ি বাঁধা। দড়ির সঙ্গে পেতলের ছোট ঘণ্টাও আছে একটা। সেই ঘণ্টা শব্দ করে করে বাজে—টুং টাং টুং। টুং টাং টুং ...

মনসুখের কাছে শীত নিবাসে যাওয়া, তার পর কাম্নিনী আর সুন্দরীর পিঠে চেপে ইচ্ছে খুশি চলা। যেমন মন হয়, যেখানে ইচ্ছে করে সেইখানে চলে যাওয়া। চলতে চলতে আপনমনে বাঁশি বাজান। হাতে যদি বাঁশি না-ও থাকে, তাহলে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেই বাঁশি উড়ন্ত কোনো পাখি হয়ে ডানা ছাড়াই কেমন ভেসে ভেসে চলে আসে টুপি আর লাড্ডুর হাতে। তারপর বাঁশিতে ফুঁ দিলেই কি এক মোহন সুর ওঠে জেগে। সেই মোহ ধরান সুরের জালে আটকা পড়ে গিয়ে কীভাবে কীভাবে যেন সবাই ঘাড় কাত করে মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করে তাদের। এমনকি যে পেঁচা ঘোরাতে পারে নব্বই ডিগ্রি মুণ্ডু, সেও খুব সহজেই থম মেরে যায় কেমন যেন।

থম মেরে ভোম হয়ে থাকে।

কামিনী সুন্দরী হাঁটতে থাকে থপথপিয়ে। তাদের চওড়া পিঠে চাঁদের আলো পড়ে গড়িয়ে যায়। আর তখনই হয়ত বা উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে শোয় এস. আয়েঙ্গার। উপুড় থেকে চিৎ হওয়ার সময়েই স্বপ্নের ঘোরে তার বুকের যত পাকা ভুলভুলে রোঁয়া—তাদের সবাইকে কিলবিল কিলবিল করতে করতে, যেমন কিলবিলোয় শিরদাঁড়া বিহীন শাদা শাদা পোকা—বুক পেরিয়ে গলা, মুখ, ঘাড়ের কাছে উঠে আসতে দেখে আয়েঙ্গার। প্রবল সুড়সুড়ি লাগে তার। খোঁচা খোঁচাও লাগে। অসম্ভব একটা অস্বস্তি খোঁচাতে থাকে ভেতরে। কি করবে আয়েঙ্গার, কোথায় যাবে?

পাকা রোম একটু একটু করেই যেন বা খেয়ে নিতে চায় তাকে। দমবন্ধ হয়ে আসছে মনে হয়। তার সঙ্গে অসম্ভব জল তেষ্টা।

সার্কাস করতে করতে, রিংমাস্টার হয়ে, মালিক সেজে আমার বুকের সব লোম পেকে গেল। মাথা হয়ে উঠল কাশ ফুল রঙের। চোখে চশমার পাওয়ার বাড়ল। চোখের মণি হয়ে দাঁড়াল ঝাপসা। এখন হাত-পায়ের নখ বাড়লে কাটতে ইচ্ছে করে না। রেগুলার শো-এর জন্য বাধ্য হই দাড়ি কামাতে।

সার্কাস একটু একটু করে সবকিছু কেড়ে নিল আমার। ভাবতে ভাবতে নিজের মধ্যে কান্নার দলা আটকাতে চাইল আয়েঙ্গার। তবু কান্না উঠে আসতে চাইছে। অনেক অনেক কান্না। দমকে দমকে। এত কান্না কোথায় থাকে, থাকে আয়েঙ্গারের?

চোখের জলে বালিশ ভিজে যাচ্ছে। নিজের মধ্যে নিজেই কেমন যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে আয়েঙ্গার। কান্নার ধমকানিতে কেঁপে উঠছে সারা গা। গলাটা শুকিয়ে আসছে বড্ড। জল, একটু জল পেলে ভালো হত। নিজের ভেতর নিজেই এটুকু বলে খানিকটা শান্তি পেল আয়েঙ্গার।

ফুলডুংরি, রাতমোহনা, ধারাগিরি—জ্যোৎস্নায় সব ডুবে আছে তখন। জঙ্গলের মাথায় চাঁদ। পাহাড়ের চুড়োয়, গায়ে একই রকম চাঁদের বাহার। সেই সব চাঁদ

ডোবা জায়গা হাত নেড়ে নেড়ে ডাকে সুন্দরী আর কামিনীদের। তারা তখন গজ গমনে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে চাঁদ খেলতে। তার আগে দুজনের পা থেকেই খসে যাবে ওজনদার লোহার শেকল। ততক্ষণে সেই বনের হাতিরা এসে দাঁড়িয়েছে তাঁবুর বাইরে। তাদের পিঠে কাদা- জলের ছাপ। শাদা শাদা গজ দাঁতে জড়িয়ে আছে সবুজ সবুজ জার্মান লতা, নয়ত বুনো ঘাস অথবা পেকে ওঠা নয়ত আধপাকা ধানের শীষ। মাথায়, চোখের পাশে, শুঁড়ের ধারে ডাঁশ নয়ত মশা। অথবা কোনো পোকা। কিন্তু এসবের দিকে মন দেওয়ার সময় নেই দাঁতালদের। তারা এখন ডেকে নিয়ে যেতে এসেছে কামিনী আর সুন্দরীদের। তাদের ডাক শুনে কামিনী আর সুন্দরীদের পা থেকে খসে পড়বে লোহার ভারি শেকল। ওরা তখন হাঁটতে থাকবে ধীরে। তারপর একটু জোরে।

তখন কি আনন্দ। কি আনন্দ।

যেখানে মন চাইবে চলে যাওয়া যাবে সেখানে। যেমন খুশি—ধারাগিরি, ফুলডুংরি, রাতমোহনা। যেখানে খুশি, যখন খুশি। চাঁদের ঝিমঝিমে আলোয় সমস্ত চারপাশই বদলে গিয়ে একেবারে অন্য রকম। কেউ আটকানর নেই। ভয় নেই রিংমাস্টারের চাবুকের। আইটেম ঠিক হল কি না তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই। ভয় নেই শো ফ্লপ হওয়ার। আর টুপি লাড্ডুর অবস্থা তখন—

ছুটব খেলব হাসব
সবাইকে ভালোবাসব
জীবে দয়া দানব
সত্য পথে চলব
সত্য কথা বলব

সেই যে কবে যেন তারা গ্রামে ব্রতচারী করেছিল। তার গান, কবিতা এখনও এই সব হাজার ঝামেলার মধ্যে উঁকি দিতে থাকে মাঝে মাঝে। সেই যে কবে তারা শিখেছি—

চল কোদাল চালাই
ভুলে মানের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ
হবে শরীর ঝালাই
যত ব্যাধির বালাই
বলবে পালাই পালাই
পেটে খিদের জ্বালায়
খাব ক্ষীর আর মালাই...।

সত্যি সত্যি কি ব্রতচারী করেছিল তারা? নাকি এসবই লাড্ডু নয়ত টুপির কোনো কাকা, যে আসলে ব্রতচারী করতে গ্রামে গ্রামে। ছুটির দিনে ম্যালেরিয়ার মশা তাড়ানর জন্য পুকুরের কচুরিপানা সাফ করা, গ্রামে গ্রামে রাস্তা তৈরি করে

মানুষের উপকার করা, গুঁড়ি পানা তোলা, দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে কুইনাইন বিলি করা, ম্যালেরিয়া আটকাতে। কালাজ্বর, পালাজ্বর, ডেঙ্গুজ্বর যাতে নায়, তার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালান। সেই খুড়োর কাছ থেকেই কি ব্রতচারী করার গল্প শুনেছে লাড্ডু আর টুপি? গুরুসদয় দত্তর ব্রতচারী আন্দোলন—এই নামটা অবশ্য কিছুতেই মনে পড়ে না টুপি বা লাড্ডুর। কিন্তু ব্রতচারীটা কেন জানি না খেয়ালে আছে। সুন্দরী আর কামিনীর পিঠে চড়ে কোনো নিরুদ্দেশ যাত্রায় যেতে যেতে লাড্ডু বা টুপির সেই চল কোদাল চালাইয়ের আনন্দ মনে পড়ে কি?

বিছানায় চিৎ হয়ে গেলে আরও যেন বেশি বেশি নাল ভাঙে আয়েঙ্গারের। মুখের কষ বেয়ে দু পাশ দিয়েই গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে থাকে আঠাল নাল। তার গালের এক দিনের না কামানো পাকা দাড়িতে চাঁদের আলো কোথা থেকে যেন উড়ে এসে চুপি চুপি ছুঁয়ে দিয়ে যায়।

জ্যোৎস্নায় সামান্য হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের ফাঁকে যেটুকু অন্ধকার, সেদিকে তাকালে গা শির শির শির শির করে। চিৎ হওয়া আয়েঙ্গার স্বপ্নের মধ্যে শাদা শাদা লোমেদের ক্রমে এগিয়ে আসা দেখতে দেখতে গলা শুকিয়ে ফেলে। তার ভেতর থেকে কে যেন জল দাও, জল দাও—এই কথাটাই বলতে থাকে ভিন ভিন ভিন ভিন করে।

বেশ জোরেই নাক ডাকছে আয়েঙ্গারের। নাকের সেই ডাকাডাকিতে আশপাশে যারা থাকে, তাদের কখনও কখনও বেশ অসুবিধাই হয়। কিন্তু সেই অসুবিধের কথা আয়েঙ্গারকে বলবে কে! ফলে ঘুম ভেঙে গেলেও আরতি একরকম কানে বালিশ চাপা দিয়েই শুয়ে থাকে। এখনও ঘুমে থাকতে থাকতে প্রবল শব্দে নাক বাজাতে বাজাতে আয়েঙ্গার ভেতরে ভেতরে গলা শুকিয়ে উঠলে জল জল করতে করতে নিজের মধ্যেই চুপ করে যায়। তার এই জল চাওয়াটুকু বাইরে বেরিয়ে আসে না। তখন কষ্ট বেড়ে যায় আরও।

আয়েঙ্গার সেই কষ্টের ভেতরই হয়ত বা ঘুম ঠেলে উঠে পড়তে চায়। বুকটা শুকিয়ে বালির চরা হয়ে গেলে একটা অদ্ভুত ধরনের হাঁকুপাকু জন্ম নেয় ভেতরে।

কষ্ট জমে।

কষ্ট বাড়ে।

নাক ডাকা থামিয়ে বিছানায় উঠে বসে অন্ধকার হাতড়ায় আয়েঙ্গার। তারপর জল খায়। বাইরে গিয়ে পেচ্ছাপে বসে।

পেচ্ছাপ করতে করতে তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আর তখনই হয়ত বা পায়ের শেকল ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে কামিনী আর সুন্দরী। এবার তাদের যেতে হবে দূরে বহুদূরে। এখন এই জ্যোৎস্নাময় রাতে চারপাশ একদম অন্য রকম। দূর থেকে সেই ছায়া ছায়া হাতিদের দেখে আয়েঙ্গার বুঝতে পারল না এসবই আসলে নেশা করার পর দেখা ছবি কি না।

নদীর পাড়ে আবারও জলঙ্গির জল সামান্য ছলাৎ ছলাৎ করে বেজে উঠল। সেই ছলছলানির সঙ্গে সঙ্গে চাঁদও বুঝি ভেঙে গেল নিজেব মতো।

দূর থেকে তক্ষকের গলার শব্দ পাওয়া গেল নতুন করে। রাত মুছে আসা পৃথিবীতে ভারি বুটের শব্দ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে বেজে উঠতে লাগল চারপাশে।

ঋষিদাস বৈতাল সেই ধোঁয়া, ধোঁয়া চাঁদের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলে উঠল, এই মাইনষেরে লইয়া আমি অখন যামু কোন হানে!

মাইজাকর্তা। মাইজাকর্তা! ফিস ফিস করে ডাকল বৈতাল। তার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে হায় হায় করে উঠল বুঝি জলঙ্গির জল।

রাজশেখর সান্যাল বৈতালের কোনো কথাই শুনতে পেলেন না। বরং তিনি নতুন করে বনমালা সান্যালকে দেখতে দেখতে আবার শুনতে পেলেন—'*নিশিরাত বাঁকা চাঁদ আকাশে...*।'

গীতা দত্তর গান এত ভালো আর প্রায় অ্যাকিউরেট গাইত বনু।

বনমালা! বনমালা! বনু! ফিস ফিস করে উঠলেন রাজশেখর। 'নিশিরাত বাঁকা চাঁদ' শুনতে শুনতে তাঁর সমস্ত গায়েই যেন কাঁটা দিয়ে উঠল।

'*মন বলে তার দেখা পেয়েছি ... পেয়েছি ...*'

তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় চলে গেলে বনু। কেউ থাকে না আমার সঙ্গে। ছেলেরা, ছেলের বউরা, মেয়ে—সবাই ব্যস্ত। পোলা মাইয়া গো কোনো আশা আমি করি না। কিন্তু তুমি তো থাকতে পারতা। থাইক্যা আমারে দ্যাখতে পারতা। তখন ভরসা বলতে হারামজাদা বৈতাল ঋষিদাস। ঋষিদাসের পোলা ঋষিদাস। নির্বইংশার পোলা আমাকে জ্বালাইয়া মারে। বইতে দ্যায় না। শুইতে দ্যায় না। আমি বলি তুমি মর নাই—যার পোলা, পোলার বউ, মাইয়া ডাক্তার সে মরে ক্যামনে! সে কখনও মরতে পারে! তবু বৈতাল আমারে কইব--মাইজা গিন্নি মইর‍্যা গেসে গিয়া। মরসে।

মরসে! মাইজা গিন্নি মরসে। কস কি হারামজাদা। মরসে গিয়া তর বাপ। তর বউ।

বৈতালের কথা বিশ্বাস অয় না। কারও কথা বিশ্বাস অয় না। আমি মনে করি তুমি রইয়া গেস। যেমুন ছিলা, তেমুনই রইয়া গ্যালা বনু। একই রকম রইয়া গ্যালা। সবই ঠিক রইসে। কেবল তুমি নাই। ভাবলেই বুকের মইধ্যে কে যেন বাড়ি মারে। পিটায়। কষ্ট পাই। খুবই কষ্ট পাই। এই যে বেদনা, তা কইতে বোঝাইতে পারি না।

দূরে চাঁদের ছায়ায় আলোয় পৃথিবী অন্যরকম হয়ে আছে। আকাশে ঘনিয়ে আসা বর্ষার মেঘদলে তেমন করে কোনো বৃষ্টির আভাস উড়ে এল কি হঠাৎ! নাকি বর্ষায় যেরকম হয় হঠাৎই হঠাৎ মেঘ ছেয়ে ফেলে চাঁদের, নয়ত সূর্যের মুখ। তারপর সেই কালোর ভেতর দিয়ে যতটুকু আলো যায়, আসে। তার দিকে তাকাতে

তাকাতে জীবনের কথা, ফেলে আসা গানের কথা, ট্যালকম্ পাউডারের সুঘ্রাণের কথা মনে পড়ে যেতে থাকে রাজশেখর সান্যালের। সেই কবে যেন এই গন্ধটুকু জড়িয়ে গেছে স্মৃতির মধ্যে, বনমালার উড়ন্ত আঁচল, খয়ের ছাড়া পান খাওয়া, হঠাৎ হঠাৎ গেয়ে ওঠা গানের কলির মতোই।

একখান দ্যাশ ক্যান ভাইঙ্গা দুইখান হয় বনু! ক্যান হয়? মেঘপাল, মেঘডম্বরুরা আটকাইয়া থাকে বর্ডারে। তারা না খাইতে পাইয়া না খাইতে পাইয়া, জল না পাইয়া ধুকতে ধুকতে মারা যায়। ক্যান, তারা মরে ক্যান? নেহরু, প্যাটেল, জিন্না, শ্যামাপ্রসাদ দ্যাশটারে ভাঙল, তার বদলে আমরা কি পাইলাম? আমাগো ধূলিচন্দন চিরদিনের জইন্য হারাইয়া গেল। সেই পাখার পাড়, বড়তি বিল, চলন বিল, কাছারি বাড়ি, আমাগো ফলের বাগান, চুঙ্গাঅলা গ্রামোফোন—সব, সব চইল্যা গেল। এর দাম দিব ক্যাডায়। ঠাউরদা ভূপতিরঞ্জনের সখের চিড়িয়াখানা হরিণ, বান্দর, ময়াল সাপ, বাঘের বাচ্চা, ছোট চিতা, ভাল্লুক, উদবিড়াল, বেজি—কিছুই তো আনতে পারা যায নাই। তারা হয়ত দিন রাত না খাইয়া, চিৎকার কইর‍্যা কইর‍্যা জল না পাইয়া—।

আমাগো পুখুইর, ভিটাবাড়ি, বড়তি বিল, চলন বিল, তুলসিমঞ্চ—কিস্যু নাই। আবার মুর্শিদাবাদ থিকা খ্যাদা খাইয়া যারা ওপারে গেল তাগোও তো সর্বস্ব গেছে। বছিরদ্দি, আইনদ্দি, শামিমউল্লা—এগো ঘর বাড়ি ছাইড়া চইল্যা যাইতে দেখসি। বিরাটি, মধ্যমগ্রাম, সোদপুরে আমাগো যত আত্মীয় আসে, অনেকেই দখল করসে মোসলমানের বাড়ি। তাগো প্রপার্টি।

বনমালা এই বয়সে পৌছাইয়া তোমারে ছাইড়া থাকতে খুব কষ্ট হয়। দ্যাশের কথা, ধূলিচন্দনের কথা মনে করলেই দুই চক্ষু ভইর‍্যা ওঠে জলে। কিন্তু উপায় নাই। কোনো উপায় নেই।

তখন আমারে মুর্শিদাবাদের সান্যাল পাড়াতেই থাকতে হইব। আমি ইনডিয়ার সিটিজেন। এই হানেই আমার রেশন কার্ড, ভোটার লিস্টে নাম।

মাঝে মাঝেই চিখখইর পাইরা গলা ফাডাইয়া চেচাইয়া উঠতে ইচ্ছা করে—দ্যাশ ভাগ আমি মানি না। দ্যাশ যে পার্টিশান হইয়া গেসে হেইডা আমি মানিনা। কিন্তু সে কথা একলা আমি কইলে শুনব ক্যাডায়। আমারে এমনিই ইস্ক্রুপ ঢিলা কয় লোকে। এইবার আরও বেশি বেশি কইরা কইব, হগগলেই কইয়া উঠব হেয়ার মাথার ঠিক নাই। পুরা পাগল হইয়া গেসে গিয়া।

বৈতাল ঋষিদাস দেখতে পেল প্রায় ডুবে আসা চাঁদের আলোয় রাজশেখর সান্যাল তার দিকে পেছন করে সামনের দিকে তাকিয়ে কি যেন কত কি বলে যাচ্ছে। সেখান থেকে একটু দুরেই দাঁড়িয়ে সেই নদী সাঁতরে আসা দুই হাতি।

বৈতালের পেছন দিকে বয়ে যাচ্ছে জলঙ্গি। তার জলে চাঁদের ভাঙাচোরা আলো।

একখান দ্যাশ ভাইঙ্গা তোমরা দুইখান করলা। রাজশেখর সান্যাল নতুন করে তাঁর বুক ভাঙা হাহাকার বাতাসে ছুড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোড়া তক্ষক আবারও ডেকে উঠল। চাঁদ ছোঁয়া অন্ধকারে তক্ষকের ডাকাডাকি নির্জনতাকে আরও বুঝি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ভারি বুটের শব্দ, কাদের যেন ফিসফিসানি, খুব ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে আরও কাছাকাছি।

বৈতাল ঋষিদাস বাতাসে বিপদের গন্ধ পেতে থাকে। তার মনে হয় কি যেন একটা ঘটতে চলেছে, যা একেবারেই ভালো নয়।

দলমা নয়ত দুমকা থেকে চলে আসা ইনডিয়ার দুই হাতি চাঁদের দিকে নিজেদের শুঁড় তুলে বেশ জোরে জোরেই ডেকে ওঠে।

তাদের এই ডাকাডাকিতে ছিঁড়ে যায় চারপাশে ঝুলে থাকা জ্যোৎস্নার সুতো।

ওজনদার বুটের শব্দ সামনে এগিয়ে আসতে থাকে।

আরও সামনে।

তের

শেষ রাতে জ্যোৎস্না বুঝি অন্ধ হয়ে যায়।

একে ফিফটি সিকস-এর ট্রিগারে হাত রাখা বাইশ-তেইশেরও হাই ওঠে।

গাছপালার আড়ালে দাঁড়ান দলপতি তার শুঁড়ের দুপাশে বেরিয়ে থাকা পুরুষ্টু শাদা দাঁতে চাঁদের আলো মেখে নিতে নিতে বলে, আমরা কিন্তু আমাদের যা যা সমস্যার কথা বললাম, তার কোনো জবাব পাইনি।

সিস্টেম বদল হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে।

হবে কি আদৌ? নাকি তোমরাও তৈরি করে ফেলবে নিজেদের একটা সিস্টেম। আর সেই গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়ে ঘুর পাক খাব আমরা সবাই। সামনে গাজর ঝোলান থাকবে একটা। সেটাকেও লক্ষ রেখে ছুটতে থাকব। দৌড়তে থাকব। পেছনে ফিরে তাকাব না!

তা হবে কেন?

আসলে সিস্টেম জিনিসটাই এমনি।

তখন তো এই স্টেট মেশিনারিই থাকবে না।

এটা থাকবে না। আর একটা হবে। নতুন মেশিনারি। নতুন নতুন আক্রমণ।

ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না তোমার! আচমকাই যেন জানতে চায় দলপতি।

চুপ করে থাকে বাইশ-তেইশ। কোনো উত্তর দেয় না দলপতির প্রশ্নের। বরং তার হাই ওঠে বড় করে।

একটা দুটো তিনটে—পর পর অনেকগুলো হাই। সেইসব লম্বা লম্বা হাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দিয়ে জল কাটে। ঘুম ঢুলুনি আটকাতে আরও শক্ত হাতে চেপে ধরতে চায় রাইফেলের নল। সেই ব্যারেলে চাঁদের আলো পড়লে ঠাণ্ডা ইস্পাতকে আরও যেন ঠাণ্ডা মনে হয়।

'বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস'—একুশ-বাইশের মাথার ভেতর ভাঁজ করে রাখা এই শ্লোগানটা হঠাৎই খুলে যায় শব্দ করে। সেভেনটিজে মাও-সে-তুঙের এই কথাটাকেই আগামাথা কেটে ব্যবহার করা হল লিফলেটে, দেওয়াল লিখনে। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি বন্দুক দিয়ে পাল্টান যায় সব কিছু? ভাবতে ভাবতে আবারও লম্বা লম্বা হাই উঠল বাইশ-তেইশের।

বনের মধ্যে পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বুকে হেঁটে অথবা চারপায়ের কিছু একটা চলে গেলে, দৌড়তে থাকলে আলাদা আলাদা শব্দ ওঠে। সাপের চলাফেরা, বুনো খরগোশের দৌড়, বেজির পায়চারি, সাপেদের বুক টেনে চলা। শেয়ালের হাঁটা—সবই এক এক রকম শব্দ হিসেবে বসে গেছে মস্তিষ্কের খোপে খোপে।

জঙ্গলের মধ্যে লোকাল আদিবাসীরা ফাঁদ পেতে এখনও বুনো খরগোশ ধরে। আমরাও ধরি। বনের পাখি, খরগোশ, সাপ—সবই রয়েছে আমাদের খাদ্য তালিকায়।

গেরিলা বেস তৈরি করতে গিয়ে তোমরা তো নষ্ট করছ বনকে। বনের পরিবেশকে।

দলপতির কথায় চুপ করে রইল বাইশ-তেইশ। তারপর আমতা আমতা করে বলল, সে তো আমাদের এরিয়া কমানডার জানে।

এক শীতের বিকেলে তার সঙ্গে মুখোমুখি কথা হয়েছে আমার।

তিনি আবার বলেন, তিনি নয়, তাঁদের শ্রদ্ধেয় নেতা পরভিনজি জানেন নাকি সব কিছু।

তা হয়ত হতে পারে।

হতে পারে কেন! নির্দিষ্ট করে বলতে পার না!

আমাদের অর্গানাইজেশনের একটা ডিসিপ্লিন আছে।

কিসের ডিসিপ্লিন আর কেনই বা ডিসিপ্লিন? মানুষ কি শৃঙ্খলার উর্ধ্বে নয়।

ব্যক্তি নয়, সংগঠন। আমরা বিশ্বাস করি অর্গানাইজেশনে। সেখানে ইনডিভিজুয়ালের কোনো গুরুত্ব নেই।

ও তাই!

তাই মানে! তোমরাও তো দল বেঁধে থাক। চলাফেরা কর যাকে বলে দলবদ্ধ ভাবেই। একলা একলা থাকে সেই হাতি, যে পাগল বা খুনে হয়ে যায়।

কিন্তু অনেক মানুষই তো একলা হতে চাইছে। একা একা বাঁচা।

তা চাইছে হয়ত। কিন্তু পারবে না।

আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। দলপতি খুব আস্তে আস্তে কথা কটা বলল।

কীরকম? জানতে চাইল বাইশ-তেইশ।

যেমন ধর মানুষ একদম আদিম পৃথিবীতে একা ছিল। তারপর দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সে বুঝতে পারল তুষার যুগ, অভাব, ঝঞ্ঝা, বড় ম্যামথ বা খাড়া দাঁতি বাঘের আক্রমণ—এ সব ঠেকাতে তাকে দল বাঁধতে হবে। জোট তৈরি করতে হবে। একা একা বড় পাথর নিয়ে বা গাছের ডাল নিয়ে ম্যামথের বিরুদ্ধে, খাড়াদাঁতি বাঘের মুখোমুখি দাঁড়ান যায় না। তাই জোট বাঁধ, দল বানাও। গোষ্ঠি গড়ে তোল। এভাবেই বিবাহ, পরিবার, সন্তানের পরিচয়—সব কিছু। গড়ে উঠল গোটা সমাজভাবনা।

এই যুক্তিটা কি ঠিক হচ্ছে? জানতে চাইল বাইশ-তেইশ।

আহা! শোনই না পুরোপুরি। তারপর নয় কথা বলবে।

বেশ। বলে যাও। কিন্তু তোমার সাজান যুক্তি পরম্পরা আমি মানছি না।

তারপর মানুষ যখন সমবেত ভাবে নানা ধরনের মেশিন, প্রযুক্তি, গ্যাজেটস আবিষ্কার করল বহু লক্ষ বছরের সমবেত চিন্তায়, শ্রমে গবেষণার ফলে—পৃথিবীর অন্য অন্য প্রাণীর ওপর গড়ে তুলল নিজের নিরঙ্কুশ আধিপত্য, অকারণ হিংসা আর লোভে ধ্বংস করে ফেলল বহু প্রজাতির পাখি, জীবজন্তু, আকাশ, মাটি, সমুদ্র, তখন তার মনে হল এবার সে একা থাকতে পারবে। অতবড় বাঘ, সিংহ—মুহূর্তে তাকে গুলি করে শুইয়ে দেওয়া যায়। গণ্ডার, হাতিরও একই দশা। হাতির পিঠে উঠে তার মাথায় ডাঙশ মারা যায় অতি সহজে। ঘোড়াকে, উটকে, হাতিকে দিয়ে মাল টানান যায়। এসব করতে করতে মানুষ দেখল তার হাতে এখন প্রচুর মেশিন গ্যাজেটস, অস্ত্র। নিজের আরামের জন্য আবিষ্কার করা যাচ্ছে আরও নতুন নতুন উপাদান। তখন মানুষ একা হতেই চাইল। চূড়ান্ত ইনডিভিজুয়াল। স্বার্থপর। আসলে এই তো স্বার্থপরতার বীজ, এটা তার মধ্যে কৌটোয় ভর্তি করে রাখা ছিল বহু বহু বছর ধরে। এই বিষ বার করানর, উগরে দেওয়ার একটা ছুতো বা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই ছুতো বা সুযোগ এসে গেল হাতে অর্থ, ক্ষমতা, উন্নততর মেশিন, আরামের আরও নানা উপাদান এসে যাওয়ার পর। আসলে মানুষ তো একাই থাকতে চেয়েছিল। তাই এখন আমাদের চোখে সেটা বেশি বেশি করে পড়ছে।

থামাবে তোমার লেকচার। উফ! কি সব রি-অ্যাকশানারি কথাবার্তা! শুনলে রি রি করে গায়ের মধ্যে। বলতে বলতে বাইশ-তেইশ আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল রাইফেলের নল।

এত একসাইটেড হচ্ছ কেন! তোমার এখন কম বয়স। সামনে তত্ত্বের ধোঁয়াশা। তার মধ্যে দিয়ে দেখতে শিখেছ, ফলে অনেক কিছু আড়াল থাকথে তোমার মধ্যে। মানুষ আসলে একা এবং নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতা, একলা থাকার ব্যাপারটা তার

একান্তই কাম্য ছিল। গভীর ভাবে, আন্তরিকভাবে চেয়েছিল সে একা থাকতে। ইনডিভিজুয়াল, চরম ইনডিভিজুয়াল। লক্ষ লক্ষ বছরের স্বার্থপরতার আউট বার্স্ট হল। ফেটে পড়ল। রিমোট কনট্রোল, হাজার খানেক চ্যানেল, নতুন নতুন গ্যাজেটস নিয়ে মানুষ তার ফ্ল্যাট নামের আধুনিক গুহাঘরে ঢুকে পড়ল। সেখানে সে একাই থাকতে চায়। আর এই চরম একা থাকার মুহূর্তে সে কখনও কখনও তার স্বামী, স্ত্রী, সন্তানকেও সহ্য করতে পারছে না। মা বাবা ভাই বোন তো দূরের কথা। সমাজতন্ত্র, সোসালিজমের যে কালেকটিভ ব্যাপার স্যাপার—যৌথ উদ্যোগ, সব কিছু বালির বাঁধ, তাসের ঘর—যাই বল না কেন, সে রকমই পলকা হয়ে একেবারে ভেঙে পড়ল ঝুর ঝুর ঝুর ঝুর করে। যৌথ, সমবেত বলে কিছু আর থাকল না। একা, একা, সম্পূর্ণ একা—মানুষ ইনডিভিজুয়াল থেকে আরও বেশি ইনডিভিজুয়াল, স্বার্থপর থেকে আরও অনেক অনেক বেশি স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে গেল। কেউ কারওকে মানে না। পাত্তা দেয় না। অসম্ভব ইনডিভিজুয়াল সবাই। কেউ কারও জন্য ভাবছে না। অনেকটা যেন রোবট, এরকম ভাবেই সবাই ছুটছে টাকার পেছনে। খ্যাতির পেছনে। শুধু নিজের টুকু, আর কিছু নয়। নিজেকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে কেবল।

তোমার বলা কথার সঙ্গে আমার বিশ্বাস, ভাবনা কিছুই মিলছে না। এসব সভ্যতা বিরোধী প্রকৃতি বিরোধী কথা।

প্রকৃতি! কিসের প্রকৃতি! প্রকৃতির সব চেয়ে বড় ক্ষতি যারা করেছে, তারা মানুষ। এমন এক প্রজাতির জন্তু মানুষ, যার কোনো মেটিং সিজন নেই। সমস্ত প্রাণীর ভাগ করা মিলন-ঋতু আছে। মানুষের নেই। তারা সেরিব্রাল ভাবনা থেকেই শারীরিক মিলনের কথা ভাবে। শুধু তাই না, তার বিহেভিয়ার প্যাটার্ন মানে ব্যবহার দেখে বোঝার উপায় নেই যে সে আসলে কি করবে, ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুরি মারবে। হঠাৎ বন্দুক চালাবে, না ভালোবাসবে।

এত ঘৃণা, বিদ্বেষ কেন দলপতি তোমার মানুষদের ওপর?

তার কারণ আমরা তো হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি মানুষ আসলে কি জিনিস! কোন ক্ষেতের মুলো।

এটা বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না! একদম এসটাব্লিশমেনটের গলায় কথা বলা।

এসটাব্লিশমেনট! কারা! আমরা—হাতিরা? এতো হাসির কথা—বড্ড মজাদার কোনো কথা হয়ে গেল না! তুমি যাদের হয়ে বন্দুক ধরেছ, সেটা এসটাব্লিশমেনট নয়? এই পার্টি, তার ডিসিপ্লিন, তার গোপনীয়তা, শ্রদ্ধেয় নেতা, এরিয়া কমান্ডার, পরভিনজি!

রাষ্ট্র নামের হিংস্র, মন হীন যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এই সব পদ্ধতি আমাদের নিতে হয়েছে।

তারপর?

তারপর রাষ্ট্রযন্ত্র আমরা ভেঙে ফেলব।

কীভাবে?

থ্রু রেভেলিউশান। বিপ্লব করে।

তারপর? তারপর কি আর একটা নতুন রাষ্ট্র, নতুন সিসটেম জন্মাবে না?

হ্যাঁ, সেটা জনগণের। গরিব মানুষের। খেটে খাওয়া শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র।

তাই হয় কি? বাস্তবের সঙ্গে এই ভাবনার কি কোনো ফারাক নেই!

অনেকক্ষণ বক বক হল। এবার থাম তো। বড্ড গেরুলাস হয়ে যাচ্ছ তুমি। শুধুই বকর বকর বকর বকর!

সত্যি কথা সহ্য হয় না সব সময়।

কিসের সত্যি! কার সত্যি! বলতে বলতেই যেন বড় করে হাই তুলল বাইশ-তেইশ।

বেশ কয়েক মাস আগে এক শীতের বিকেলে বা সকালে—সময়ে কী-ই বা এসে যায়, ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে তোমাদের আর্মড স্কোয়াডের একজন এরিয়া কমান্ডার, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম। সেই সময় একটা বেসরকারি টি ভি চ্যানেল থেকেও একজন রিপোর্টার ফটোগ্রাফার কি জানি কিভাবে সেই জঙ্গলের ভেতর। তাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখলাম সব কেমন ওলোট পালোট হয়ে গেল ঝড়ে, হাওয়ায়। বাতাসের টানে।

আকাশে চাঁদ তখনও জেগে।

একে ফিফটি সিকসের গায়ে হাত রাখা বাইশ-তেইশ হাই তুলতে তুলতে আকাশের দিকে তাকাল। রাত জাগা—ধারাবাহিক রাত্রি জাগরণের মধ্যে এক ধরনের ক্লান্তি আছে।

সেই ক্লান্তিটুকু মুছে ফেলতে ঘুম দরকার। গাঢ় একটানা ঘুম। কিন্তু তাতো কখনই সম্ভব নয় এই জঙ্গলে। টানা ঘুমোতে গেলে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা দরকার।

আকাশে গোল চাঁদ গড়াতে গড়াতে সরে গেছে আরও পুবে।

এখনও তার ঘোর লাগা আলোয় কোনো বিপদ সংকেত বেজে উঠছে না বাইশ-তেইশের কানে। কিন্তু দলপতি—সে তো হাওয়ায় বিপদের গন্ধ পেয়ে যায়। সেই বিপদের ঘ্রাণ উড়ে আসে তার নাকে অনেক অনেক দূর থেকে।

হাওয়া বয়।

মেঘলা মতো কি একটা ছায়া আস্তে আস্তে গিলতে আসে চাঁদকে।

সেই মস্ত ছায়া চাঁদকে গ্রাস করে নিতে থাকে একটু একটু করে।

এবার জোরে হাওয়া ওঠে।

একদম ঝড় যেন, সেরকমই হাওয়ার দাপটে কাঁপতে থাকে জঙ্গলের গাছেরা। একফোঁটা দু ফোঁটা বৃষ্টি গড়িয়ে নামে আকাশ থেকে।

ফিস ফিস করে বলে দলপতি—এবার বৃষ্টি নামবে।

ওতো বর্ষার বৃষ্টি, বর্ষায় যেমন হয়, সে রকমই হবে। আমাদের হালকা হালকা প্লাস্টিক ত্রিপল আছে। তার নিচে মাথা ঢাকব।

অতগুলো বন্দুক, রাইফেল, একে ফরটি সেভেন, একে ফিফটি সিকস, অ্যামুনেশানস—তাদের কি হবে?

ওতো বর্ষার বৃষ্টি, থেমে যাবে।

আর যদি ধর দশ বছর ধরে টানা বৃষ্টি হয়! কিংবা বিশ বছর! বলতে বলতে দলপতি আড়চোখে তাকায় চাঁদের দিকে।

যাঃ! তা কখনও হয় নাকি! ও সব অ্যাবসার্ড।

সত্যি সত্যি যদি নেমে যায়?

হয় না, হয় না। বাস্তবে হয় না এসব। এমন ঘটনা রূপকথাতে ঘটে। কিংবা কল্পবিজ্ঞানে।

সত্য সত্যিই যদি নামে দশ বছর ধরে চলবে টানা বৃষ্টি? কিংবা বিশ বছর? পঁচিশ বা পঞ্চাশ। এসব কথা বলতে গিয়ে দাঁতালের গলা পালটে যায়। তারপর একটু থেমে আবার নতুন ভাবে শুরু করে।

আর তাতেও যদি না থামে। টানা বর্ষা চলতে থাকে একশো বছর কি দেড়শো বছর। ঝমঝম ঝমঝম—হয়েই যাচ্ছে। হয়েই যাচ্ছে। থামছে না। কিছুতে থামান যাচ্ছে না। পানের বাটার মশলার বাটি লুকিয়ে, আস্ত ব্যাঙ ধরে তাকে মেরে চার পা ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে শুইয়ে রেখেও বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই কিছুতেই। পড়েই যাচ্ছে। পড়েই যাচ্ছে। পড়েই যাচ্ছে...। তখন! তখন কি হবে?

যে হবে না কোনো দিন।

যদি হয়? দলপতির এই কথা শেষ হতে না হতেই খুব জোরে ডেকে উঠল আকাশ। মেঘের গুর গুর গুর গুর শব্দে জঙ্গল একদম অন্য রকম হয়ে উঠল। তার সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল বেশ জোরে। খুব জোরে জোরে বওয়া হাওয়ার সঙ্গে উড়তে লাগল জঙ্গলের ঝরা পাতা, কুটো. শুকনো ঘাসের চাঁদের দিকে নিজের শুঁড় তুলে ঠিক তখনই ডেকে উঠল দলপতি। এক বার দুবার তিন বার। তার বৃংহণ বুঝি বা ধাক্কা মারল আকাশে জমা কালো মেঘের গায়ে।

তারপর বৃষ্টি নামল।

বৃষ্টি এল আকাশ ভেঙে।
